Sahitya Parishad

পয়লা নম্বর—পাঁচ আনা—রাজ সংস্করণ আট আনা।

…রিদিক খোলা
তুল্য নূতন বাড়ী,
…লদহ হইতে তিন
মিনিটের পথ।

ছিটি বোডিং
২৭নং হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা।

নিষ্ঠার সহিত আমিষ ও
নিরামিষ আহার্য্য দ্বারা সকলের
মনোরঞ্জন করাই আমাদের
বিশেষত্ব।

সম্পাদক—শ্রীকেশব সেন

MARTYRS FOR MOTHERLAND

Lives of Jatindra Nath Das, the Buddhist monk 'Phu gi' Wizya and the great Irish-leader, the first victim of hun strike, T. Macswiney.

The book is decorated with helf-tone blocks and nlcel printed.

Cloth bound Price Rs 1/- only

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র

৺মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি, আই, ই, বাহাদুরের

বিস্তৃত জীবনী

সুলেখক শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত

কাশীমবাজার রাজবংশের উৎপত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া ৺মহারাজের জীবনের খুঁটিনাটি পর্য্যন্তও ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। পুস্তকখানিকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিবার জন্য মহারাজা ও তাঁহার পরিবারের পাঁচখানা হাফ্‌টোন চিত্র দেওয়া হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই মূল্য পাঁচসিকা।

VIDYASAGAR LIBRARY.

31-A Cornwallis Street,

Calcutta.

রবিবারের লাঠির নিয়মাবলী

১। 'রবিবারের লাঠি' আকস্মিক পত্র। "পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্" যখনই আবশ্যক মনে করিবে, তখনই সে আসরে আবির্ভূত হইবে। অসাধু নিশ্চিন্ত হইবেন না, তাহার একবার আবির্ভাবের পর পুনরাবির্ভাবের অন্তরাল একমাস কাল নাও হইতে পারে।

২। রবিবারের লাঠি বৎসরে কত বার দেখা দিবে তাহার ঠিক নাই বলিয়া বাৎসরিক চাঁদা গ্রহণ করিবে না। নগদ পাঁচ আনা মূল্যে এবং কাপড়ে মোড়া 'রাজসংস্করণে' আট আনা মূল্যে যিনি আদর করিয়া তাহাকে ঘরে লইয়া যাইবেন, তাহার ঘরেই সে যাইবে। মফঃস্বলের গ্রাহকগণ চারি পয়সা মূল্যের ডাক টিকিট ও দাম পাঠাইলেই যথাসময়ে ঘরে বসিয়া পাইবেন।

৩। রবিবারের লাঠির প্রচার ও প্রভাব দেখিয়া যাহারা ইহাতে আপনার ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপন দিবেন, তাঁহাদের বিজ্ঞাপন ন্যায়সঙ্গত হারে গ্রহণ করা হইবে। বিজ্ঞাপনের হার পত্র লিখিয়া জানিতে হইবে।

H. Bhattacherya

এজেণ্ট—'রবিবারের লাঠি'

৩১৮এ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অথবা

বিদ্যোদয় প্রেস,

১৬।১এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রবিবারের লাঠি—

নিরাকার ব্রহ্মের যুগল চরণতলে

—১৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

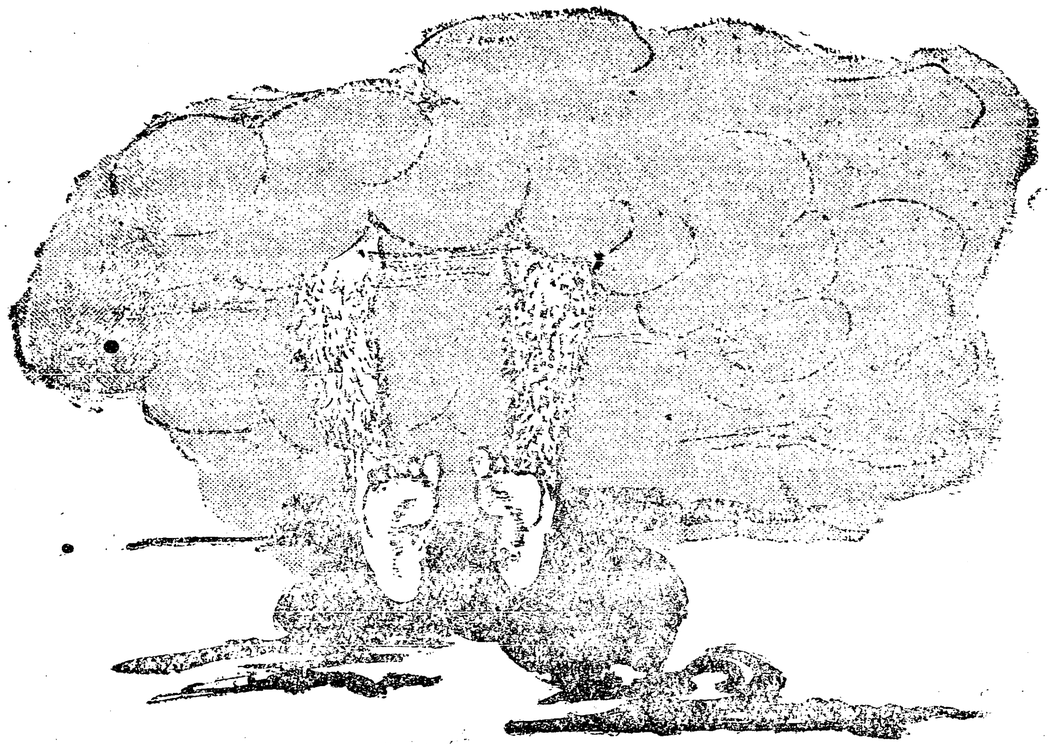

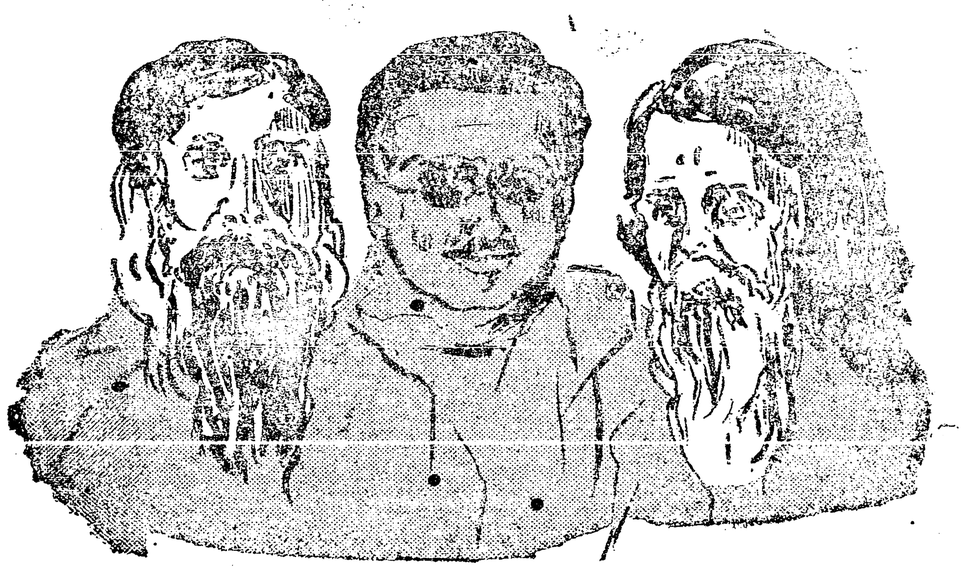

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

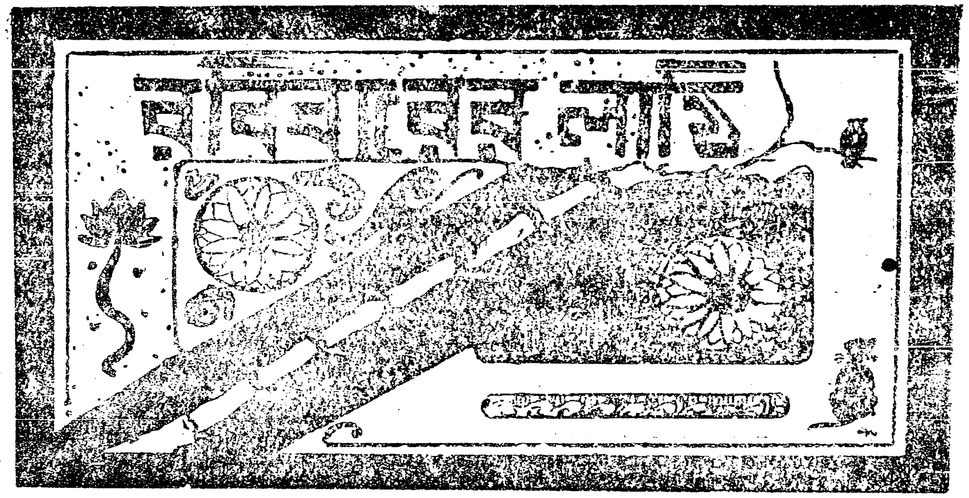

পয়লা নম্বর

আমাদের কৈফিয়ৎ

"প্রিয়ং ব্রুয়াৎ, সত্যং ব্রুয়াৎ, মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্"—এ নীতি অসহায়ের নীতি, ভীরুর নীতি। আপনার মেরুদণ্ডের উপরে ভর করিয়া রহিয়াছে যে, আপনাকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা যাহার আছে—তাহার কর্ত্তব্য নয় ঐ ভীরুতাকে, নীতির নামে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া।

পৃথিবীতে ভুল-ভ্রান্তি আছে, থাকিবেও। সেই সঙ্গে সঙ্গেই সেই ভুল-ভ্রান্তির প্রায়শ্চিত্তও চলিতে থাকিবে। আগুনে যে হাত দিবে, হাত তাহার পুড়িবেই। ইহার মধ্যে সুবিধা পাওয়ার কিছু নাই, খাতির নাই। বড় জোর পুড়িবার

পরে ঔষধ-লেপন করা যাইতে পারে। তা বলিয়া অগ্নির সঙ্গে দাহ্য বস্তুর যে সম্পর্ক, তাহাকে ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না।

অনুকম্পা সংসারে আছে; কিন্তু তাহা পাপীর উপরে, পাপের উপরে নয়। পাপের সঙ্গে সঙ্গেই পাপের সম্বন্ধে অনুভূতি; সেই অনুভূতিরই প্রগাঢ়তা অনুতাপ। অনুকম্পা অনুতপ্তেরই প্রাপ্য। কিন্তু অনুতাপ জন্মিবার অবস্থায় উপনীত হওয়া চাই তো!

পৃথিবীতে অন্যায় যেমন সকলেই কিছু-না-কিছু করে, লাঞ্ছনাও তেমনি সকলকেই অল্প-বিস্তর সহিতে হয়। এই যে লাঞ্ছনা, ইহা স্রষ্টার ক্রুদ্ধ অভিশাপ নয়, মঙ্গলময়ের মঙ্গল-হস্তের দান। এই দান মানুষের চিত্ত হইতে কলুষভার হরণ করে, মানুষের কর্ম্ম ও চিন্তাকে মহতের সেবায় নিয়োজিত করে, পশুত্বের সংহার-সাধন করিয়া মনুষ্যত্বে এবং মনুষ্যত্ব হইতে শেষে দেবত্বে পৌছাইয়া দেয়।

মিথ্যা পাপ। সত্যের আবরণে যে মিথ্যা, তাহা মহাপাপ। এই মিথ্যার মায়া-আবরণ ছিন্ন করিয়া দেওয়ার মত পুণ্য আছে কিনা জানি না। সংসার ইহাকে নির্ম্মমতা, কঠোরতা কিংবা অন্য যে-কোন অভিধানে অভিহিত করুক, তাহাতে যায় আসে না। অজ্ঞানই অসত্যের শ্রেষ্ঠ সুহৃদ্। সত্যের নির্ম্মমতম ও কঠোরতম আঘাতে তাহাকে ছিন্ন করিতে হইবে।

ব্যষ্টির অন্যায়ের চেয়ে সমষ্টির অন্যায় আরও ভয়ানক। সমষ্টিগত অসত্য মহাশক্তি। এই মহাশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ-

ঘোষণা করায় পৌরুষের প্রলোভন যতটা আছে, লাঞ্ছনার আশঙ্কা তাহার চেয়ে অনেক বেশী। তথাপি ইহাকে ঘা দিতে হইবে। নাহয় কমই হোক আর বেশীই হোক—তাহা লইয়াই ইহার সম্মুখীন হইতে হইবে।

ইহাই আমাদের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌছিতে পারিলেই আমরা আমাদের লেখনী-ধারণ স্বার্থক মনে করিব।

অশনি

প্রলয়ের নাদে ডাকিছে অশনি
মেঘঘন একি অম্বর!
সৃষ্টি কাঁপিছে বিপুল তরাসে—
কে কহিছে ডাকি—'সম্বর,
ধ্বংসের তরে নহে এ বজ্র;
এ যে গো রাখিতে সৃষ্টি।
মরুতৃষা ঘোরে বাঁচাতে মানবে
আসিবে সঙ্গে বৃষ্টি।
অশনির সাথে বিজলী-চমক
আশার মধুর হাস্য,
রুদ্র মূর্ত্তি ছাড়িয়া রৌদ্র
ফুটাবে অধরে লাস্য।'

হিন্দু-সভ্যতা ও হিন্দুর সাহিত্য

পূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষ যেখানে আপনার পদাঙ্ক অঙ্কিত করিয়া যায়, পরবর্ত্তী পুরুষ তাহাই অনুসরণ করিয়াছিল। যে সভ্যতা এক দেশ বা জাতি একবার পাইয়াছে, বহুবৎসর ধরিয়া পুরুষানুক্রমে তাহা সেই জাতির ও দেশের মধ্যে সংক্রামিত হয়। সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সাক্ষী সভ্যতা।

কিন্তু সভ্যতা ছাড়াও সভ্যতার সাক্ষী আছে। সে সাক্ষী সাহিত্য। সভ্যতার অন্যান্য চিহ্ন যখন লুপ্ত হয়, সাহিত্য তখনও বর্ত্তমান থাকে জাতির অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিতে। প্রস্তর ও মৃত্তিকার স্তূপের মধ্য দিয়া যে কীর্ত্তি মানুষ রাখিয়া যায়, তাহা যতদিন স্থায়ী থাকে, তাহার চেয়ে বেশীদিন থাকে মনীষিগণের চিন্তা ও সাধনার ফলক-লিপি। যখন কোন দেশের বা জাতির সভ্যতা অনিবার্য্য কারণে লুপ্ত হইয়া যায়, তাহার সাহিত্য তখনও নানা দেশে ছড়াইয়া পড়িয়া লুপ্ত সভ্যতার সাক্ষ্য দিয়া থাকে। তবে সে মৃত জাতির সাহিত্য হয়তো বেশীদিন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারে না—পরিপোষক জাতির সাহিত্যের সঙ্গে মিশিয়া যায়। এককে হারাইয়া বহুর মধ্যে লীন হয়; সসীম অসীমে পরিণত হয়। পৃথিবীতে এমন কত সভ্যজাতি নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে; রাখিয়া গিয়াছে তাহাদের সাহিত্য, অন্যান্য জাতি তাহা গ্রহণ করিয়াছে: করিয়া সম্পৎশালী হইয়াছে, গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে।

সাহিত্য আর সভ্যতা—দুই পাল্লা যখন সমান ভরা হয়, তখনই সে সভ্যতার বিলোপের পরেও তাহার সাক্ষী রাখিয়া যাইতে পারে। কিন্তু সভ্যতা চূড়ান্তে উঠিয়াছে, অথচ তদনুরূপ সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারে নাই—ইহাও পুরাতন যুগে সম্ভব হইত। সম্ভব হইত বলিয়াই মিশরীয় সভ্যতা ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতা আজ প্রত্নতত্ত্বের বস্তু হইয়া পড়িয়াছে

পাহাড়ের গাত্র খুঁজিয়া দ্রাবিড়ী সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে; তাহাদের পরিত্যক্ত কোন সাহিত্যের মধ্য দিয়া আজ আমরা তাঁহাদের তেমন করিয়া প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছি না।

হিন্দু-সভ্যতার, চীন-সভ্যতার, গ্রীক-সভ্যতার সঙ্গে সমান পাল্লায় চলিয়াছে হিন্দুর সাহিত্য, গ্রীসের সাহিত্য, চীনের সাহিত্য। জগতের অন্যান্য জাতিসমূহের কেহ যখন বৃক্ষ কোটরে অবস্থিতি করিতেছে, কেহ হামাগুড়ি দিয়া বেড়াইতেছে, কেহ বা চলি চলি পা পা করিয়া পা বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে—তখন ইহারা কেবলমাত্র জীবন-যাপনের উন্নততর প্রণালী আবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, আপনার মনোভাব প্রস্তর-ফলকের সাহায্যে অপর ব্যক্তির বা পরবর্ত্তী পুরুষের জন্য অঙ্কিত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত করিয়াছে হস্তলিপি ও সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া।

বিশেষ করিয়া হিন্দু-সভ্যতা। হিন্দু-সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে যে বিরাট সাহিত্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার তুলনা কোথায়? হিন্দুর চতুর্ব্বেদ শ্রুতিতে শ্রুতিতে প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়াই তাহার অন্য নাম 'শ্রুতি'। 'শ্রুতি' নাম হইতে মনে হয় যে, ঐ সময়ে তাহার অক্ষর-পরিচয় হয় নাই—অবশ্য কেবলমাত্র শ্রুতি শব্দটীর জন্য এ সন্দেহ। নহিলে চারিটী বেদের মধ্য দিয়া যেসকল গভীর ও সূক্ষ্ম চিন্তাধারা ব্যক্ত হইয়াছে। তাহা কেবল অক্ষর পরিচয় কেন, বিদ্যার উচ্চস্তরে উপনীত না হইলেও সম্ভব হয় না বলিয়া মনে হয়।

অক্ষর-পরিচয় হৌক বা না হৌক—বেদের সময় ভাষার শৃঙ্খলা রক্ষিত হয় নাই—ছন্দের বৈচিত্র্যও গঠিত হয় নাই ইহা নিশ্চিত। অত্যুচ্চ চিন্তাধারায় পৌঁছিলে, ভাষা ও ছন্দের প্রতি এরূপ অমনোযোগ হয়তো অনিবার্য্য এবং এই কারণেই হয়তো সংসারানভিজ্ঞ অরণ্যবাসী ঋষিগণের লেখায় সাহিত্য আর্ষ-প্রয়োগের এত ছড়াছড়ি।

তারপর বেদের রস-সাহিত্যে কেমন করিয়া বেদান্ত ও বেদাঙ্গের

সূক্ষ্ম এবং অপেক্ষাকৃত বাস্তব বিশ্লেষণে আসিয়া উপনীত হইল, তাহার ইতিহাস আলোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু আর্য্য-ভাষায় প্রথম যে ব্যাকরণখানির সৃষ্টি হইল, সেই পাণিনির সহিত তুলনাও হইতে পারে, এমন ব্যাকরণ আজিকার কোন সভ্য দেশের সুসংস্কৃত সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারে নাই। শব্দতত্ত্বের মধ্যে বিবিধ তত্ত্বের—বস্তুতন্ত্রের ও ভাবতন্ত্রের এরূপ বিচিত্র সমাবেশ একমাত্র হিন্দু-সাহিত্যেই।

হিন্দু-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ আমাদের আলোচ্য বস্তু নয়, সেকথা ভুলিয়া যাইব না—আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব, সভ্যতার বিভিন্ন স্তরের মধ্যদিয়া হিন্দুর সাহিত্য কিরূপ বিচিত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং সভ্যতার গৌরব-স্তম্ভ রূপে আপনাকে বিস্তৃততর করিয়া তুলিয়াছে।

রামায়ণ ও মহাভারতের যুগ—ভারতের ইতিহাসের সুবর্ণ যুগ নিশ্চয়ই। বৈদিক যুগে হিন্দু হয়তো নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে নিমগ্ন রহিয়া আধ্যাত্মিক চিন্তায় কাল কাটাইয়াছে। কিন্তু যে যুগে হিন্দুর আধ্যাত্মিক চিন্তার উৎস অবরুদ্ধ না হইয়া নব নব রূপে আত্মপ্রকাশ করিবার পথ খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে—উপনিষদ্‌সমূহের মধ্যদিয়া অধ্যাত্মবিদ্যার চরম পরিচয় প্রদানও করিয়াছে, অথচ বস্তুতান্ত্রিকতার ও উচ্চশিখরে উঠিয়া রাষ্ট্রে, সমাজ-প্রথায়, শাসন ও সমরপ্রণালীতে, সুসভ্য দেশসমূহকে হার মানাইয়াছে,—হিন্দু-সভ্যতার সেই চিরস্মরণীয় যুগে হিন্দু এমন দুইখানি মহাগ্রন্থ রচনা করিল, জগতের ইতিহাসে যাহার তুলনা নাই।

জগতের সাহিত্য-মঞ্চে অনেক কবি ও গ্রন্থকার দেখা দিয়াছেন, অনেক সৎ-সাহিত্যের উদ্‌ভব হইয়াছে; কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারতের তুলনা মিলে কোথায়? হিন্দু-সভ্যতার কথঞ্চিৎ নিকটেও অগ্রসর হইয়াছে, যে সভ্যতা তাহা গ্রীক সভ্যতা। গ্রীকদিগের সাহিত্য আদর্শ সাহিত্য—মহাকবি হোমর কেবল এক যুগের নহেন—চিরকালের ও চিরযুগের কবি। কিন্তু তথাপি গ্রীক-সাহিত্য রামায়ণ বা মহাভারতের

তুলনা দিতে পারে নাই—অনুপম কাব্যচ্ছন্দে একটা মহাদেশ বা মহাজাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস বর্ণনা করিতে পারে নাই—একটা বিরাট সভ্যতার অলেখ্য আবিষ্কার করিতে পারে নাই—সহস্র সহস্র শ্লোকের প্রত্যেকটীর মধ্যে কাব্যরস অক্ষুন্ন রাখিয়া ভাবের সমঞ্জস্য রাখিয়া, ভাষার অনাবিলতা অটুট রাখিয়া।

রামায়ণ ও মহাভারত হিন্দুর মহাসাহিত্য সন্দেহ নাই; কিন্তু হিন্দু সাহিত্য এইখানেই যে climax-এ উঠিয়াছে, এমন কথাও বলা চলে না। যুগ যুগ ধরিয়া হিন্দু-সভ্যতার বিভিন্ন দিক্ যেমন পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে, হিন্দু-সাহিত্যও তেমনি স্তরে স্তরে বিকাশলাভ করিয়াছে। অধ্যাত্ম-বিদ্যার দিক দিয়া দর্শন, উপনিষদ ও তন্ত্রসমূহ, রাষ্ট্র ও সমাজনীতির দিক দিয়া সংহিতা ও স্মৃতিসমূহ, বস্তুতান্ত্রিকতার দিক দিয়া আয়ুর্ব্বেদ, রসায়ন, ফলিত জ্যোতিষ, সামুদ্রিক বিদ্যা, বীজগণিত, জ্যামিতি প্রভৃতি লইয়া কত বিচিত্র সাহিত্য কত যুগেই না জন্মগ্রহণ করিয়াছে! আধ্যাত্মিকতায় অতিরিক্ত আশক্তি বশতঃ বস্তুতান্ত্রিকার দিক যদি হিন্দু উপেক্ষা করিয়া না যাইত, তাহা হইলে হয়তো হিন্দু-সাহিত্যকে আমরা আরও সমৃদ্ধ দেখিতে পাইতাম।

কাহারও কাহারও মুখে শুনা যায়, হিন্দু-সভ্যতার এক কলঙ্ক হিন্দু প্রতিমার উপাসক। চোখে আঙুল দিয়া দেখাইলেও যাহাদের ভ্রম-নিরসন হইবে না, তাহাদের কিছু বলিতে চাহি না। যাঁহারা যুক্তি-বিরোধী নহেন, তাঁহাদের একটীমাত্র প্রশ্ন করিতে চাই যে, হিন্দু যদি প্রতিমা-পূজক বলিয়াও ধরিয়া লই, তাহাহইলেও কি একথা বলা যায় যে, এই প্রতিমা পূজার ফলে হিন্দুর আধ্যাত্মিকতায় কোথাও বাধা পড়িয়াছে?

হিন্দুর ধর্ম্মকার্য্য প্রধানতঃ কয়েকটী বিভাগে বিভক্ত—

(১) অধ্যাত্ম-চিন্তা—সূক্ষ্ম ও উচ্চতর চিন্তা-প্রণালী—প্রতিমা প্রস্তুত বা সাকার উপাসনা ইহার অন্তর্ভুক্ত নয়।

(২) সাকার উপাসনার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। সাকার উপাসনার পরবর্ত্তী স্তর। এখানে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে—সাকার উপাসনার প্রবর্ত্তন উচ্চতর অধ্যাত্ম-চিন্তার সাহায্যের জন্য মাত্র।

(৩) বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্ত্তিতে অনন্ত ঈশ্বরের বিভিন্ন বিভূতির পূজা। প্রত্যেকটী পূজায় বিগ্রহের মধ্যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ও বিসর্জ্জনের প্রণালী রহিয়াছে। দেব-দেবীর ধ্যানের মন্ত্রে প্রত্যেককে অনন্তরূপ ও অনন্তকায় বলিয়া সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ রহিয়াছে।

(৪) ব্রত ও পর্ব্বাদি। সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, উষা, বসন্ত, শরৎ, বাস্তু (গৃহদেবী), অন্ন, গঙ্গা (জল), বরুণ (সমুদ্র), আকাশ প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া এই সকল ব্রত ও পর্ব্বাদি। বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির যোগ-সাধন যেন ইহার প্রত্যেকটীর গূঢ়তম উদ্দেশ্য। প্রত্যেকটী যেন এক-একটী সুচারু কবি-কল্পনা। চারু-শিল্প ইহার প্রধান উপচার।

(৫) মানব-জীবনের বিভিন্ন সংস্কার-কার্য্য। গর্ভাদান হইতে আরম্ভ করিয়া জন্ম, ষষ্ঠরাত্রি, মাসিক-সংস্কার, অন্নারম্ভ, উপবীত (দীক্ষা-গ্রহণানন্তর গুরুগৃহে প্রবেশ), সমাবর্ত্তন (গুরুগৃহে পাঠ-সমাপন পূর্ব্বক গার্হস্থ্য ধর্ম্মে প্রবেশ), বিবাহ প্রভৃতি দশবিধ সংস্কার। ইহার প্রত্যেকটীর মধ্যে রহিয়াছে সঙ্কল্পের পবিত্রতা ও বিরাটত্ব, কঠোর কর্ত্তব্য-বোধ ও ধর্ম্মবুদ্ধির অপূর্ব্ব শিক্ষা—মনুষ্যজীবনকে আদর্শ জীবন করিয়া তুলিবার আগ্রহ-সৃষ্টির প্রয়াস।

(৬) ঔর্দ্ধদেহিক বা পারত্রিক কার্য্য—পিতা প্রপিতামহের আত্মার তৃপ্তি ও সদ্‌গতির জন্য সন্তান-সন্ততির কতগুলি পারলৌকিক অনুষ্ঠান। প্রচলিত ধর্ম্ম বিশ্বাস অবলম্বন করিয়া এইগুলি পরিকল্পিত হইয়াছে—কল্পনার বা অধ্যাত্মানুভূতির সাহায্যে হিন্দু ঋষি পিতৃলোকের পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিয়া বসিয়াছে। মৃত আত্মীয়কে আপনার জ্ঞান-পরিধিমধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া তাহার সহিত সম্বন্ধ-রক্ষার একটা বিশ্বস্ত

চেষ্টা ইহাতে পরিস্ফুট হইয়াছে। জ্ঞানাতীত, ইন্দ্রিয়াতীত অনন্ত জগতের সহিত ইহজগতের সান্নিধ্য স্থাপনে বিশ্বমানবের যে চিরন্তন প্রয়াস—তাহাই এই শ্রেণীর চিন্তাধারার মধ্য দিয়া সূচীত হইয়াছে। এই চিন্তাধারায় যুক্তি অপেক্ষা বিশ্বাসের আসন উর্দ্ধে। যাঁহারা ইহার সহিত একমত হইবেন না, তাহারাও একটু অবধানতার সহিত দেখিলে ইহার অসঙ্কীর্ণতা ও বিরাটত্ব অস্বীকার করিতে পারিবেন না; বরং পরিকল্পনার মহিমায় মুগ্ধ হইবেন।

যে সাকার উপাসনা-প্রণালী সভ্যতাকে বাধা দেয় নাই, পরিকল্পনাকে খাটো করিয়া রাখে নাই, বরং বিভিন্ন দিকে বিচিত্র গতিতে জাতিকে অগ্রসর হইতেই সাহায্য করিয়াছে, সেই সাকার উপাসনা-প্রণালীর নিন্দা করি কি করিয়া? এই উপাসনা-প্রণালী পরিচালিত হিন্দুধর্ম্ম বিভিন্ন যুগে—বিভিন্ন পথে যে অপূর্ব্ব সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, তাহা জাতির এক মহান গৌরব-নিদর্শন। কেবল যজ্ঞভূমি-জাত বেদমন্ত্র নয়, অরণ্য-জাত দর্শন-উপনিষদ্ নয়, উপবন-জাত কাব্য-সাহিত্য নয়, সংসারাশ্রম-জাত সংহিতা ও স্মৃতি নয়—হিন্দুর রাজ-প্রাসাদে, হিন্দুর অন্তঃপুরে, হিন্দুর কৃষক-কুটীরেও এই সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে—হিন্দুর জীবনকে ধর্ম্ম ও সাহিত্যের সংমিশ্রণে অপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় রূপ দিয়াছে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা রাখিয়া দিয়া ঐতিহাসিক যুগে আসিয়া উপনীত হই। এখানেও সভ্যতার ক্রমবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-সম্ভারের ক্রমবিকাশ সম্ভাবিত হইয়াছে। ভারত-বিখ্যাত রাজা বিক্রমাদিত্যের যশঃসুরভীধারায় যখন ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্লাবিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সভাকবি কালিদাসের কবি-কল্পনাও ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। রঘুর দিগ্বিজয়-

কাহিনী ও মেঘের অলকাপুরী-যাত্রা প্রসঙ্গে কবি পাঠককে সমগ্র উত্তর-ভারত ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইয়াছেন।

হিন্দুর উত্থান-পতনের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-সাহিত্যের উত্থান-পতন ঘটে নাই—আরও আশ্চর্য্যের কথা রাষ্ট্র-বিপ্লবকালে সাহিত্য সমৃদ্ধই হইয়া উঠিয়াছে এবং নব নব জাতির ভাবধারা গ্রহণে—নব নব ধর্ম্মের সম্মোহনকারী স্পর্শে নব নব ঐশ্বর্য্যই সঞ্চয় করিয়াছে। যখন সংস্কৃত ভাষা আর কোন জাতির কথিত ভাষা রহিয়া গেল না, সংস্কৃত ভাষা ভাষীরা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িয়া বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা অবলম্বন করিয়া বসিল,—তখনই একদিকে যেমন অলঙ্কার ও উপমায় পরিপূর্ণ সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যসমূহের উদ্ভব হইল, অন্য দিকে তেমনি প্রাদেশিক ভাষাগুলিও সংস্কৃত হইতে রত্নরাজী আহরণ করিয়া আপনাকে সম্পৎশালী করিয়া তুলিতে লাগিল। হিন্দুর মহাগ্রন্থ রামায়ণ কৃত্তিবাস ওঝা কর্ত্তৃক বাংলা ভাষায় এবং তুলসীদাস কর্ত্তৃক হিন্দিতে রূপান্তরিত হইল—অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাও ইহাকে রূপান্তরিত করিতে ছাড়িল না। রূপান্তর—শুদ্ধ অনুবাদ নহে। সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারত তাহাদের প্রাণের জিনিষ হইয়া দাঁড়াইল; এই দুইটী বস্তু দ্বারাই প্রাদেশিক ভাষাগুলি সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল।

সহস্র সহস্র নিদর্শন দিলেও ফুরাইবে না। সুতরাং আর অতীত নয়, এবারে আমরা বর্ত্তমানে উপনীত হইব। ভারতের বর্ত্তমান্ ভাষা ও সাহিত্যগুলিও হিন্দু-সভ্যতারই দান। ব্যাকরণ ও ছন্দ-প্রণালীতে আমরা এখনও ভারতীয় প্রণালীরই অনুসরণ করিতেছি। একদিকে আরবী-পারসী, অন্যদিকে ইউরোপীয় লিখন প্রণালী আমাদের ভাষায় ও সাহিত্যে আসিয়া ঠাঁই লইয়াছে ও লইতেছে সত্য; কিন্তু তাহা হিন্দু-প্রভাবকে লুপ্ত করিবার তো নহেই, অভিভূত করিয়া দিবার মতও পর্য্যাপ্ত হইয়া উঠিতে আজিও পারে নাই।

কেবল সংস্কৃত সাহিত্য ও সংস্কৃত মহাকাব্যসমূহের প্রভাবই ভারতীয় সাহিত্যে হিন্দু-সভ্যতার দান নয়। যুগে যুগে হিন্দু ধর্ম্ম যে বিচিত্র অভিব্যক্তি পাইয়াছে, বিভিন্ন চিন্তা ও ভাবধারার মধ্য দিয়া আপনাকে নব নব রূপ-রসে পরিপূর্ণ করিয়া লইয়াছে, হিন্দু-সাহিত্যে সেই বৈচিত্র্যেরও পরিচয় রহিয়া গেছে। পাঁচালী, পুঁথি ও বৈষ্ণবীয় সাহিত্যের মধ্যদিয়া আমরা এই অপূর্ব্ব সাহিত্য-রসের সন্ধান পাই আমাদের প্রাদেশিক বাংলা ভাষায়। হিন্দি, গুজ্‌রাটী এবং ততোধিক প্রাচীন ও সমৃদ্ধ তামিল ভাষায়ও অনুরূপ সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়—যাহা হিন্দু-সভ্যতারই দান, অথচ সংস্কৃত-সাহিত্যের, অনুবর্ত্তী নহে।

হিন্দু যখন বৌদ্ধ-ধর্ম্মকে হজম করিয়া ফেলিল, বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচলিত রূপ হইতে এক নূতন তন্ত্র খাড়া করিয়া বসিল, তখন বাংলা ভাষায় যে নব-সাহিত্য জন্মগ্রহণ করিল, তাহার মধ্যে ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারপর সেই তন্ত্র যখন বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া বসিল, তখন আসিল পাঁচালী সাহিত্য। মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ চণ্ডী পাঁচালী সাহিত্যে হিন্দু-সভ্যতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। বিজয়গুপ্ত এবং অন্যান্য কবিগণের রচিত মনসা-মঙ্গলও বঙ্গভারতীর পুণ্য পীঠে নিতান্ত সামান্য বিভূতিসম্ভার নয়।

তারপর বৈষ্ণব-সাহিত্য। হিন্দু-সভ্যতার সে এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি! বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন কবিগণের রচিত স্তূপীকৃত সাহিত্যরাজী যেন এক মহান্ সম্রাটের সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য। যেমনি তার বিরাটত্ব, তেমনি ভাবের গভীরতা। এক-এক কবির লিখিত অসংখ্য—অগণণীয় পদরাশির মধ্যে এমন একটী পদও খুঁজিয়া পাইবে না, যাহাতে অগভীর ভাব বাক্যের চাতুরীতে ফলাইয়া লেখা হইয়াছে। ভাবের আদান-প্রদানে বিশ্বস্ততা এমতভাবে রক্ষিত হইয়াছে, জগৎ-সাহিত্যে যাহার তুলনার অতি অল্পই আছে।

সাহিত্যে হিন্দু-সভ্যতার বিভিন্ন যুগে যাহা দান, তাহাকেই অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান সাহিত্য—বিশেষ-ভাবে বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্য গঠিত। পাশ্চাত্য ও ইস্‌লামীর প্রভাব যে যে স্থলে ঐ সাহিত্যকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করিয়াছে, সেই সেই স্থলে সাহিত্যের মধ্যে আবিলতা আসিয়া পড়িয়াছে। এ সকল কথা অবশ্য আমাদের আলোচ্য বিষয় হইতে স্বতন্ত্র; একটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধেই তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাহিত্য বাংলা-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মিষ্টিকত্ব (Misticism) রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মূল বস্তু। উহা কবি **সহজিয়াদের** কাছে পাইয়াছেন এবং একথা কবি একাধিকবার নিজমুখে স্বীকার করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির লিখন-প্রণালী পাশ্চাত্য রীতি অনুসারে হইলেও উহার অন্তর্গত ভাবরাশিও বৃহলাংশে সংস্কৃত সাহিত্য হইতে গৃহীত। নাটক-রচনায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও গিরীশচন্দ্র ঘোষ প্রাচ্যরীতিই অনুসরণ করিরাছেন। সঙ্গীত শাস্ত্রে তো প্রায় পূর্ণমাত্রায় সংস্কৃত রীতি অনুসৃত হইয়াছে।

পুরাতনকে অতিক্রম করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন কেবল শরৎচন্দ্র। তিনিও পাশ্চাত্য রীতিকেই জোর করিয়া বাংলা সাহিত্যে ভরিয়া দিতেছেন না; তাঁহার লিখন পদ্ধতি অধিকাংশ স্থলেই মৌলিক এবং এই মৌলিকতাও হিন্দু-সভ্যতারই দান। শরৎচন্দ্রের রচনার সর্ব্বত্র হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু-সভ্যতার প্রতি গভীর অনুরাগ পরিদৃষ্ট হয়।

হিন্দু-সভ্যতা যেমন বিস্মৃত অতীত হইতে চলিয়া আসিতেছে, তেমনি অনাবিস্কৃত ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত চলিতে থাকবে। জগৎ-সভ্যতায় তাহার যাহা দান, তাহা সুদূর অতীতে আরম্ভ হইয়াছে; সুদূর ভবিষ্যতেও এই দান-স্রোত বিশ্রাম চাহিবে না। যাহা দিবার, তাহা সে দিয়া ফেলিয়াছে, নূতন কিছু সে দিবে না—এরূপ সঙ্কীর্ণতার স্থান আর যাহাতেই থাকুক, হিন্দু-সভ্যতায় নাই—হিন্দুর সাহিত্যেও নাই। বরং সভ্য-

জগতের মেরুদণ্ডরূপে অবস্থিত থাকিয়া সে নিত্য-নূতন দানে জগতকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়া বিপুল আত্মপ্রসাদ লাভ করিবে। একদিন হিন্দু-সভ্যতার দানে আরব উপকৃত হইয়াছিল, গ্রীক সমৃদ্ধ হইয়াছিল, সমগ্র ইউরোপ মুগ্ধ হইয়াছিল। আজ সে জগতের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে—সরল, বিদ্যান্বেষী, উচ্চাশয় শিষ্যরূপে। আবার তাহার সঞ্চয় যখন পূর্ণ হইয়া আসিবে, তখন আবার হয়তো সে পরিব্রজ্যায় বাহির হইবে—সভ্য-জগতের শিক্ষকরূপে। ভারতের সংস্কৃত-সাহিত্য সমগ্র ইউরোপের শিক্ষার বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতের বৈষ্ণব-সাহিত্য তাহার বিষয়বস্তুর অতিরীন্দ্রয়তার জন্য বহির্ভারতে ততটা আদর পায় নাই। রবীন্দ্র-সাহিত্য আজ সমগ্র সভ্য-জগতের লোভনীয় বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। আমরা অবশ্যই এ আশায় বুক বাঁধিয়া থাকিব যে, জগৎ-সাহিত্যে রবীন্দ্র-সাহিত্যই ভারতের সর্ব্বশেষ দান নয়—যুগে যুগে নূতন নূতন সাহিত্যরথী তাঁহাদের সাহিত্য-ভাণ্ডার লইয়া জগৎ-সভায় বিতরণ করিতে বাহির হইবেন।

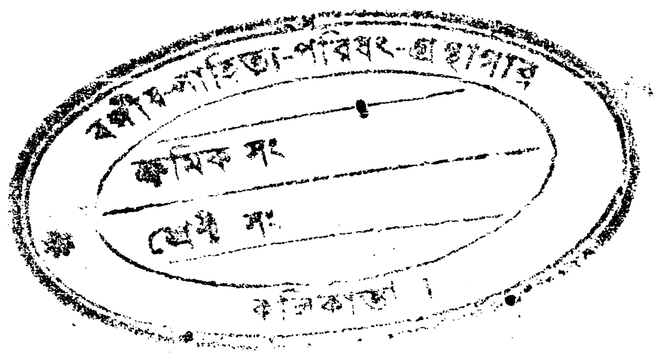

নৈরাকারী ত্রয়ী

দৃশ্য :—ব্রহ্মমণ্ডল। সুমুখে চায়ের কাপ্ ঢাকা
রাখিয়া হিড়িম্বা, ধামানন্দ, প্রাণব্রহ্ম
প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণ নিরাকার
পরব্রহ্মের মহাধ্যানে
নিমগ্ন।

হিড়িম্বা। নিরাকার পরব্রহ্ম!
দয়া করি—শ্রীচরণ তরী
দেছ যদি অধম সন্তানে—
রেখ তাহা চিরচিন—
অন্তিমে বাঞ্ছিত পদ দিও সবাকারে।
ব্রহ্ম ধ্যান, ব্রহ্ম জ্ঞান,
ব্রহ্ম বিনা নাহি অন্য কিছু—
যদিও বা পিছু
সিটির সহস্র শিষ্য ঘুরে চারিধারে
কাতারে কাতারে!

প্রাণব্রহ্ম। মুখে বলি অন্ধকার হইতে আলোকে—
চক্ষু মুদি' হেরি বিপরীত,
আলোক হইতে যাই অন্ধকার মাঝে।
এও সহি ব্রহ্মের লাগিয়া!
ব্রহ্ম! ব্রহ্ম!

এস, এস দাঁড়াও সুমুখে—
হেরি ঐ রূপ অপরূপ—
থাকি বিমোহিত হ'য়ে।
দেখা দাও, ধরি বেশ উজ্জ্বল বরণ
মদনমোহন
নিরাকার—শূন্য গোলাকার—
বৃত্ত-চতুর্দ্দিকে চারি পদ, মুখ, লেজ—
মৃত্তিকার অধিবাসী জান্তব-বিশেষ!
কি হেরিছ ধামানন্দ,
বিমোহিত রয়েছ যে চাহি?

ধামানন্দ। বাণী—

হিড়িম্বা ও প্রাণব্রহ্ম। বাণী!

ধামানন্দ। বাণী—বাণী ঐ ফুটিছে আকাশে,
হাসে, হাসে, কথা কয়—
ভাসে আসি শ্রবণে আমার!

হিড়িম্বা। কে কহে এ বাণী?

ধামানন্দ। নিরাকার পরব্রহ্ম শুনাইছে বাণী—
শ্রীমুখেতে ফুটিতেছে ভাষা,
শোন নাকি তাহা?
ঐ—ঐ—ঐ পুনঃ ভাষে—
মধুর আবেশে
ব্রহ্ম মোর ক'ন কথা।
মধুর মধুর বাণী—অতীব মধুর।
ব্রহ্ম! ব্রহ্ম! হে পরম-পিতা!
ধামানন্দ হৃদয়-আনন্দ—

রজতমুদ্রার বহু গন্ধ-স্পর্শ সম !
পালিব আদেশ তব,
তব কার্য্যে নিয়োজিত দেহ—
উৎসর্জ্জিব তোমারি লাগিয়া।
হে হিড়িম্বা,
শুনেছ কি মহাবাণী কহিলা যা পরব্রহ্ম মোরে ?

হিড়িম্বা। শুনি নাই—

ধামানন্দ। পরব্রহ্ম অপরূপ রূপে
নিজে আসি কহিলেন মোরে—
বড় ভালবাসি আমি তোরে
তাই কহি আদেশ আদেশ আমার,
ভক্ত তুমি করহ পালন।
গেছে চলি রাজা বহুদিন,
শিবনাথ, মহর্ষি দেবেন্দ্র—
মাতৃরূপ-সাধক কেশব—
একে একে নিভেছে দেউটী !
ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচার-বিহীন
শাখাকাণ্ডহীন
ছিন্নমূল-দ্রুম সম !
এক দিন ছিল বটে, আলোকের আশে
এ ধর্ম্ম অনলে আসি পুড়িয়া মরিত
দলে দলে পতঙ্গেরা।
সে আলোক সাকারেতে পশিয়া গিয়াছে,
নবযুগে নবীন উষায়—
হায় ! হায় ! হায় !

অন্ধকার ব্রহ্মের গহ্বর !
কিছু কিছু করি আকর্ষণ
আনিত রে ব্রহ্মের কুমারী যত
ইস্কুলের বিদ্যা আর কণ্ঠের সঙ্গীতে—
লীলাপূর্ণ কোর্টসিপে—
চিকের আড়াল ছাড়ি হইয়া বাহির।
সে পথও রুদ্ধ হেরি আজ
সাকারী সমাজ—
তাহারও রমণী আজ অশিক্ষিতা নহে ;
গৌরীদান বন্ধ হয়ে কন্যা-সম্প্রদান
যুবতীর, সমাজে তাহারি স্থান।
কৃশ অঙ্গ, নুব্জ দেহ ব্রহ্ম-রমণীতে
কে আর মজিবে বল ?
সেই হেতু ব্রহ্ম-গৃহ শূন্য ক্রমে ক্রমে,
চর-পড়া শ্যাওলা-ভরা মড়া নদী সম।
বৎস তোর
উপায় করিতে হবে কিছু।

হিড়িম্বা। সত্য, সত্য ব্রহ্মতেজ প্রচার অভাবে
সঙ্কুচিত—
মূঢ় মোরা না করিনু কিছু এতদিন
ভাবনা বিহীন
পড়িয়া রহিনু শুধু পরব্রহ্মকূপে
দু'নয়ন সযতনে মুদি !
কিন্তু বাপু ধামানন্দ,
প্রিয় ভ্রাতা প্রাণব্রহ্ম,
প্রচারের তরে মোরা কি করিতে পারি ?

প্রাণব্রহ্ম। একযুক্তি মনে লয় মোর—
কহি তাহা সবার সকাশে,
কর—যদি হয় অভিমত।

ধামানন্দ। বল, বল কি যুক্তি তোমার?

হিড়িম্বা। দিনে দিনে হিন্দুগণ রিফর্ম্মড্ হইছে।
রিফর্ম্মের ভাণে
ক্রমশঃ ঢালিতে হবে বিষ—
Slow poisioning-এ তার
বহমান জীবন-প্রবাহে
ত্বরায় আনিতে হবে জরা।
অচিরেতে তাহ'লেই আসিবে সেদিন
তাধিন—তাধিন—
হিন্দুরা সকলে মিলি ব্রহ্মেরে ভজিবে।

হিড়িম্বা। মন্দ নয় তব যুক্তি।
কিন্তু তাহা কেমনে করিবে?

প্রাণব্রহ্ম। নিরাকারী হিন্দু বলি বাখানিতে হবে
আগে আপনারে।
তারপর সেই নিরাকার
সাকারের মাঝে যাবে ডুবি
সাকারেরে করিয়া তুলিবে
ক্রমে নিরাকার,
বৃত্ত যথা বিন্দু হ'য়ে শেষে
অসীমেতে পায় লয়।
আছে হিন্দু সভা আর হিন্দুর মিশন
নিরাকারী হিন্দু মোরা ঢুকিব তাহাতে—
ক্রমশঃ করিতে সব গ্রাস।

হিড়িম্বা। যুক্তি তব মনে লাগে বটে,
কিন্তু কার্য্যে করে পরিণত
কেবা ইহা?

প্রেষ্টিশ ছাড়িয়া
হিন্দু বলি খোয়াইবে নাম
নিরাকারী সমাজেতে কেবা?
হিন্দুরা কেনবা গ্রাহ্য করিবে তাহারে?

ধামানন্দ। তোমাদের সম্মতি পাইলে
অসাধ্য সাধিতে পারি আমি।
হাতে আছে ত্রিপল কাগজ
সেই ত্রিফলার ফালে
সাকারের বুক চিড়ি করিব প্রবেশ—
ফাল হ'য়ে বাহিরিব পুনঃ।
আমি যদি মিশিবারে চাই—
মূর্খ তারা আমারে ভজিবে
শেষেতে মজিবে
সবংশে—স্বদলে সবে!
সভা-সম্মিলনে তার
পতি হ'য়ে ভজাইব সবে নিরাকার
ব্রহ্মের বাহার
তখন হেরিবে সবে।
আমার বেতনভোগী ভারবাহী জীব
মুট্‌কো সজনে আছে,
তারে দিয়া শনিচক্র করিয়া গঠন

মাসে মাসে গালি দিব হিন্দু সবাকারে।
হিন্দু দেব-দেবী নিন্দি
হিন্দু সন্ন্যাসীরে ভণ্ড বলি গালি পাড়ি'—
হিন্দুর সাহিত্যে আর লোকাচারে তার
নিন্দি' নিন্দি' অতিষ্ঠ করিবে।
দুর্নীতি প্রমুখ কৃতী হিন্দুগণে আনি
সসম্মানে বসাইয়া দিয়া
সুকৌশলে গড়া শনিচক্রে
পতনের পথ দিব করি পরিষ্কার।
এই মতে গুপ্তবাণে বিঁধিয়া হিন্দুরে
শনিচক্রে ষট্‌চক্র করাইবে ভেদ।

প্রাণব্রহ্ম। ধন্য, ধন্য ধামানন্দ—
এত বুদ্ধি তব ঘটে!
এ কার্য্য তোমারি যোগ্য বটে।
কি বল সখা হিড়িম্বা?
তুমি তো সেবার
একচালে করিতে কাবার
সরস্বতী পূজা লয়ে বাধায়ে বিভ্রাট
পরিত্রাহি ডাক ছাড়ি পাইলে নিস্তার!
সে চাল তোমার ভুল,
কিন্তু অন্যচালে
একত্রেতে ছাত্র-ছাত্রী এক ক্লাশে রাখি
তীক্ষ্ণ বুদ্ধি পরিচয় দিয়েছ কিঞ্চিৎ
হইতে বা পারে কিছু উপকার ইথে।

হিড়িম্বা। ব্রহ্ম! ব্রহ্ম!

ধামানন্দ যোগ্য শিষ্য মম—
চিরদিন সুকৌশলী
সরলতা-আবরণে ঘোর ডিপ্লোম্যাট!
যাও ভাই, ব্রহ্মপদ স্মরি
ভাসাইয়া দাও ভগ্ন তরী
দুস্তর সাগর পরি।
সাকারের আকার যদি বা
পায় লোপ কোনকালে
তোমা হতে পাবে তাহা।
নিরাকার প্রভু মোর
ঊর্দ্ধ হ'তে বাড়াইয়া হাত
ঐ হের করে আশীর্ব্বাদ—
সে আশীষ শিরে ধরি হও অগ্রসর।

প্রাণব্রহ্ম। আঃ—
জুড়াইয়া গেছে 'চা'
ভৃত্যে কহ দিতে 'কাপ্'—
ব্রহ্ম-চিন্তা চা নহিলে হয়নাক' ভালো।

———

মিটিংএ চল্

বেলা যে পড়ে এল, মিটিংএ চল্—
পুরাণো সেই সুরে কাগজে লিখিল রে
কোথা সে মৃজাপুরে কোথা সে স্থল,
কোথা সে ঘেরা পার্ক, ঘাসের দল।
ইয়ার জন সনে কে রহে গৃহ কোণে
কাগজে লিখিলরে মিটিংএ চল্!

চস্‌মা ফাঁকে ফাঁকে চাহনি বাঁকা
পথের দুইধারে রেলিঙের ঐ পারে
যেখানে হেলে পড়ে গাছের শাখা—
জানালাগুলি তলে কী রূপ ঝলমলে
চকিতে ফুটে মুখ ঘোমটা ঢাকা!
বাঁকায়ে আঁখিটীরে চুরিটী করি ধীরে
বারেক দেখে লই অমিয়-মাখা।

এখনো স্মৃতি মনে যায়নি টুটি—
মিটিঙে আসিতাম কত না ছুটি!
উছল কল কল বকুনী অনর্গল
কথার খই যেত অবাধে ফুটি।

আসিয়া ধেয়ে ধেয়ে আগ্রহে কান দিয়ে
কতনা শুনিতাম বক্তৃতা দুটী।
বাড়ায়ে জোড়া আঁখি শিশিরে বসে থাকি
উৎসাহে সারা মন পড়েছে লুটি!

বক্তার পরে বক্তা—বক্তার শেষে—
কত না চীৎকার আকাশে মেশে—
বুলি সে পুরাতন ফনোগ্রাফের সম
কখনো কাঁদুনে সুরে, কখনো হেসে।
বাক্য অনল-শিখা ঝলসি' দেয় দেখা
জটলা করে যত পড়ুয়া এসে।
কথার জাল বুনি' আনিবে শুধু জানি
স্বরাজ একদিনে অরাজ দেশে!

হায়রে বাঙ্গালী শীর্ণ কায়া—
এমন দেশোদ্ধারী নেতার দল ভারী
উপেক্ষা কর তায়—নাহিক' মায়া!
এমন খোলা মাঠ বক্তৃতার পাট
সঘন করতালি আলো ও ছায়া!

বক্তৃতা মাথা-মুণ্ড যদি না বোঝে
কেহ কি আর তার মানেটা খোঁজে?
নেতার নাহি দোষ— সকলে পরিতোষ
স্বরাজী ধরণের নমুনা ওযে!
মিটিংএ স্বদেশী— তাইতো মেশামেশি
ভাবের বশে কেহ নয়ন বোজে!

কেহ বা করতালি, 'হিয়ার' কেহ
কেহ বা 'শ্যাম শ্যাম' 'হুররে' কেহ
যতই নাচা নাচি নাহিক বাছা বাছি
শুনিয়া যায় সবে তুলায়ে দেহ।

ভারতবাসী ওরে কোথা কে আছো—
ভুলিয়া দেশ-মায়ে আছিস হাঁগো ?
স্বরাজ তরে আর বাক্য-তরবার
খুলিয়া জয়-ডঙ্কা বাজাবি না গো ?

তুলিয়া সবে হাই চল না রণে যাই—
মুছিয়া আঁখিজল জাগো রে জাগো
যদিও কাতরম্ 'বন্দে-মাতরম'
বলিয়া দেশ মার বিজয় মাগো।

ধার আছে বাক্যের এ তরবারে—
ঝাল আছে লঙ্কার খোসার হা রে
প্রতাপ-চাঁদ রায় এরা কি কম তায় ?
মালসী-মেলা ফাটে বাক্য-ভারে।

সহসা আয় চলে আপনা ভুলি।
ব্যাকুল ছুটে আয় দুয়ার খুলি।
বাক্য-গোলা ছাড়ি রাজ্য নিবি কাড়ি
পালাবে ব্রিটিশেরা পটল তুলি।

দেবেনা স্বরাজ তারা দেবে না কিলো ?
সাধ্য কিগো তার বাক্য-তরবার

রোধিবে বন্দুকে মিশ্‌মিশে কালো !
তাহার চেয়ে বোবা থাকাও ভালো।

আয়লো আয় স্কুল-পালানো দল—
বেলা যে পড়ে এলো মিটিঙে চল্।
করিস্‌নি হেলা-ফেলা চল্‌রে এই বেলা
ডুবায়ে পড়াশুনা অতল তল—
স্বদেশ-হিত তরে মিটিঙে চল।

———

ক্ষীর ও নীর

রবীন্দ্রনাথের অনধিকার চর্চ্চা

বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথ সম্প্রতি দুইটি বিভিন্ন প্রবন্ধ দুইটি বিভিন্নদেশে প্রকাশিত করিয়াছেন। একটির নাম "ইউরোপ কি জড়বাদী ?" উহা ক্যানেডিয়ান ফোরাম নামক ক্যানাডার এক কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে। অপরটি বোম্বাই সহরের "টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া"র ২০শে অক্টোবর তারিখের সংখ্যায় "আজিকার ভারত" এই শিরোনামা লইয়া বাহির হইয়াছে।

প্রথম প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে ইউরোপ কেবল মাত্র জড়বাদী নহে। তাহার কার্য্যাবলী ও ইতিহাসের ধারার ভিতর একটা অধ্যাত্ম আছে। হইতে পারে ইউরোপ religion বলিতে যাহা বুঝায় তাহাতে বিশ্বাস হারাইয়াছে, কিন্তু মানবতায় বিশ্বাস হারায় নাই। তাঁহার মতে ইউরোপের মানবচেষ্টার আদর্শ প্রকৃতই আত্মার সহিত সংশ্লিষ্ট। জ্ঞানে, সাহিত্যে, শিল্পে ইউরোপ যে বন্ধনহীনতা

লাভ করিয়াছে তাহাতে জড় হইতে যে তাহারা মুক্ত, তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিমানযানে সে প্রকৃতিকে জয় করিয়াছে, যমকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়াছে, দেবতার স্বত্ব যে উড্ডীয়মান হওয়া, সেই স্বত্ব অর্জ্জন করিয়াছে। ইউরোপে মন্দ যাহা কিছু আছে তাহার কোনটাই জমাট বাঁধিয়া নাই, কেন না ইউরোপের মানব-প্রকৃতি সদাই জাগ্রত। কবিবরের মোট বক্তব্য এই কয়টি কথা।

কবিবর কিন্তু কাহার সহিত দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত, তাহা বেশ স্পষ্টভাবে বলিতে পারেন নাই। ইউরোপ জড়বাদী একথা ক্যানেডার লোকে বলে কি না তাহা আমরা জানি না। তবে ইউরোপের সভ্যতার পিছনেও একটা অধ্যাত্মবাদ আছে, তাহা বলিলে বা লিখিয়া প্রশস্তি জ্ঞাপন করিলে ক্যানাডার লোকের আত্মাভিমান একটু বাড়িয়া যায় ও সঙ্গে সঙ্গে ভারতের আধ্যাত্মিকতার দাবির লাঘবতা ভারত সন্তানের মুখে ফুটিয়া উঠিলে ভারতের বৈশিষ্ট্যকে কবি-কল্পনা বা দম্ভ করিবার অবসর লাভও ঘটিয়া যায়—এ সমস্ত বুঝিয়া বোধ হয় কবিবর ঐ প্রবন্ধ লেখেন নাই। তাঁহার কবি-প্রকৃতি 'নিরঙ্কুশা কবয়ঃ' ধরিয়া তিনি বিশ্বকবি ধরিয়া মনে করেন, বিশ্বের লোকও তাঁহার লেখাকে মাত্র কবির উক্তি বলিয়াই গ্রহণ করিবে। এই প্রবন্ধের দ্বারা ক্যানেডাবাসীর আত্মাভিমান বেশ একটু পরিতৃপ্ত হইবে।

দ্বিতীয় কথা এই, ঐ মদগর্ব্বিত শ্বেতচর্ম্মজাতির ভিতর কবিবর ভারতীয় সামাজিক ব্যবস্থার ও সাধনার যে নিন্দাবাদ করিয়াছেন তাহা ইউরোপের অনেক মনস্বীর অনেক গভীর চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়া অনেকবার বিদ্যাপীঠে, সামাজিক গোষ্ঠিতে, রাজনৈতিক আলোচনা-গৃহে, বাগ্মীদের চিন্তার অবসরে ইউরোপের প্রগল্ভ আত্মম্ভরিতার তুষ্টিসাধন করিয়াছে। কবিবরের পুনরুক্তিতে তাহাদের সেই প্রগল্ভতা পুষ্টিলাভ করিবে সন্দেহ নাই।

তিনি লিখিয়াছেন যে, ধর্ম্মের নামে আমরা যে শৃঙ্খল গড়িয়াছি সেই শৃঙ্খল সংসারের শতবন্ধন অপেক্ষা আরও অধিকতর আষ্টে পৃষ্ঠে মানবাত্মাকে শৃঙ্খলিত করিয়াছে। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, ইউরোপের মানব চেষ্টা বেদ-বিধির বাঁধনে পঙ্গু হয় না। তাহাদের চেষ্টা মানব হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে প্রবাহিত হয়, বাহিরের কোনও বস্তুর অপেক্ষা রাখে না। আমরা ভারতবাসী প্রকৃত জড়বাদী হইয়া পড়িয়াছি, বিশ্বাস ও সাহস হারাইয়াছি। পদ্ধতি ও অনুষ্ঠানের পবিত্রতায় বিশেষ আস্থা রাখি; অথচ ঐ সকল পদ্ধতি বা অনুষ্ঠানের কার্য্যকারিতা কি তাহা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। কাজেই ভূত, প্রেত, দেবতা, অসুর, দিন, ক্ষণ এই সব লইয়া বন্ধন সৃষ্টি করিয়াছি।

আমরা বহুদিন হইতে রবীন্দ্রনাথের এই সকল চিন্তার সহিত পরিচিত। "হিং টিং ছট্" যখন লিখিয়াছিলেন তখন হইতে আরম্ভ করিয়া অচালয়তনের যে ভূতের প্রাসাদ তিনি গড়িয়াছেন তাহাতে যে নিজেই বন্দী হইয়া জীবনব্যাপী হা-হুতাশ করিতেছেন তাহা সংস্কার-ধ্বজীর কৃপায়তনে দেখিতে পান না, এই যা দুঃখ। ধর্ম্মের নামে শৃঙ্খল বলিয়া ঐ শৃঙ্খল ভয়ে তিনি তাঁহার মন সংস্কারপন্থী ইউরোপের অন্তঃসলিলা প্রস্রবণের ১৮৩৪ সালের শিক্ষার ডেস্প্যাচে সৃষ্ট কূপের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাঁহার ভিতরই পড়িয়া আছেন। হইতে পারে, সে প্রস্রবণ শুকাইতেছে না, কিন্তু সে কূপের দিগ্‌বিদিক্ যে অভ্রভেদী প্রাচীরে বেষ্টিত এবং তাহার ভিতরের সকলেরই মন যে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য তাহাই অত্যন্ত বিয়োগান্তভাবে প্রকট হইয়াছে ও হইতেছে।

বেদ-বিধির বাঁধন নাকি পঙ্গু করিতেছে? ভূত, প্রেত, দেবতা, অসুর দিন, ক্ষণের বন্ধনই কেবল চোখে পড়ে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিধি-নিষেধ, পঞ্জিকা, দেবতা, অসুর থাকা সত্ত্বেও ঐ অর্ব্বাচীন ঐতিহাসিক

যুগেও অশোক, রাণাপ্রতাপ, শিবাজীর মত রাজশক্তি ; শঙ্কর, রামানুজ, তুকারাম, রামদাস, নানক, চৈতন্যের মতন অধ্যাত্মশক্তি এবং অভ্যুত্থান-পতনের ইতিহাসও সম্ভব হইয়াছে—এ সকল কথা কি একেবারেই ভুলিতে হয় ? বিধি-নিষেধ কি আমাদের জাতীয় প্রকৃতির সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে প্রাণস্পন্দনে স্পন্দিত নয় ? আমার "স্ব" বলিতে যাহা কিছু, নিজস্ব বলিতে যাহা লইয়া পরিচিত, আমার আমিত্ব লইয়া যে ইতিহাস তাহা বাদ দিলে এবং বাদ দিয়া কোন স্বাধীনতার আলেয়ার জন্য আমরা ছুটিতেছি তাহা কবিবরও বলিতে পারেন না, কবিবরের ক্যানাডিয়ান বন্ধুগণও ধরিতে পারেন না।

বলা বাহুল্য, একথা ভুলিলে চলিবে না যে, আমরা ভারতবাসী আজ ঘোর তমসাচ্ছন্ন এবং ইউরোপ রজোগুণাচ্ছন্ন বলিয়াই তমের উপর তাহার এই আধিপত্য স্বাভাবিক ও বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধানে অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু দুঃখ এই যে আমরা যদি এই রজোগুণকেই মানব-সভ্যতার চরম বলিয়া লেখায়, ভাবে বা স্বার্থসংঘাতে মানিয়া বসি, তবে ভারতের এই তমোকেই আরও গভীরতর করিয়া ফেলিব না কি ?

ভারতের ধারাকে বজায় রাখিতে গেলে ইউরোপকে গালি দিলেও চলিবে না, ইউরোপের অভিমানকে তোষামোদ করিলেও চলিবে না। "নাহংসৌ ধর্ম্ম যত্র ন সত্যমস্তি, ন তৎ সত্যং যচ্ছলে নানুবিদ্ধম্।" ভারতের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম ইহাই। এই ধর্ম্ম ইউরোপের religion নহে। সত্য কথা বলিতে গেলে এবং সত্যকে চিনিতে গেলে, ইউরোপের ঘটনা-পরম্পরায় যাহা প্রতিপন্ন, তাহাই দেখিব। গ্রেট-ব্রিটনের নারী স্বাধীনতার বাৎসরিক অধিবেশনে ম্যাঞ্চেষ্টারের বিশপ সম্প্রতি ইংলণ্ডের বিবাহিত যুবক যুবতীকে উৎসাহিত করিয়া বর্ত্তমানের যুবকগণকে বলিয়াছেন যে, বিবাহই পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশীদারি (partnership)। এক পক্ষে এই প্ররোচনা, অপর পক্ষে বাস্তবটি কি ? গত

সেপ্টেম্বর মাসের তথাকার আদালতের মামলার তালিকায় দেখা যায়—যে ৯৫০টি বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা বিচারাধীন, তন্মধ্যে ১১০টিতে কোনও প্রতীবাদী নাই, গত বৎসর এই তালিকা ছিল ৭১১টি এবং এই বৎসরের গত ত্রৈমাসিক লিষ্ট ছিল ৫১৫টি। লণ্ডনের আদালতে বাৎসরিক বিবাহবিচ্ছেদ সংখ্যা ৩০০ হাজার। কবিবর হয়ত এ সকল তথ্য হইতে কোনও মন্তব্য করিবেন না কিন্তু তিনি কোনও স্পষ্ট মত না করিলেও তাঁহার অনেক শিষ্য প্রশিষ্য আছেন, যাহারা এই বাস্তব জানিয়াও হয়ত বলিবেন, তা'তে কি ?

বিবাহবিচ্ছেদে ইউরোপ জড়বাদী কি না তাহার বিচারণীয় কিছুই পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু দেহদাবী তাহা ত আর অস্বীকার করা যায় না। নিন্দার কথা বলিতেছি না। কিন্তু সমস্যা পূরণ হইতেছে না, হয় নাই হইবার নহে। এই একমাত্র বিবাহ সমস্যা লইয়া যে ক্রন্দনের রোল ও বিদ্রোহের ডঙ্কা উঠিয়াছে তাহা অধ্যাত্ম-শক্তি কিনা তাহা বলিবার বা বুঝিবার ধৃষ্টতা আমরা করিতে চাহি না। আমরা চাই ঘর সামলাইতে। কবিবর তাঁহার ক্যানেডার বন্ধুদের খাতিরে আমাদের রক্ষা করিবার শক্তিকে খর্ব্ব করিয়াছেন তাহাই আমাদের বক্তব্য।

কবিবরের দ্বিতীয় প্রবন্ধের বক্তব্য অর্থ নৈতিক সমস্যা, সাধন সমস্যা, স্বাধীনতার আকাঙ্খা—অনেক কিছুই। অনেক কথাই স্বীকার করেন। "In my opinion the only prblem before us is to find again the ancient life stream of the villages"। কবিবরের মতে আমাদের একমাত্র সমস্যাই কেমন করিয়া গ্রামের প্রাচীন জীবনী-স্রোত খুঁজিয়া পাইব। Villages are being eaten up by the cities, সহরগুলি গ্রামগুলিকে খাইয়া বসিতেছে। প্রাচীন ভারতের গ্রামে গ্রামে কি করিয়া বিদ্যার চর্চ্চা হইত, তাহার উজ্জ্বল চিত্র

দিয়াছেন। কিন্তু কি করিয়া কোন্ আধ্যাত্ম শক্তি বলে এই সামাজিক সর্ব্ববিধ কল্যাণ শক্তি খেলা করিত তাহা ভাবিয়া দেখিবার কোনও লক্ষণ এই প্রবন্ধেও নাই, আর বোধ হয় জীবনেও চেষ্টা করেন নাই।

ভারতের ইতিহাসে জাতি-সমন্বয় একটা লক্ষণ বলিয়া তিনি বর্ণনা করিয়াছেন এবং এই জাতি-সমন্বয় কার্য্যে তিনি নানক, দাদু, কবীর, রামমোহন, রাণাডেকে যুগ যুগান্তরের ভিতর খুঁজিয়া পাইয়াছেন। এই সমস্ত মহাপুরুষের নাম স্মরণীয় এবং চিরস্মরণীয় থাকুক। কিন্তু জাতি সমন্বয় কার্য্য যে এই কয়জনই করিয়াছেন, এই দাবিটী একটু অসঙ্গত নহে কি? "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" যাঁহার কথা, তাঁহাকেই হিন্দু ভারতের সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে করে। সুতরাং সমন্বয় চেষ্টাই ভারতের সাধনাকে অন্যান্য দেশের সাধনা হইতে বিশিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। তবে নানক কাহাকেও ঈশ্বর তুল্য বা অভ্রান্ত জ্ঞান করেন নাই পরন্তু সমাজ-সংস্কারী ছিলেন। কবীর শাস্ত্র-পণ্ডিত মোল্লাকে তুল্যরূপে নিন্দা করিয়াছেন, দাদু মন্দির ও মূর্ত্তিনিন্দা করিতেন, রামমোহন মূর্ত্তি নিন্দা করিয়াছেন এবং রাণাডে সমাজসংস্কারক। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ ভারতের ইতিহাসে বাছিয়া বাছিয়া ইহাদের লইয়াই মালা গাঁথিয়াছেন।

দুঃখ এই যে ইংরাজী শিক্ষিতের অনুচিকীর্ষার নিন্দা করিতেছেন ঐ ইংরাজী-শিক্ষার প্রবর্ত্তক যে ঐ রামমোহন। ইংরাজীনবিশ সিভিলিয়ান ৺ রমেশচন্দ্র দত্তের জামাতা, আজীবন ভারতের ইতিহাস আলোচক প্রবীণ চিন্তাশীল শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু আজ স্পষ্টই বলিতেছেন যে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর প্রাঙ্গণে যে জয়লাভ হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা গভীরতর ও ব্যাপকতর জয়লাভ হইয়াছে ১৮৩৫ সালের ইংরাজী-শিক্ষার প্রবর্ত্তনে।—শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ।

হিন্দু ধর্ম্ম

'ধর্ম্মের তত্ত্ব ও সাধন' নামক একখানি নূতন পুস্তক বাহির হইয়াছে। লেখক অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বেদান্তবাগীশ এম-এ। ১৩৩৪-এর অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত সীতানাথ দত্ত তত্ত্বভূষণমহাশয় এই পুস্তকের এক সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছেন। সমালোচনাটি অত্যুচ্চ প্রশংসার একটি একটানা প্রবাহ। তাহাতে কাহারো আপত্তি থাকা উচিত না। শুধু বিজ্ঞাপন দেখিলে বই একখানা কিনিয়া ফেলিতাম। কিন্তু সমালোচনায় পুস্তক সম্বন্ধে যাহা জানিলাম, তাহাতে বিশেষরূপে বিস্মিত হইলাম। লেখক প্রমাণ করিয়াছেন—

(১) প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম একটী উপধর্ম্ম।
(২) পুরাণগুলি রূপকথা।
(৩) দেবতাবাদ মিথ্যা।
(৪) শ্রীকৃষ্ণের আখ্যান সৌর রূপক।
(৫) অবতারবাদ কল্পনা।
(৬) স্মৃত্যুক্ত অনুষ্ঠানগুলি আবর্জ্জনা।
(৭) হিন্দুরা পৌত্তলিক। পৌত্তলিকতা বর্জ্জনীয়।
(৮) ব্যক্তিবিশেষের জীবন-চরিত ধর্ম্মজীবনের অনিষ্টই সাধন করিয়া থাকে।
(৯) নিউটেষ্টামেণ্ট্ মিথ্যাকাহিনী। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সমালোচকমহাশয় অনুগ্রহ করিয়া পুস্তকের যে সার-নির্ষর্ষ দিয়াছেন, এই সব আইটেম্ তাহার অন্তর্গত।

পঞ্চাশবৎসর পূর্ব্বে বাংলাদেশে এই জাতীয় সমালোচনার কিছু কিছু প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। এই ১৯২৭ খৃষ্টাব্দেও কোনো বিজ্ঞ বিচক্ষণব্যক্তি অসাধারণ প্রয়াস করিয়া এই সমস্ত অভিনব অভিমত হিন্দুর দেশে প্রচার

করিতে ইচ্ছা করেন, এ ধারণা আমাদের একেবারেই ছিল না। এই প্রকারের সমালোচনা সহেবদের কাছে বাঙ্গালীরা শিখিয়াছিল। ইহা ভারতীয় নহে, বিলাতী। ইহা সাহেবী কুসংস্কার-মূলক। এই সব কুৎসিত কুসংস্কার অদ্ভুত ভূতের মত এখনো কোনো কোনো বাঙ্গালীর ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়া রহিয়াছে—দেখিতেছি। যাহারা গতানুগতিক পল্লবগ্রাহী বিদ্যাবুদ্ধি, বিচার-তর্ক কৌশলাদির বলে গোপন-গুহা-নিহিত ধর্ম্মতত্ত্ব আয়ত্ত করিতে চান এই ভূতের বোঝা বহন করা তাহাদের পক্ষেব সম্ভব। ধর্ম্মবিষয়ে যাহাদের চিত্তের ভিত্তি গড়িয়া উঠে নাই এই প্রকার দায়িত্ববিহীন সমালোচনা তাহাদের ভয়ানক অনিষ্ট সাধন করে! স্কুল কলেজের ছাত্রেরা বিশেষতঃ এই সমস্ত অজ্ঞ সমালোচনা পড়িয়া যৎপরোনাস্তি দুর্ভোগ ভোগ করে। অনেক সময়ে ইহাতে চিরকালের মত তাহাদের ভগবদ্-ভাবনা-বৃত্তি নষ্ট হইয়া যায়। তাহারা আর কিছুতেই অবিশ্বাস অর্থাৎ পণ্ডিতী কুসংস্কারের অন্ধকূপ হইতে সহজ বিশ্বাসের আলোক-লোকে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারে না। বঙ্গদেশের তথা ভারতবর্ষের বহু পরিণত বয়স্ক ব্যক্তি এবিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারিবেন। লেখকের যে মীমাংসাগুলির কথা উল্লেখ করিলাম তাহা যে মিথ্যা এবং সঙ্কীর্ণতা, অজ্ঞতা ও অন্ধতামূলক—দেশের শিক্ষিত যুবক ও বালকবৃন্দের মঙ্গলের জন্য ইহা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। হিন্দুধর্ম্ম-তত্ত্বে যাঁহারা অভিজ্ঞ তাঁহাদিগকে এই কাজের জন্য করযোড়ে অনুরোধ করি।—শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা।

দুর্গা পূজায় আক্ষেপ

বিগত আশ্বিন মাসের প্রবাসী পত্রিকাতে উক্ত লেখক বেদান্তবাগীশ-মহাশয় 'দুর্গাপূজা' নামক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার কোন্ অংশটী ছাড়িয়া কোন্‌টি পাঠকের সম্মুখে এ প্রসঙ্গে উপস্থিত করিব, তাহাই

ভাবিতেছি। লিখিতেছেন—"বাল্মীকির রামায়ণে আছে যে, শ্রীরামচন্দ্র যুদ্ধে অবসন্ন হইয়া পড়িলে অগস্ত্য তাঁহাকে "আদিত্যস্তব" পাঠ করাইয়া উৎসাহিত করিয়া তোলেন। সুতরাং ব্যাপারটা 'solar myth'-এর অন্তর্গত হইয়া পড়িল। একথা সকলেই জানেন যে, গ্রহনক্ষত্রাদির অবস্থান ধরিয়া মানুষ যুগ-যুগান্তর কাল নানা আচার প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে। এইরূপ একটা আচারের যখন কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছিল, তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া অকাল-বোধন শ্রীরামচন্দ্রের ঘাড়ে চাপাইয়া পণ্ডিতেরা আপনাদের মুখরক্ষা করিয়াছিলেন।...শরতের একটি আচার ও উৎসবের ঘাড়ে একটি পূজা ও মূর্ত্তি চাপাইতে যাইয়া পণ্ডিতেরা অর্ব্বাচীন গল্পের সৃজন করিয়াছেন বটে, কিন্তু higher criticism-এর হাতে পড়িয়া এখন নাকানি চুবানি খাইতেছেন।...'আদিতে শারদীয়োৎসব গাছপালা লইয়া আনন্দ করিবার একটি আয়োজন মাত্র ছিল। এই ত বোলপুরে বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রনাথের বর্ষা-উৎসব হইয়া গেল। আমাদের (?) দুর্গাপূজা আদিতে তাৎকালিক শিক্ষা ও আচারানুমোদিত ঐরূপই কোন উৎসব ছিল।'...দুর্গাপূজার উপাদান ও উপকরণ কত জায়গা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা বোধ হয় কাহারও সাধ্য নাই, থাকিলেও সুদূরপরাহত। কিন্তু প্রতিমাখানা যে আকাশ হইতে কল্পিত, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আর্দ্রা নক্ষত্রেই রুদ্র, পার্শ্বেই অবস্থিত বৃষরাশি। সকলেই সব চিত্রে মহাদেবের পাশে বৃষকে দেখিয়াছেন,' ইত্যাদি।...আবার প্রতিমা লইয়া 'আকাশের নক্ষত্রগুলির অধিপতি ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি এক একটি দেবতা। যে কবির কল্পনায় আসিয়াছিল, যে চিত্রকর আঁকিয়াছিল, তাহারা অমর হইয়া রহিয়াছে। এ চিত্রে কার না মন গলে? চিত্রানুযায়ী আধ্যাত্মিক ভাবও যে যোগ করিয়া দিবার চেষ্টা হয় নাই, তাহা নহে। তবে ব্রহ্মদর্শনের পর চিত্র অঙ্কিত হয় নাই, কিন্তু চিত্র দর্শন করিয়া ব্রহ্মভাব

অর্পণ করা হইয়াছে। চিত্রানুযায়ী পুরাণ (myth) যে কল্পিত হইয়াছে, তাহা পুরাণ-কল্পনার পৌর্ব্বাপর্য্যায় অনুসারে—না হইয়া যায় না।—' 'সে কথা আর না' বলিয়া, ঐ ভাবে পাঠকের বাড়ীতে প্রতিমা 'পৌঁছাইয়া দিয়া' তাহাকে আর 'কুমারটুলীতে যাইতে' নিষেধ করিয়া শারদীয়া পূজার প্রাক্কালে লেখক বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা সমগ্র প্রবন্ধটি পাঠককে পড়িতে অনুরোধ করি। দেখিবেন ইহাতে নব্য-প্রত্নতত্ত্বের প্রচণ্ড ঝাঁজ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার অনাবিল স্পৃহা এবং higher criticism-এর অধিকারে দৃঢ়সঙ্কল্প—এ সকলই আছে। শাস্ত্র ও ধর্ম্ম আলোচনার গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে নবীন তরল সাহিত্যের ভাব-ভঙ্গীর অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ দেখিয়া পাঠক পুলকিত হইবেন। Authority Quote করিয়া আপন অনির্দ্দিষ্ট মতের সমর্থনেরও ত্রুটি হয় নাই—'চারিখানি রামায়ণের মধ্যে—অকালে বোধন করিয়া দুর্গোৎসবের কথা কোথাও নাই। পুরাণেও নাই—আছে দুই একখানা উপপুরাণে। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীই ইহার প্রচারক।" আধুনিক পণ্ডিতগণও রেহাই পান নাই—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন—দুর্গা পূজার প্রতিমাটী একটি অবান্তর বস্তু' 'স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে প্রতিমার সঙ্গে ধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই', এবং 'মনীষি' বিপিনচন্দ্রপাল বলেন, যার ব্রহ্মদর্শন হয় নাই, তার মূর্ত্তিপূজা মিথ্যার মিথ্যা' ইত্যাদি। আমাদের প্রার্থনা যে সকল Authorityর সমর্থনে লেখক আত্ম-মত প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহারা কোন্ কথার প্রসঙ্গে কোন কথার উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহা জ্ঞাপন করিলে এই প্রবন্ধের যথাযোগ্য পর্য্যালোচনা হয়। উপস্থিত লেখক নিজ কথাতেই "কোথাকার জল যাইয়া কোথায় দাঁড়াইয়াছে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য আর না দাঁড়াইয়া" আমাদিগকে অব্যাহতি দিয়াছেন এবং এই প্রবীণ-যোগ্য উপদেশের সহিত আলোচ্য বিষয় বা অন্তরের কথার সমাধান করিয়াছেন যে, 'ইহার পরেও বাঙালী যদি পূজার জন্য কুমারটুলীর দিকে তাকায় তবে তাহাতে তার আধ্যাত্মিকতার গর্ব্ব বজায় থাকে না'; প্রতিমার জন্য আর পাঠককে 'আর কুমারটুলীতে যাইতে' হইবে না, লেখকের কাছে দরখাস্ত করিলেই চলিবে; এই কথা লইয়া সমগ্র প্রবন্ধের আঁকে বাঁকে বহুবার ঘুরিয়া ফিরিয়া লেখক সর্ব্বশেষে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

মোট কথা প্রতিমা-পূজা খণ্ডন চাই—তাহা যে প্রকারেই হোক্। সেজন্য স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল আলোড়ন, এবং শারদীয়া সংখ্যায় প্রবাসীর অঙ্কে 'দুর্গ-পূজার' এত সমাদর।

'প্রবাসী'র পরবর্ত্তী সংখ্যায়ই (কার্ত্তিক, ১৩৩৬) সম্পাদক এইরূপ প্রবন্ধ ছাপিবার জন্য সুকৌশলে একটি অস্পষ্ট কৈফিয়ৎ দিয়াছেন; সঙ্গে সঙ্গে 'অন্য রকমের একটি কথা'য় পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধের ভাব বা spirit বজায় রাখিয়াছেন। বলিতেছেন—"প্রবাসী" সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমতের এবং নানাবিধ পূজাপদ্ধতির আলোচনার কাগজ নহে। কিন্তু কখন কখন সেরূপ আলোচনা হইয়া থাকে। সম্পাদকীয় ভাবে আমরা তাহা না করিতে চেষ্টা করি। অন্য লোকে তাহা করিলে কখন কখন আমরা সেরূপ আলোচনা ছাপিয়া থাকি। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ্য, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয় অধ্যাপক শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী দুর্গাপূজায় বলিদানের বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় মত সমেত একটি প্রবন্ধ প্রবাসীতে লিখিয়াছিলেন।' শাস্ত্রী মহাশয় বহুদিন হইল স্বর্গ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু এই এক মাসের মধ্যে বেদান্তবাগীশ মহাশয় যে প্রবাসীর অঙ্কে নানা শাস্ত্র হইতে গবেষণা করিয়া প্রতিমাপূজা বা দুর্গাপূজার শ্রাদ্ধ করিয়াছেন, তাহার নাম মাত্র উল্লেখ নাই!

সে যাহা হউক এক্ষণে সম্পাদক মহাশয় তাঁহার স্বকীয় 'অন্য রকমের যে একটি কথা' বলিয়াছেন, তাহাও প্রণিধান যোগ্য। কথা একটি হইলেও—শাখা তার তিনটি, (১) দুর্গাপূজা হাজার দোষের হইলেও এসময়ে এক পরিবারভুক্ত লোকের একত্র সমাগম বা

মিলন ও আনন্দ উপভোগ হয় বলিয়া, ইহার একটা গৌণফল আছে। কিন্তু (২) মুখ্যতঃ দুর্গাপূজা শক্তিপূজা, কিন্তু যাঁহারা দুর্গাপূজা করেন, তাঁহারা বাস্তবিকই শক্তিপূজা করেন কিনা তাহা ভাল করিয়া বোঝা দরকার—নতুবা জাতি এত দুর্ব্বল, পরাধীন ও পদে পদে পরাস্ত হইতেছে; আবার (৩) শক্তি দেবীও নারীরূপে পূজা পায়, অথচ এক্ষণে এদেশে নারীর উপর যে জঘন্য অত্যাচার হইতেছে, তাহা কোন নারীর প্রতি সম্মানের মোটেই পরিচায়ক নহে। এরূপ অবস্থা যে শক্তিপূজার পরিচায়ক নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। —শ্রীবিধুভূষণ দত্ত এম্-এ

(ভারতের সাধনা, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬)

Up With National Flag !

জাতি নাই মোর, জাতীয়-পতাকা তবুও তুলি
উঠিয়া দাঁড়াতে হইবে সেকথা কেমনে ভুলি !
আজো চলি চলি পা পা করি
অলস আলসে কত রব পড়ি
খাটিয়ার পরে ছড়ায়ে অঙ্গ ডাকিয়া নাক
কুম্ভকর্ণ অবতার হ'য়ে চৌদিক্ ফাঁক।

মোরা যেন তার গোয়াল-ঘরের শামলা গাই,
দুয়ে নিতে দুধ একটুখানিও কসুর নাই।
জাব্‌নার বেলা ভাব্‌না কেবল
দেয়-কিনা-দেয় একটী থাবল
হাবা বোকা গাই, পোক্ত খুঁটিটী, দড়িটী খাটো,
বড় ক্ষুধা পেলে আপনার গা আপনি চাটো।

নহে আর নহে, ছিঁড়িব এ দড়ি, বাঁকাবো শিং
গোয়াল ভাঙিব, লেজে চাটি দিব, লাফাবো ত্রিং।
না দিব দুইতে, না ছোঁব জাব্‌না
আমার পিত্তি আমার ভাব্‌না
মোর হাট হ'তে রাজপাট তব তুলিয়া লও—
অথবা আমার বিক্রম মানি সমীহ রও।

মরিয়াছে জাতি ? গড়িয়া উঠিবে—চিন্তা কেন ?
কত জাতি মরে, ওঠে তারা পুনঃ বাঁচিয়া হেন।
যে রক্ত বুকে জমাট বাঁধিয়া
রহিয়াছে, সেও উঠিবে নাচিয়া
ধমনী উঠিবে আবার ফুলিয়া জাগিবে দেশ
তালপাতা সেও সত্য সিপাইর পরিবে বেশ।

সৈনিক মোরা, সত্য সেকথা সন্দ নাই—
মিলিটারী বটে—পন্থা যদিও অহিংসাই।
কীল খেয়ে মোরা চুরি করি কীল
উল্টা ভাবনা—লাগে তব heel—
গান্ধী-রাজার অনুচর মোরা নিরামিষাহারী
নন্ ভায়লেণ্ট ভারতের এই নব মিলিটারী।

Long live King, এই এতদিন ছিল গরজন—
এবারে মুখেতে ফুটে—Long live revolution.
কিন্তু তাহাতে ভয় পেয়োনাক'
অহিংস যত নিরামিষ-খোকা

Revolution ভোতা তরবারে—মূল্য নাই।
না হয় সদলে জেলেতে তোমার লইব ঠাঁই।

তবুও তো মোরা জাতীয় পতাকা উড়াব আজ
জীর্ণ চীরের ছেঁড়া অঞ্চলে ঢাকিব লাজ।
নহে আর সব রক্ত-বরণ
রক্ত, সবুজ, সাদায় গড়ন
এ পতাকা যেন গৃহের ছত্রে এমনি রয়—
মৃত্যু-বরণে জাতির দৈন্য করিব লয়।

যে দেশে সর্দ্দা আইন ছিল ও আছে

পবিত্র বিবাহ-বন্ধনকে আইনের কবলে ফেলিয়া দিয়া শ্রীযুক্ত হরবিলাস সর্দ্দা ও তাঁহার মতাবলম্বীরা দেশকে পাপ-মুক্ত করিলেন ভাবিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়াছেন। ভারতের কুৎসা-প্রচারকারিণী সন্তানবতী কুমারী মিস্ মেওর স্বদেশবাসিনিগণ এই বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন যে, কুসংস্কাররত পাপাচারে অভ্যস্ত ভারতবাসীকে তাহার দোষগুলি সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দেওয়ার জন্য মেও-বিবির নিঃস্বার্থ পরোপকারিতা-প্রণোদিত প্রয়াস স্বার্থক হইয়াছে—মেও-সাহেবা চোখ ফুটাইয়া দিয়াছিলেন বলিয়াই সর্দ্দার দল আপনাদের যুগান্ত-সঞ্চিত পাপান্ধকার দূরীভূত করিবার জন্য একটী দিয়াশলাইর কাঠী জ্বালিয়াছেন।

অথচ ইহাদের নিজেদের দেশে যে ভীষণ পাপাচারণ চলিতেছে, সে সম্বন্ধে ইহারা সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁহাদের নিজেদের দেশে আমেরিকায় সর্দ্দার আইনের চেয়ে বহুগুণে বলবান্ আইন বহুদিন ধরিয়া রহিয়াছে—

চৌদ্দ-পনেরো কেন, সে দেশের মেয়েদের বিবাহ পঁচিশ বৎসর বয়সের নীচেই হয় কম। কিন্তু ব্যাভিচার সেখানে যেরূপ প্রকাশ্য ভাবেই চলিতেছে, তাহা শুনিয়া ভারতের ন্যায় সুসভ্য সমাজ লজ্জায় কানে আঙুল না দিয়া থাকিতে পারিবে না।

নিউইয়র্কের প্রায় সর্ব্বত্রই এক-একটা 'নাইট্ ক্লাব' আছে; নর-নারী রাত্রিতে এই ক্লাবগুলিতে সমবেত হইয়া পান আহার করে। কিন্তু শুধু পান আহার বলিলেই সব কথা বলা হয় না। এই ক্লাবগুলিতে সমবেত হইয়া পান-আহারের স্থলে বহু পাপ-পঙ্কিল কার্য্যও তাহারা সম্পন্ন করে। এই সকল পাপ-প্রথা বন্ধ করিবার জন্য ১৯০৫ সালে একটী সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এই সঙ্ঘ ১৯২৮ সালে তাঁহাদের ২৩ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফল একটী বিবরণীতে প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ বিবরণীর কতকাংশ এস্থলে উদ্ধৃত করা হইল—

"এই নিশীথ ক্লাবগুলিতে রাত্রে বহু নারীর সমাগম হয়। সাধারণের নিকটে এই নারীদের অভ্যর্থনা-কারিণী বলিয়া পরিচিত করা হয়। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ক্লাবে সমবেত হয় সম্পূর্ণ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে। প্রত্যেকটী ক্লাবে এমন দু'চারিজন লোক থাকে, যাহারা কেবল ধনবান লোক খুঁজিয়া বেড়ায়। বড় বড় অফিসগুলিতে ইহারা ঘন ঘন যাতায়াত করে। এই শ্রেণীর লোকগুলি প্রায়শঃ ট্যাক্সীচালক—সঙ্গতিপন্ন শিকার পাইলে মোটরে তুলিয়া লইয়া একদম ক্লাবে পৌঁছাইয়া দিয়া তবে তাহাদের অবসর।

"অনুসন্ধানের ফলে বুঝা গিয়াছে, অভ্যর্থনাকারিণিগণ সাধারণ বারবিলাসিনী ছাড়া আর কিছু নহে; অসদুপায়ে ইহারা যে অর্থ উপার্জ্জন করে, তাহার এক অংশ ক্লাবকে দিতে হয়। ঘর-ভাড়া বাবদও অবশ্য ক্লাব কিছু পায়।

"এই ক্লাবগুলি ছাড়া নাচঘরগুলিও পাপ-বিস্তারে সহায়তা করিয়া

থাকে। এক শ্রেণীর নাচঘরের দুয়ার সব সময় বন্ধ থাকে, ভিতরে নাচগান চলে। হঠাৎ কোন অপরিচিত ব্যক্তি অনুসন্ধানের জন্য ভিতরে প্রবেশ করিতে গেলে তাহাকে সে অনুমতি দেওয়া হয় না।"

উপরোক্ত সঙ্ঘের সভাপতি জেম্‌স্ পেডারসন লিখিতেছেন—

"নিশীথ ক্লাব এবং নৃত্যশালাগুলি নিউইয়র্কে পতিতা-বৃত্তি বিস্তারে বিশেষভাবে সাহায্য করিতেছে। হারলেস্ সহরে এই পাপ-ব্যবসায় ভীষণাকার ধারণ করিয়াছে, যাহা কল্পনায় আনা যায় না।

"আমরা সর্ব্বসমেত ৩৯২টী নাইট ক্লাব পরিদর্শন করিয়াছি; তাহার মধ্যে ৩৮০টী ব্যাভিচার স্রোতে ভাসমান। এই ক্লাবগুলিতে অভ্যর্থনা-কারিণীদের সংখ্যা ১০০০; তাঁহাদের অর্দ্ধাংশেরও অধিক পূরাদস্তর বারবনিতা না হইলেও ব্যাভিচার দোষে দুষ্টা। বহু অপ্রাপ্ত-বয়স্কা বালিকা পর্য্যন্ত এই জঘন্য পাপস্রোতে যোগদান করিয়াছে!"

এ সম্বন্ধে নিউ ইয়র্কের 'ওয়ার্ল্ড' পত্রিকা যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও উদ্ধৃত করা গেল—

"অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে, চিকাগো, সেণ্ট লুই, ডেট্রিয়ট্, ফিলাডেল্‌ফিয়া, লস্ এঞ্জেল্‌স্ প্রভৃতি সমস্ত বড় বড় সহরের অবস্থাই এই দিক্ দিয়া এক। ইহারা আইনের গণ্ডীর বাহিরে যথেচ্ছা পাপ-বিস্তার করিয়া থাকে। অপ্রাপ্তবয়স্ক নর-নারীর সম্মেলন ও ব্যভিচারের উপযুক্ত স্থান এই নাইট-ক্লাবগুলি।"

এই 'নাইট ক্লাবগুলিকে এদেশের পতিতালয়গুলির সহিত তুলনা করা সঙ্গত হইবে না। পতিতালয়ে যাহারা যায়, তাহারা পৃথক্ শ্রেণীর লোক—দাগী আসামীর মতো। উহাতে পতিতালয়ের প্রতি সাধারণ লোকের মনে ঘৃণার সঞ্চারে বাধা জন্মে না। কিন্তু এই নাইট-ক্লাবগুলি তথাকার জনসমাজে অনাদরণীয় বা অগৌরবের নয়। উহাতে যাহারা যোগদান করে, সকলকে জানাইয়াই করে; লুকোচুরি করিবার প্রয়োজন মনে

করে না। পুত্র পিতার, ছাত্র শিক্ষকের সম্মতিক্রমেই উহাতে যায়—মেয়েদের সম্বন্ধেও প্রায় এই কথাই বলা যাইতে পারে।

এবারে ইয়াঙ্কিস্থানের অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকাদের কথা ধরা যাক্। নিউইয়র্কের প্রথিতযশা বিচারপতি মিঃ বেন্ বি লিন্‌স্‌ডে একজন আদর্শ সমাজ-সংস্কারক বলিয়া পরিচিত। তিনি Revolt of Modern Youth নাম একখানা পুস্তকে আমেরিকার বালক-বালিকা-গণের নৈতিক জীবন যাপন সম্বন্ধে যে বিস্তৃত বিবরণী দিয়াছেন, তাহার কতকাংশ এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল—

"হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রীগণের পক্ষে এ একটা প্রশংসার বিষয় যে তাহারা পার্টিতে ও নাচে যোগদান করে—পরস্পর পাশাপাশিভাবে অশ্বারোহণে ভ্রমণ করে। চুম্বন ও মাখামাখি তাহারা আদৌ দুষ্ট মনে করে না। এই শ্রেণীর মাখামাখিতে বালিকারা অগ্রণী; তাহারা বালকদিগকে ডাকিয়া লইয়া যায়—প্রলোভন, এমন কি ভয় পর্য্যন্ত দেখাইয়া থাকে।

"বালিকাদের যৌবনোদ্‌গম অতি অল্প বয়সেই হয়। যৌবনোদ্‌গমের বয়স অনেক স্থলে তেরো চৌদ্দ বৎসরের বেশী নয়। অথচ সমবয়সী বালকেরা তখনো অপরিণত। এই অবস্থায় বালক-শিকারে নাচ ও অশ্বারোহনের প্রলোভন দেখনো ছাড়া তাহাদের উপায় কি?

"এই শ্রেণীর বালিকারা যে ইতর শ্রেণী সম্ভূত, এমত ধারণা করিবার প্রয়োজন নাই। ইহাদের সকলেরই সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত পরিবারসমূহে জন্ম—দেশের যাঁহারা গৌরব, যাঁহারা আদর্শস্থানীয়, তাঁহাদের ঘরেই এই ব্যাপার! ইহাদের বয়স চৌদ্দ হইতে সতেরোর মধ্যে।

"বালিকারা বালকদের লইয়া নাচে। নাচিতে নাচিতে তাহারা পরস্পরের সান্নিধ্য অনুভব করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। বালকেরা বালিকাদের বাহুবদ্ধ করিয়া লয়, মুখে মুখে—বুকে বুক লাগাইয়া নৃত্য

চলে। বালকেরা ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠে, বালিকাদের আপনার কাছে আকর্ষণ করিয়া লয়। বালিকারা মুচ্‌কি হাসিয়া তাহাদের দুর্দ্দশা দর্শন করে—নিজেদের বেপরোয়াভাবে তাহাদের হাতে ছাড়িয়া দেয়; দিয়া শিকারের মজা দেখে।

"পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের মধ্যে শতকরা নব্বই জন এই শ্রেণীর।

"অন্ততঃ শতকরা পঞ্চাশ জন বালক-বালিকা চুম্বন ও আলিঙ্গনের মধ্য দিয়া 'হাত পাকাইয়া' অচিরেই ব্যভিচার স্রোতে লিপ্ত হয়। শীঘ্রই ইহারা দুর্নীতি-স্রোতে গা ঢালিয়া দেয় এবং স্বাস্থ্য ও মেধাশক্তি জীবনের তরে হারাইয়া ফেলে।

"হাই স্কুলের ৪৯৩ জন বালিকার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে ২৫ জনকে গর্ভবতী দেখা গেল। আর আর মেয়েরা গর্ভবতী ছিল না বলিয়া যে সৎপথে পরিচালিত হইয়াছিল, এরূপ ধারণা করা ভ্রম হইবে। উহাদের মধ্যে অনেকেরই পুরুষ-সংসর্গ হইয়াছিল, কোথাও বা পূরা দমে চলিয়াছিল; কেবল গর্ভ-নিরোধের ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া রেহাই পাইয়াছে। গর্ভ-নিরোধের ব্যবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান ছাত্রীগণের মধ্যে অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার।

"৬০০ মেয়ে আমার কাছে পরামর্শ লইতে আসিয়াছে। তাহাদের কেহ গর্ভবতী, কেহ কুৎসিত ব্যাধিতে আক্রান্ত, কেহ বা অপরিমিত যৌন-সংসর্গের ফলে ভগ্ন-স্বাস্থ্য।

"একটী হাই স্কুলের ছাত্রের মুখে জানা গিয়াছে যে, পনেরোটি বালিকার সহিত তাহার সান্নিধ্য ঘটিয়াছে। উহাদের প্রত্যেকের সহিত তাহার অন্ততঃ দুইবার সংসর্গ হইয়াছে। কাহারও কাহারও সহিত বহুবারও হইয়াছে। বালিকাদের মধ্যে দু'একজন ভিন্ন সকলেরই গর্ভসঞ্চার হইয়াছে। "ইচ্ছা হইলে সে তাহার প্রায় প্রত্যেক সহপাঠিনীর সহিত অবৈধ সংসর্গ করিতে পারিত।"

* * * *

যে দেশের আদর্শের উপর নির্ভর করিয়া আমাদের দেশের তথাকথিত উদার দল উঠিয়া পড়িয়া সরদা বিল্‌টাকে আইনে পরিণত করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম এবং সামাজিক অবস্থার একটী তালিকা আমরা প্রস্তুত করিতেছি। এই সংখ্যায় তাহার কয়েকটী দেওয়া হইল।

১। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, এম. এ; বি, এল্; এম, এল, এ, কন্‌সেণ্ট কমিটির (সহবাস সম্মতি আইন) একজন মেম্বরও বটেন। তাঁর সম্বন্ধে আমাদের নিজে কিছু না বলিয়া Mr. J. C. Bhattacherjee প্রণীত **Mysteriss of Married life** নামক গ্রন্থে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাই উদ্ধৃত হইল—

Can there be anything more degenerating and more regretable than to have of Satyendra ch. mitra M. L. A., on the Board of consent committee? What is Satyendra chandra Mitra? It will be sheer waste of paper and ink and insult to the pen to say anything of his chracter. Even the shame is ashamed of herself to do so.....And he is the member of the consent committee?

সবটুকু আমরা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। বইখানাই পাঠককে পড়িতে অনুরোধ করিতেছি। তবে একথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি যে, তাঁহার মতে স্ত্রী-পুরুষ মাত্রই সঙ্গমে সম্মতি থাকা উচিত; ইহাই তাঁহাদের অভিমত। এমন দিলদরিয়া অভিমত সব সময়ে মিলে না।

২। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়—সম্পাদক প্রবাসী...প্রভৃতি এবং ইনিই (বাংলার) তথাকথিত হিন্দুমহাসভার সভাপতিরূপে এই বিল সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে ঐ পুস্তকে লিখিত হইয়াছে—

"Our ever respectful honourable Sj Ramananda

Chatterjee the renowned journalist is one of the strongest supporters of the Bill. Is he a Hindu or Hindu-Brahmo, or Brahmo? No, he is none. If he was a Hindu-Brahmo his daughters would not have been indulged in selecting their suitors from the Hindu Society. On the other hand if he were a Hindu, he would not have attacked the Hindu religion in the way he did in Prabasi. It has been also proved in a book named "Whether the Brahmos are Hindus" published by the Brahmo Mission that Brahmos are not Hindus. Non-Hindu cannot be a president of Hindu Sava, if that Sava be at all of Hindus and our Chatterjee was elected the president of Hindu Mahasava.

আমরা একটা কথা রামানন্দবাবুকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই—রামানন্দ বাবু কি জানেন যে,কোন উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্ম পরিবারে একটী 'ধাঁড়ী মেয়ে' (রামানন্দবাবুর কন্যার ভাষায় লিখিলাম) একটী শিক্ষিত গরীব হিন্দু ছেলের প্রেমে পড়িয়া তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিলে মেয়ের পিতা প্রথমে অমত করেন ; তৎপর উপায়ান্তর না দেখিয়া বৃদ্ধ পিতা তিন দিন শয্যাশায়ী থাকেন—তাহাতেও কোন ফল না হওয়ায় বিবাহ হয়। তবে বিবাহটা ঠিক হিন্দু ঘরের অকাল মৃত যুবকের শ্রাদ্ধের উৎসবের মত হইয়াছিল। যুবতী-বিবাহ পছন্দ করিলে কন্যার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ দিতে হইবে—এই কি ব্রাহ্ম-সমাজের বিল সমর্থনের নমুনা।

৩। শ্রীযুক্ত G, D. Birla & Bros—ঐ পুস্তক হইতে বিরলা ভ্রাতা-দিগের সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে এখানে লিখিত হইল—

"What are they? Are they not out-casted through

marriage with the untouchables? It is natural with them to break the society and equalise it with their own social status. বিরলা মহাশয়গণ বিবাহ আইনের উগ্র সমর্থক এবং G. D. Birala আইন সভার সদস্য। হিন্দুসঙ্ঘ তাঁহাদেরই ব্যয়ে এবং মতানুসারে পরিচালিত এবং এই সভার সভাপতি রামানন্দবাবুর সমর্থন পাইয়া উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করিয়াছিল, যে হিন্দুসভা "বিবাহ-বিল" সমর্থন করে।

এই হিন্দুসভা দ্বারা ভারতের কি ভয়ানক অবস্থার সৃষ্টি হইতেছে, তাহা যাঁহারা সমাজের জন্য একটুও চিন্তা করেন, তাঁহারা বোধহয় এখন কতকটা বুঝিতে পারিতেছেন। **ভারতে হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়ার অন্যতম প্রধান কারণ এই তথাকথিত হিন্দু মহাসভা।** হিন্দুর কর্ত্তব্য এই মহাসভার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিয়া ইহার অস্তিত্ব লোপ করা।

৪। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার—সম্পাদক আনন্দবাজার—এই মহা-পুরুষ সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইল—

"One of the members of this so-called Hindu Sava is Sj. Satyendra Ch. Majumder.....Did he not for the sake of amusements only in a feast in the house of Mr. Ataul Haque, Zeminder of the Circular Road take the meat forbidden to the Hindus with Mr. Akram Khan (Editor) and he is a Hindu? Men of this religious attitude are the stern supporters of the Bill with the motive of having the services of the girls advanced in puverty in the public functions. Would it not be safe for them to have the Divorce act passed to remove all sorts of

obstacles on their way to fulfil their mission ? I wish not to expose him, but he is well-known to Calcutta public."

কিছুকাল পূর্ব্বে 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় লিখিত হইয়াছিল যে "হিন্দুদের প্রতি মুসলমানের শ্রদ্ধা থাকিবে কি প্রকারে ? কোন মুসলমান জমিদার বাড়ীর নিমন্ত্রণে হিন্দুদিগের জন্য হিন্দু দ্বারা আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও এক হিন্দু বন্ধু আমার পকেট হইতে টাকা লইয়া সারকুলার রোডের রাস্তার দোকান হইতে **'কাবাব'** আনিয়া পরম তৃপ্তির সহিত তাহা ভক্ষণ করেন—ইত্যাদি। তবে কি ইহা সর্ব্বগুণাকর সত্যেন্দ্র মজুমদার সম্বন্ধেই লিখিত হইয়াছিল ?

বিবাহ আইনের প্রতিবাদের জন্য টাউনহলে ৺মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে যে সভা হয়—ঐ সভায় এই সত্যেন্দ্র মজুমদার এক নারী-বাহিনী পুরোভাগে যাইয়া উহার বিরুদ্ধতা করিয়াছিল। আর ইহারই নাম কোন ··স্কুল সম্পাদকেও শ্রুত হওয়া যায়—অন্যদিকে নারী উদ্ধারের জন্য ইনিই লম্বা গলায় আকাশ পাতাল ফাটাইয়া দিয়া থাকেন! সনাতনী সভাকে ইনিই 'সয়তানী সভা' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এত গুণ এর ভিতর আছে যে, তাহা লেখা অসম্ভব। গুণধরকে আমরা বিনয় সহকারে বলিতেছি যে, তিনি যেন ভবিষ্যতে নারী উদ্ধার সম্বন্ধে আর গলাবাজী না করেন কিংবা কোন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করিয়া তাহার অমর্য্যাদা না করেন। ইহাকে সম্পাদক রাখায়ই বোধহয় আনন্দবাজার পত্রিকার দিন দিন এমন উন্নতি হইতেছে! বিরলা মহাশয়গণ কি তাঁহাদের এই সভ্যটীর গুণগ্রামের বিষয় অবগত আছেন ?

উভয় সত্যেন্দ্রই সত্যেন্দ্র নামের সার্থকতা দেখাইতেছেন বটে। উভয়েই কি নলিনী সরকারের বন্ধু ?

৫। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র—এম্-এল্-এ—ইনিও সরদা বিলের সমর্থক ; তবে উগ্র নহেন—সমর্থন না করিয়া উপায় নাই—যেহেতু—নেহরুর আদেশ এবং বোধহয় নলিনীরঞ্জন সরকারের বন্ধু।

৬। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মতিলাল নেহরু—ইনি সকল স্বরাজী সদস্যগণকে এই বিল সমর্থন করিতে ফরমায়েস দেন। তাঁহার সম্বন্ধে বা তাঁহার পুত্র পণ্ডিত জহরলাল নেহরু সম্বন্ধে 'অবতার' পত্রিকা লিখিয়াছিলেন—ছৈয়দ হোসেনের সঙ্গে নেহরুকন্যা পলাইয়া যাইবার পরে বুঝিয়াছিলাম যে লোকে দেখিয়া না শিখিলেও ঠেকিয়া শিখে—কিন্তু ইহারা যে এতেও শিখিলেন না—ইহাই আশ্চর্য্য।

যাহাদের নিজেদের গৃহের পবিত্রতা নষ্ট হইয়াছে—তাহারা সকলকে একাকার করিতে যে যত্নবান হইবেন, তাহা নিশ্চিত।

শ্রীমতী রাজকুমারী দাস—এম এ, প্রিন্সিপাল বেথুন কলেজ—ঐ পুস্তক হইতে একটু তুলিয়া দেওয়া হইল—

"Because she is a lady principal She is omniscient." This Theory is not applied in the matter of religious questions of life & death. She is a Christian Lady. Her society is more than accustomed to tolerate all sorts of infections and corruptions resulting out of freedom to women and this after puberty marriage.

৮। কুমারী শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী এম, এ এবং কুমারী শ্রীমতী লীলা নাগ এম-এ সম্বন্ধে ঐ পুস্তক হইতে লিখিত হইল—.....

"They are always preceded by Miss. They have violated the laws of creation. They are criminials in the eyes of nature, They should not be entitled

obstacles on their way to fulfil their mission ? I wish not to expose him, but he is well-known to Calcutta public."

কিছুকাল পূর্ব্বে 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় লিখিত হইয়াছিল যে "হিন্দুদের প্রতি মুসলমানের শ্রদ্ধা থাকিবে কি প্রকারে ? কোন মুসলমান জমিদার বাড়ীর নিমন্ত্রণে হিন্দুদিগের জন্য হিন্দু দ্বারা আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও এক হিন্দু বন্ধু আমার পকেট হইতে টাকা লইয়া সারকুলার রোডের রাস্তার দোকান হইতে **'কাবাব'** আনিয়া পরম তৃপ্তির সহিত তাহা ভক্ষণ করেন—ইত্যাদি। তবে কি ইহা সর্ব্বগুণাকর সত্যেন্দ্র মজুমদার সম্বন্ধেই লিখিত হইয়াছিল ?

বিবাহ আইনের প্রতিবাদের জন্য টাউনহলে ৺মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে যে সভা হয়—ঐ সভায় এই সত্যেন্দ্র মজুমদার এক নারী-বাহিনী পুরোভাগে যাইয়া উহার বিরুদ্ধতা করিয়াছিল। আর ইহারই নাম কোন ··স্কুল সম্পাদকেও শ্রুত হওয়া যায়—অন্যদিকে নারী উদ্ধারের জন্য ইনিই লম্বা গলায় আকাশ পাতাল ফাটাইয়া দিয়া থাকেন ! সনাতনী সভাকে ইনিই 'সয়তানী সভা' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এত গুণ এর ভিতর আছে যে, তাহা লেখা অসম্ভব। গুণধরকে আমরা বিনয় সহকারে বলিতেছি যে, তিনি যেন ভবিষ্যতে নারী উদ্ধার সম্বন্ধে আর গলাবাজী না করেন কিংবা কোন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করিয়া তাঁহার অমর্য্যাদা না করেন। ইহাকে সম্পাদক রাখায়ই বোধহয় আনন্দবাজার পত্রিকার দিন দিন এমন উন্নতি হইতেছে ? বিরলা মহাশয়গণ কি তাঁহাদের এই সভ্যটীর গুণগ্রামের বিষয় অবগত আছেন ?

উভয় সত্যেন্দ্রই সত্যেন্দ্র নামের সার্থকতা দেখাইতেছেন বটে। উভয়েই কি নলিনী সরকারের বন্ধু ?

৫। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র—এম্-এল্-এ—ইনিও সরদা বিলের সমর্থক ; তবে উগ্র নহেন—সমর্থন না করিয়া উপায় নাই—যেহেতু—নেহরুর আদেশ এবং বোধহয় নলিনীরঞ্জন সরকারের বন্ধু।

৬। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মতিলাল নেহরু—ইনি সকল স্বরাজী সদস্যগণকে এই বিল সমর্থন করিতে ফরমায়েস দেন। তাঁহার সম্বন্ধে বা তাঁহার পুত্র পণ্ডিত জহরলাল নেহরু সম্বন্ধে 'অবতার' পত্রিকা লিখিয়াছিলেন—ছৈয়দ হোসেনের সঙ্গে নেহরুকন্যা পলাইয়া যাইবার পরে বুঝিয়াছিলাম যে লোকে দেখিয়া না শিখিলেও ঠেকিয়া শিখে—কিন্তু ইহারা যে এতেও শিখিলেন না—ইহাই আশ্চর্য্য।

যাহাদের নিজেদের গৃহের পবিত্রতা নষ্ট হইয়াছে—তাহারা সকলকে একাকার করিতে যে যত্নবান হইবেন, তাহা নিশ্চিত।

শ্রীমতী রাজকুমারী দাস—এম এ, প্রিন্সিপাল বেথুন কলেজ—ঐ পুস্তক হইতে একটু তুলিয়া দেওয়া হইল—

"Because she is a lady principal She is omniscient." This Theory is not applied in the matter of religious questions of life & death. She is a Christian Lady. Her society is more than accustomed to tolerate all sorts of infections and corruptions resulting out of freedom to women and this after puberty marriage.

৮।৯। কুমারী শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী এম, এ এবং কুমারী শ্রীমতী লীলা নাগ এম-এ সম্বন্ধে ঐ পুস্তক হইতে লিখিত হইল—.....

"They are always preceded by Miss. They have violated the laws of creation. They are criminials in the eyes of nature, They should not be entitled

to say anything in connection with marriage and consent age of girls……

১০।১১। Mrs. Latika Bose B. A., and Sreemati Mohini Debi—who and what are they? Thus the Woman-hood of Bengal is represented!

এই পাঁচ জন মহিলা কমিটির নিকট সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। ইঁহাদের কয়-জনকে হিন্দু বা মুসলমান সমাজের প্রতিনিধি বলা যাইতে পারে, তাহা জনসাধারণ বিচার করিয়া দেখিবেন। সাক্ষী নির্ব্বাচন করিয়াছিল কে? সত্যেনবাবু নহেন ত?

১২। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র—সম্পাদক 'সঞ্জীবনী'। কৃষ্ণকুমার-বাবুর আন্তরিকতা সম্বন্ধে কাহাও সন্দেহ করিবার কোন অবকাশ নাই। তিনি নিজে যাহা ভাল মনে করেন তাহা সমর্থন করেন—এই অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির আছে। তাঁহার বিশেষত্ব এই যে—'দেশের অধিকাংশ হিন্দু বা মুসলমান ইহা চাহে'—অনেকের ন্যায় এমন নির্জ্জলা মিথ্যারও প্রচার করেন নাই অথবা নিজেকে কোন সভা-সমিতির কর্ত্তা করিয়াও মত প্রকাশ করেন নাই; কিংবা মহাজ্ঞানী সাজিয়া হিন্দু-মুসলমানকে গালিও দেন নাই। আইন পাশ হইলে সঞ্জীবনীতে তিনি লিখিয়া-ছিলেন—

"তাঁহাদের ৪৫ বৎসরের পরিশ্রম এতদিনে সফল হইতে চলিল।" ইহা যদি ৪৫ বৎসরের পরিশ্রমের ফলে হইয়া থাকে তবে যে "ভদ্রমহিলার নৃত্যে"র জন্য তিনি অবিরত বিরুদ্ধ মত প্রচার করিতেছেন, তাহাও যে তাঁহাদের ৪৫ বৎসরের পরিশ্রমের অন্যতম ফল, তাহা অস্বীকার করিতে পারেন না। আমরা এই কথাটা বিনয়ের সহিত তাঁহার নিকট উত্থাপন করিলাম—আশা করি উত্তর পাইব।

———

ছদ্মবেশে—

স্ব-স্বরূপে

বৃহত্তর-জগৎ-সঙ্ঘ

Greater-World Society.

একটী গোলটেবিলের চতুষ্পার্শ্বে অধ্যাপক উদ্ধত কুমার সরকার, ডাঃ [illegible]নাথ সরকার, দুর্নীতি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডাঃ শ্যামাদাস বাগ বসিয়া চুরুটের ধূমে কক্ষখানি ভরিয়া ফেলিতেছেন। কুণ্ডলী পাকাইয়া ধোঁয়া উঠিয়া আকাশের দিকে ধাওয়া করিতেছে। মুক্ত গবাক্ষপথে পণ্ডিতগণ চাহিয়া দেখিতেছেন—সেই ধোঁয়া ক্রমশঃ উর্দ্ধে উঠিয়া গ্রহ-নক্ষত্রমণ্ডলীকে আবৃত করিয়া ফেলিল। পণ্ডিতেরা বিস্ময়বিমুগ্ধ লোচনে চাহিয়া তাহা দেখিতে লাগিলেন ; তাঁহাদের নয়ন সকল আনন্দাশ্রুতে দর-বিগলিত হইল।

শ্যামাদাস। অহো ! চুরুট-ধূম্রের কী অপূর্ব্ব শক্তি ! এই জগতের সহিত বৃহত্তর জগতের সংযোগ-সাধন যদি কেহ ঘটাইতে পারে, তবে তাহা এই চুরুট। মেঘসমূহ দুই-তিন মাইলের উপরে উঠে না ; হিমাদ্রি-শিখরের অত্যুচ্চ শৃঙ্গ সমূহ বৃষ্টিহীন বলিয়া পণ্ডিতগণ বর্ণনা করিয়াছেন। মহাকবি কালিদাসও তাঁহার কুমারসম্ভব-কাব্যের কৈলাস-বর্ণনায় কৈলাস-শিখরে বারি-পতনের বার্ত্তা লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিক-পরীক্ষাদ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, চুরুটের ধূম্র মেঘ অপেক্ষা স্বচ্ছ। পৃথিবীর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠিয়া যেখানে অনন্তরূপী 'ইথর' বর্ত্তমান, তাহার মধ্যদিয়া ধাবমান হইবার পথে ইহার কোন বাধাই নাই। ডাঃ উদ্ধতকুমার সরকার ! আপনি তো ইয়াঙ্কি ও য়ুরোপমণ্ডলে বহুকাল বাস করিয়াছেন, দুনিয়ার আবহাওয়া সম্পূর্ণরূপে

পরিজ্ঞাত হইয়াছেন। আপনি বলুন, আমার কথা সত্য কি না?

উদ্ধতকুমার। চুরুট-ধূম্রের ঊর্দ্ধগতি সম্বন্ধে আমার মনে আদৌ সংশয় নাই। লঘুতা সম্বন্ধেও সন্দেহ করিবার কারণ দেখিতে পাইতেছি না। কিন্তু আশ্চর্য্য—অগণিত গ্রহমণ্ডলীর মধ্যে কোথাও ধূমপানকারী জীব নাই। থাকিলে তাহাদের ধূম্রও পৃথিবীতে আসিয়া উপস্থিত হইত, ডাঃ মথুরানাথ!

মথুরানাথ। চুরুট-ধূম্রের আলোচনা পরেও চলিতে পারিবে। এবারে—

দুর্নীতিকুমার। হাঁ, এবারে সভা আরম্ভ হউক। আমি প্রোপোজ্ করিতেছি, কলিকাতা নিঃস্ব-শিক্ষালয়ের আবুহোসেনী ভাইস্ চ্যান্সেলর্ অধ্যাপক মথুরানাথ সরকার মহাশয় আমাদের এই বৃহত্তর-জগৎ-সঙ্ঘের ক্ষুদ্রতর বৈঠকের সভাপতির আসন গ্রহণ করুন।

শ্যামাদাস। আমি এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ অনুমোদন করি।

(মথুরানাথ পূর্ব্ব হইতেই স্বকীয় আসনে উপবিষ্ট ছিলেন, এবারে নড়িয়া চড়িয়া আবার বসিলেন।)

মথুরানাথ। জেণ্টেলমেন্! লেডীস্! (ইতস্ততঃ দৃষ্টি-সঞ্চালন করিয়া) কৈ—একটীও নাই? আমাদিগকে বয়োবৃদ্ধ দেখিয়াই কি লেডী-গণ এই সভা পরিত্যাগ করিলেন? অহো! কী পরিতাপের বিষয়! ডাঃ শ্যামাদাস কাগ! আপনার 'সুইটার'টী তো সদানুষ্ঠান সমূহে যোগদান করিয়া থাকেন। তাঁহার অনুজা—জর্ণালিষ্ট্ ধামানন্দবাবুর অন্যতমা দুহিতাটীও সর্ব্বত্র তাঁহারই অনুগমন করেন। তবে তাঁহাদের দেখিতেছি না কেন?

শ্যামাদাস। আমার সুইটার সম্প্রতি পারিবারিক বিভ্রাট হইতে মুক্ত হইয়াছেন। সুস্থ হইয়া বল সঞ্চয় করিয়া বাহির হইতে আরও কিছু সময় লাগিবে। আর তাঁহার অনুজা কয়েকমাস পূর্ব্বে মগের মুলুকে

যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহাদের অনুপস্থিতির জন্য আমি দুঃখিত।

উদ্ধতকুমার। সভায় মহিলাসভ্যের এরূপ অল্পতা ঘটিবে জানিলে আমি আমার হাঙ্গারীয় মহিষীকে সঙ্গে করিয়া আনিতাম।

মথুরানাথ। যাহা হোক্—জেণ্টেল্‌মেন! আজ আপনারা যে প্রতিষ্ঠানটীর আহ্বানে এখানে সমবেত হইয়াছেন, সে প্রতিষ্ঠানটীকে নিতান্ত তুচ্ছ মনে করিবেন না। এই জগৎ তো স্মরণাতীত কাল হইতে গ্রহ-উপগ্রহমণ্ডলী-খচিত সৌর জগৎ মধ্যে লাট্টুবৎ পরিঘূর্ণ্যমান্ হইতেছে। কিন্তু কৈ—এতদিনেও তো কাহারও মনে মঙ্গল, শুক্র, বৃহস্পতি, শনি কি ইউরেনাস্ বা নেপ্‌চুন্ গ্রহের সহিত জগতের সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক বৃহত্তর জগৎ-প্রতিষ্ঠার কল্পনা উদিত হয় নাই! সক্রেটিস্-এরিষ্টটল্ হইতে আরম্ভ করিয়া বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন পর্য্যন্ত, হোমর হইতে রোঁমা রোঁলা পর্য্যন্ত, মহাকবি বাল্মিকী হইতে আরম্ভ করিয়া মোহিতলাল মজুমদার পর্য্যন্ত কাহারও চিত্তে যে অপূর্ব্ব কল্পনার উদয় হয় নাই, আমাদের পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান শ্যামাদাস বাগ বাবাজীবনের অত্যুর্ব্বর মস্তিষ্কে তাহারই উদয় হইয়াছে। ভদ্রমহোদয়গণ! এই সভার পক্ষ হইতে আমি শ্রীমান্ শ্যামাদাসকে এজন্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে চাই। বলুন, আপনাদের সম্মতি আছে?

(করতালি)

জেণ্টেল্‌মেন! আমাদের এই বৃহৎজগৎ-সঙ্ঘের উদ্দেশ্য আপনাদের অবিদিত নাই। এখন এই উদ্দেশ্য কিরূপে সু-সাধিত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে আপনাদের অভিমত ব্যক্ত করুন। ভদ্রমহোদয়গণ! আমাদের উদ্দেশ্য যেমন বিরাট, কর্ম্মপন্থাকেও তেমনি বিস্তৃত করিয়া লইতে হইবে। কেহ আমাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে না—পূর্ব্ব পূর্ব্ব মনীষিগণের প্রদর্শিত পথ আমাদিগকে মৃত্তিকা-নদী-পাহাড় পরিপূর্ণ এই পৃথিবীবক্ষেই পরিচালনা করিতে পারিবে—পৃথিবীর সীমারেখার পারস্থিত অনন্ত

উর্দ্ধলোকে আমরা উদ্দেশ্যহীন, লক্ষ্যহীন, আশ্রয়হীন ও সহায়হীন। মস্তিস্ক-পরিচালনা পূর্ব্বক আমাদিগকে এই মহাপথে মহাযাত্রার উপায় অনুসন্ধান করিতে হইবে; সুদক্ষ আবিষ্কারক সাজিয়া আবিষ্কার করিতে হইবে।

(সভাপতি মথুরানাথ সরকার মহাশয় উপবেশন করিলেন। ঘন ঘন করতালি উত্থিত হইল। এই করতালির ও উল্লাসের মধ্যে রিপোর্ট হস্তে দণ্ডায়মান হইলেন ডাঃ শ্যামাদাস বাগ)

শ্যামাদাস। মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক আমি আমার রিপোর্ট বহি হইতে সঙ্ঘের প্রোস্পেক্টাস্‌খানি একবার পড়িতে চাহি।

সভাপতি। সচ্ছন্দে—

শ্যামাদাস। এই সঙ্ঘের কার্য্যপদ্ধতি হইবে নিম্নলিখিত ভাবে—

(১) বৃহত্তর জগৎ বা সৌরজগতস্থ গ্রহ-উপগ্রহাদি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ।

(২) পৃথিবী হইতে ঐ সকল গ্রহে যাওয়া সম্ভব কিনা বুঝিবার জন্য উন্নত ধরণের বিমান প্রস্তুতের চেষ্টা করা।

(৩) তজ্জন্য জগতের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বৈমানিকগণকে একটী সম্মিলনে একত্রিত করা।

(৪) পৃথিবী হইতে বেতার বার্ত্তায় গ্রহমণ্ডলীতে বাণী প্রেরণ এবং তথাকার বাণী শ্রবণের চেষ্টা।

(৫) পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে পৃথিবীর সহিত চন্দ্র, বুধ ও মঙ্গলগ্রহে যাতায়াত ছিল, এতৎ সম্বন্ধে প্রমাণ রহিয়াছে। ঐ সকল গ্রহ-উপগ্রহে পৃথিবীস্থ বুদ্ধিমান মানব নিশ্চয়ই কোন নিদর্শন রাখিয়া আসিয়াছে। সম্ভব হইলে সেই সকল নিদর্শন-সংগ্রহ এবং তৎসম্বন্ধীয় তথ্যপূর্ণ পুস্তিকা প্রচার।

সভাপতি। ডাঃ বাগ মহাশয়ের মুখে উদ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থার বিবৃতি আমরা শুনিলাম। এবারে অন্যান্য সদস্যগণের যদি কোন বক্তব্য থাকে, তাহা ব্যক্ত করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করুন।

দুর্নীতিকুমার। আমি সংক্ষেপতঃ দু'একটী কথা বলিতে চাই। কিছুদিন ধরিয়া আমি ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করিতেছি। আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিতে পাইতেছি, আমাদের ভাষাসমূহে এমন অনেক শব্দ আসিয়া পড়িতেছে, যাহার সহিত এই জগতের সম্বন্ধ অতি অল্প। আমার মনে হয়, ঐ সকল শব্দ গ্রহ-উপগ্রহ হইতে পৃথিবীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আমি এ সম্বন্ধে এখনও বিশেষ গবেষণা করিবার সময় পাই নাই। তবে মনে হয়, গবেষণা করিলে ভাষাতত্ত্বের মধ্য দিয়াই বৃহত্তর জগতের অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইবে।

উদ্ধতকুমার। নয়া নয়া তথ্য আবিষ্কারের জন্য দুনিয়ার সবাই পাগল। আপনারাও দুনিয়ার বাহির নন, কাজেই এই সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করিয়া বসিয়াছেন। এই নয়া কাজের সুরু হইতে আমাদের উদ্দেশ্যকে বিরাট রাখিতে চাই। ডাঃ বাগ বলিলেন, তিনি চান, গ্রহ-উপগ্রহের সহিত এই দুনিয়ার বৈমানিক সম্বন্ধ স্থাপিতে। আমি আরো কিছু বেশী চাই। আমি চাই বাইরেকার দুনিয়ার সাথে এর বৈবাহিক কুটুম্বিতা স্থাপিতে। ডাঃ বাগ বিমানে যাতায়াতের কথা বলিলেন; আমি চাই—ঐ সূর্য্যি, ঐ চাঁদ, ঐ মঙ্গল-গ্রহের সাথে এই জগত একটা রেলপথে বাঁধা হোক। একটা কথা আমি বলিব। পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন, গেল আড়াইকুড়ি বৎসরের মধ্যে মঙ্গল-গ্রহে কতকগুলি সমান্তরাল খাল কাটা হইয়াছে। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, ঐ খালে জাহাজ পর্য্যন্ত চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের ঐ জাহাজে গিয়া চড়িতে হইবে। ঐ দেশে এদেশের হরিতকী ও আমলকী চালান দিতে হইবে। চাঁদের মা বুড়ীর চরকার পাঠশালায় আমাদের দিদিমাদের

সব ভর্ত্তি করিয়া দিতে হইবে। নয়া নয়া ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া ইউরেনাস্ ও নেপ্‌চুনের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে।

(উচ্চ করতালি)

সভাপতি। ডাঃ উদ্ধতকুমার যাহা বলিলেন, তাহা আমি সকলকে স্মরণ রাখিতে বলি। আপনারা inter-national লেন-দেনের কথা শুনিয়াছেন। আমাদের inter-world লেন-দেন চালাইতে হইবে। এ বিষয়ে আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা কিছু বলিব। আমার কাছে সাড়ে সতেরো হাজার পারসী চিঠিপত্র আছে। এই চিঠিগুলি মোগল হারেমের সুন্দরীদের কাছে তাহাদের স্বামীরা লিখিয়াছেন। এই চিঠিগুলি নানাস্থান হইতে আসিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে যেগুলি পায়রা-দূতের মারফৎ আসে নাই, সেগুলিতে ডাকঘরের শীলমোহর পর্য্যন্ত আছে। উহার একখানিতে শীল মোহর দেখিলাম—

নিন্-জমীন্-কী-পর্-দে-খান্

—অর্থাৎ "পোঃ বৃহস্পতি।" চিঠির সম্বোধন বাক্যের উপরে স্থান ও তারিখ রহিয়াছে—

কাজর্-ই-বস্‌রা-তো-আল্‌মীনী-ফতেহ্‌র্

মহরম্,কা-কুতর্-ফেনাৎ-দ্রিতো-ফতেহ্

অর্থাৎ—পূজ্‌বাড়ীর সন্নিকটস্থ মস্‌জিদের কোণ, ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মহরম্ মাসের ২৪শে তাং।

তাহা হইলেই দেখুন, এই সেদিন—১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে—আক্‌বর্ বাদ্‌শাহের রাজত্বকালেও বৃহস্পতি গ্রহে লোকের যাতায়াত ছিল এবং ঐ গ্রহে ডাকঘরও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; ভারতের মুসলমান গিয়া তথায় মস্‌জিদ্‌ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন!

বন্ধুবর্গ! আজ আর নয়—আর একদিন আপনাদের গ্রহ-উপগ্রহ সম্বন্ধে নূতন নূতন তথ্য শুনাইব আজ এই পর্য্যন্ত। এবারে সভা ভঙ্গ হোক্।

সর্দ্দা আইনের পরে—

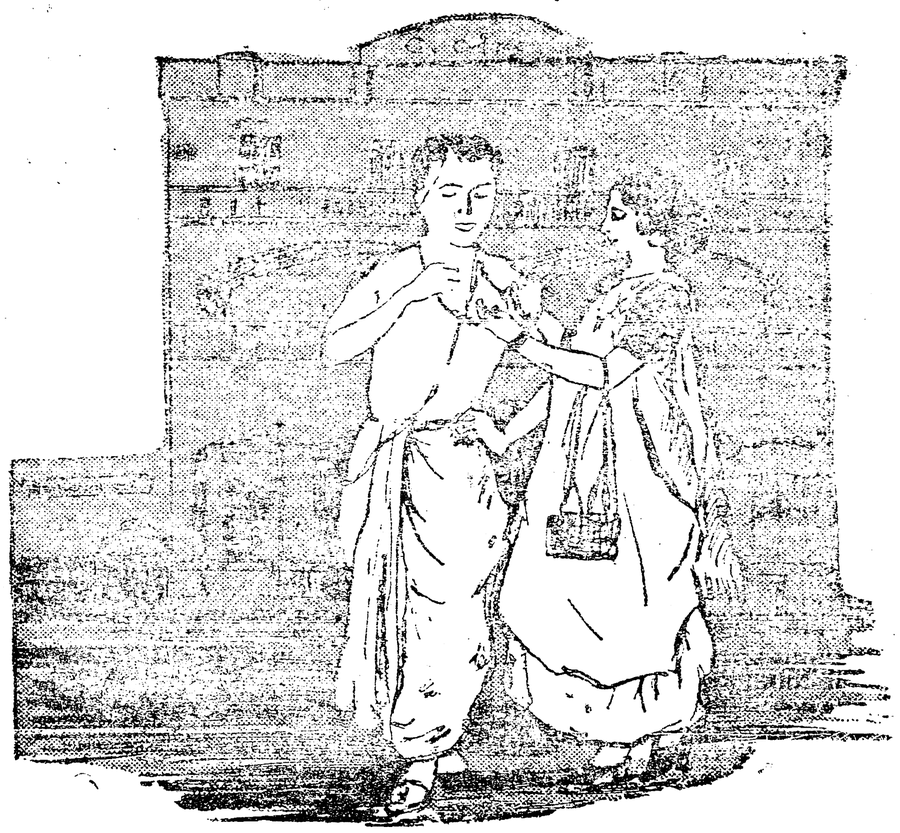

নৈকুষ্ম কুলীন ব্রাহ্মণ ও আলোক-প্রাপ্তা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

Brahmo-in-law

"ব্রাহ্ম' মানে কি ?

তাই জানো না ? ওটা ব্রাহ্মণ শব্দের অপভ্রংশ। হ'লনা। তাহ'লে এই বুঝাত যে ব্রাহ্মণের লেজ খসে গিয়ে ব্রাহ্মর সৃষ্টি হ'য়েছে। The idea.

লেজ খসে গিয়ে না হোক, টিকি খসে গিয়ে যে হ'য়েছে, তার ভুল নেই। ডার-উইনের ক্রমবিবর্ত্তন বাদ মান তো ?

না ভাই, মানিনে। বাপ্‌দাদাকে বানর বলে গাল দেওয়ার সখ এখনো হয়নি। তবে এটা স্বীকার করি, জগতে ঐ রকম একটা দলের সৃষ্টি হয়েছে বটে—যারা বাপ্‌দাদাকে বানর প্রতিপন্ন না করে আর ছাড়্‌চেনা। আপনার জন্মব্যাপারের মধ্যে এরা কৃত্রিমতার আরোপ কর্‌তে চায়! আপনাকে জারজ প্রতিপন্ন না করে এরা সুস্থ নেই—তা বক্তিমে দিয়েই হোক, কি কর্ম্ম দিয়েই হোক্। ঐ পত্ব-ভ্রষ্ট ব্রাহ্মণও ঐ দলের।

কেবল 'থিওরী' শোনালে হবেনা। যা বল্‌বে, তা তর্কশাস্ত্র অনুমোদিত হওয়া চাই।

নিশ্চয় হবে। আচ্ছা, বল দেখি, Father মানে কি ?

কেন—পিতা !

Father-in-law মানে ?

শ্বশুর।

অর্থাৎ আইন-গত পিতা তো ? লজিকের বাইরে যাইনি নিশ্চয় ?

এখনও নয়।

না, এখনও নয়। যদিও স্ত্রীধনে স্বামীর অধিকার প্রতিপন্ন হ'লেও আজ পর্য্যন্ত বাপের ধনে মেয়ের অধিকার সাব্যস্ত হয় নি। আচ্ছা বেশ। Brother-in-law মানে ?

শ্যালা।

অর্থগুলো in-law অর্থাৎ তোমার তর্কশাস্ত্র-সম্মত হওয়া চাই যে !

তা হ'লে আইন-গত ভ্রাতা।

তাহ'লে মায়ের পেটের ভাইকে বুঝ্‌তে হবে Brother, not-in-law—অর্থাৎ বে-আইনী ভাই। কি বল ? মাথা নীচু কর্‌লে চল্‌বেনা—শ্যালাকে যখন in-law ভাই বলে মেনে নিয়েছো, তখন মায়ের পেটের ভাইকে বে-আইনী ভাই বলার সময়ে মাথা নীচু করে রইলে চল্‌বে না। আচ্ছা বিবাহকে ইংরাজীতে কি বল ?

Marriage.

সে তো শাস্ত্রানুমোদিত বিবাহকে। আইনের অনুমোদন নিয়ে—শালগ্রামের সুমুখে বা শালগ্রামের অনুপস্থিতিতে যে বিবাহ, তাকে তোমার তর্কশাস্ত্র অনুসারে কি বল্‌তে হয় ?

Marriage-in-law.

অর্থাৎ Father-in-law যেমন পিতা, Brother-in-law যেমন ভ্রাতা এ বিবাহও তেমনি। পিতৃকুলের চেয়ে শ্বশুরকুলের প্রাধান্যই এ বিবাহে রক্ষিত হয়, স্বীকার কর তো ?

তা আর করিনে !

এই in-law কে যদি 'বৈবাহিক' অর্থ ধরে নাও, তা হ'লে শ্বশুরকে বৈবাহিক পিতা, শ্বাশুরীকে বৈবাহিক মাতা আর শ্যালাকে বৈবাহিক ভ্রাতা বলা চলে। স্বীকার কর ?

করি।

আর যারা বিয়ে-করে ব্রাহ্ম হয় বা বিয়ে কর্‌বার জন্য ব্রাহ্ম হয় !

অর্থাৎ!

অর্থাৎ যে সকল হিন্দু-যুবক ব্রাহ্মিকার প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে তাকে বিয়ে কর্‌বার জন্য স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করে বা বৈবাহিক কারণে ব্রাহ্ম হয়, তাদের কি বলা যায়? উত্তর দিতে তর্কশাস্ত্রের সীমা লঙ্ঘন করে বোসোনা যেন—

Brahmo-in-law.

হাঁ, Brahmo-in-law. দৃষ্টান্ত দেখাতে পার দু'একটা!

এ রকম ব্যাপার শুনেছি তো অনেক, তবে সঠিক না বলে দিতে পারি নে।

দু' একটাও পার না! অন্ততঃ একটা!

হাঁ, মনে পড়েছে—কুধীর চৌধুরী, ধীমানন্দবাবুর মেয়ে গীতা দেবীকে বিবাহ কর্‌বার জন্য ব্রাহ্ম হ'য়েছিলেন। হাঁ, হাঁ—আর একটা কথা মনে করিয়ে দিয়েছো—কেবল ব্রাহ্ম মেয়েকে বিয়ে করেই নয়, তাঁদের গর্ভ-সঞ্চার করে যারা বিয়ে করে, তাদের কি বল্‌বে?

ঐ Brahmo-in-law.

যেহেতু তার ওপর কোন অভিধান নেই—আইনের ওপরে আইন নেই। কিন্তু তোমার তর্কশাস্ত্রের এখানে জবাই হচ্ছে যে!

কি রকম!

এই শ্রেণীর Brahmo-in-lawগণ আইনের ফাঁকি বাঁচাতেই বিয়ে করেন। এটা মান তো?

না মেনে আর কি করি! বিশেষতঃ এদের বিয়েটা যখন প্রেমের দায়ে না হ'য়ে আইনের ঘরে সন্তানের বৈধতা প্রতিষ্ঠার জন্যই হ'য়ে থাকে।

তা হ'লে সেই সকল সন্তানেরা জন্মের পরে সন্তানের হয় তাঁদের

আইনগত সন্তান; আর তাঁরা হ'ন তাদের আইন-গত পিতা। শব্দ দু'টীর literal translation করে শুনাও তো—

Son-in-law আর Father-in-law.

কিন্তু সে পরিচয় লোক সমাজে দেন কি?

না।

তা হ'লেই দেখ, ঐখানেই তাঁরা তর্কশাস্ত্রের জবাই করে ফেল্‌লেন। এর পরে আবার তর্কশাস্ত্রের কথা তুল্‌তে চাইবে?

নাগো, না। ঢের হ'য়েছে। কিন্তু শেষোক্ত শ্রেণীর ব্রাহ্মের সংখ্যা খুব কম নয় কি।

কম বেশী ছাপার হরফে কে লিখ্‌বে? সরকারী আদমসুমারীতে অনেক কথাই থাকে না! তা একথা মান তো যে, প্রথমোক্ত শ্রেণীর হোক—কি শেষোক্ত শ্রেণীর হোক—ব্রাহ্মদের মধ্যে Brahmo-in-law'র সংখ্যা নিতান্ত কম নয়?

শেষকথা

হিন্দু রমণী কিংবা খৃষ্টান রমণী যখন প্রেমে পড়িয়া মুসলমান হয়, তখন সমাজ তাহার নিন্দা করে, ব্যভিচারিণী আখ্যাও দিয়া থাকে কিন্তু ইহারা বেদান্তাচার্য্য ধীরেন্দ্র চৌধুরীর ন্যায় Higher critic এর হাতে পড়লে কি আখ্যা পাইবে বলা যায় না। ব্যাভিচার জিনিষটা উভয়ে মিলিয়া সম্পাদিত হয়; সুতরাং একজন অন্যের ধর্ম্মগ্রহণ করিলেও বেদান্তাচার্য্যের মতে উভয়েই ব্যাভিচারী আখ্যা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে কি? না কেবল মুসলমানের সঙ্গে প্রেমে পড়িলেই ব্যভিচার হয়!

Brahmo-in-law বা বিয়ে-বেহ্মগণের একটী আদম সুমারী আমরা প্রস্তুত করিব, এ বিষয়ে যিনি যে খবর দিতে পারেন, তাহা রবিবারের লাঠির আফিসে পাঠাইয়া দিলে বাধিত হইব। খবর দাতাদের কাহারও নাম ধাম প্রকাশিত হইবে না।

অজয়ের জয়যাত্রা

আগে অন্ধকার, পরে অন্ধকার। মাঝখানে 'ছাপাখানার প্রিণ্টার। কত ক্ষুদ্র, কিন্তু কত স্পর্দ্ধা! অথচ মূল্যহীন।

এই ছাপাখানার মধ্যেই কি তাহার জীবন কাটিবে? যেখানে ইহার অবসান, প্রতিভার মৃত্যু কি সেখানেই?

মাহিনা বাড়িয়া যায়, আকাঙ্খাও বাড়ে। শনি-মণ্ডলে জাঁকিয়া বসে। নভেল লেখে। প্রকাশও করে।

অজয় চলে জয়যাত্রায়।

১

দাসেদের ছেলের শৈশব দেখি নাই। ঘোষেদের কীর্ত্তিমান্ ছেলের শৈশব দেখিতেছি। একই রকম কি?

"চাম্‌চিকের মত ছেলেটী। ট্যাঁ ট্যাঁ করে। মায়ের কোল। পাঠশালা। পণ্ডিতকে দেখিতে পারে না। সহপাঠিনী অমিয়কে দেখে। তন্বী কিশোরী। গলায় হাত জড়াইয়া বসে। অনুভূতি—গাঢ় অনুভূতি।" ছেলে বড় হইলে যা হইবে!

"পুকুরে পুকুর-ঘাটে গিয়া বসে। বট গাছটার তলায় একটা ষাঁড় খোঁটায়-বাঁধা গাইয়ের গা চাটে, আগ্‌ডালে বসিয়া দুটো পায়রা ঠোঁট-ঘসাঘসি করে। মিস্ত্রীদের পরীর সাথে জনাবাল গাড়োয়ান পিরীত করে। চাহিয়া দেখে।" গোলাকার ছোট্ট দু'টী চক্ষু—এতও তার নজর?

ঘোষেদের ছেলে কি করিয়াছিল, জানি না। তবে দাসেদের ছেলের কথা শুনিয়াছি—বেশীদিন বাপ-মা তাহাকে সঙ্গে শোয়ান নাই। যে নজর!

পিরীতের কথা অনেক নভেলে আছে বটে—কিন্তু পুস্তকের আরম্ভেই ষাঁড়, গাই, কপোত, কপোতি, গাড়োয়ান আর পরি অর্থাৎ যে দেখা দিয়াছে, সেই প্রেমে মজিয়াছে—জীব মাত্রই—এমন জবরদস্ত লেখক বাংলার কোথায় লুকাইয়াছিল?

অমিয় পাঠশালার সাথী—এক নম্বর। দু'নম্বর প্রতিবেশিনী মেয়ে ডলি। ডলি, ডলি, ডলি! একেবারে ইঁচর; তবু নজরে তার—'নারী-কণ্ঠের কাকলি' 'মৃণাল-ভুজের ললিত-বিলাস'!

"ডলি পেপের সরবৎ খাওয়ায়। বাড়ীতে 'নেমন্তন্ন' করে।" আহা! দিনে ডলির সঙ্গে। "রাত্রে মায়ের কোলে। রাক্ষসের মতো বাহু বিস্তার করিয়া—রাক্ষস নয়, মা।" তবু ভাল—রাক্ষস নয়, রাক্ষসের মত।

২

"কৈশোর—যৌবনের সন্ধিক্ষণ।

যৌবনের ছোঁয়াচ। পিতা বহুদূরে, মাও তাই।"

চোখে চশমা উঠিয়াছে কেবল পড়ার জন্যই? "নেশা—বীভৎস। কবিতা লেখে, ডলিকে শুনায়। ডলিই নয়—ডেজীও।" তিন নম্বর। "ডলির ছোটবোন্ ডেজী। ডলী আর ডেজী, ডেজি আর ডলি।"

এতও জোটে—মা-গো! আলোকপ্রাপ্ত সমাজ না হইয়া যায় না।

"ডলির বুকের তলা, ডেজীর কলকণ্ঠ। সর্ব্বাঙ্গে মধু বৃষ্টি।" সর্ব্বাঙ্গে। কেবল বর্ষণই কি?

"মা কূলে দাঁড়াইয়া হা-হুতাশ করে। তরী তখন তীরের বাঁধন কাটিয়া সমুদ্রে পাড়ি দিয়াছে ডলি ডুবিয়াছে। ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি করে ডেজী!"

"খালি কবিতায় নেশা জমে না। ডেজী, ডেজী, ডেজী। বুকের রক্ত তোলপাড় করে। ডেজীর হাতখানা চাপিয়া ধরে। একটী চুম্বন।

জানালার পাশে দাঁড়াইয়া ডলি দেখিয়াছে। ডেজী মরিয়া গেল।"

মরিয়া ডেজী বাঁচিল। ডলিও বাঁচিল।

৩

আবার ডলি। ডেজী নাই, ডলি আছে। তার বয়স বাড়িয়াছে, ফুটন্ত যৌবন।

ডলির বিবাহ। "শুভদৃষ্টির সময় ডলি আয়ত চক্ষু মেলিয়া চায়।"

"তখনই তুষার গলিতে আরম্ভ করিয়াছে।"

হায়রে ঘোষেদের ছেলে আর তার কল্পনার দেহের অন্তরালে দুরাকাঙ্ক্ষ দাসেদের ছেলের মন!

ডলি শ্বশুরবাড়ী গেছে। নিদর্শন দিয়ে গেছে, এক গোছা চুল। চুল ডলির; বলে, ডেজীর। মৃতের আদর বেশী হইবে।

বুদ্ধির তারিফ করি। প্রগতি-প্রাপ্তা?

ঘোষেদের ছেলের বাপ মরিয়াছে; মরিয়া বাঁচিয়াছে।

দাসেদের ছেলের বাপেরও কি এমনি কপাল-জোরে? মায়ের সঙ্গে মামা বাড়ী যায়।

Where there is a will, there is a way. মামাতো বোনেরা পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া দেখিয়া যায়—পাড়ার সঙ্গিনীরাও আসে।

"চুলের গন্ধ, শাড়ীর খস্‌খস, চুড়ির রিণি-ঝিনি—চাপা হাসি, কলহাস্য দ্রুত পদশব্দ।" ঝাঁকে—ঝাঁকে—প্রগতি-প্রাপ্তা নারী।

রাজ-কপাল!

শোভার বন্ধু রেণু—বলে, বায়স্কোপে নিয়ে চল। রেণু কিশোরী, তন্বী—চার নম্বর। একটু খুঁৎ—ওবাড়ীর অনাত্মীয় কলেজের ছেলে অরুণের কাছে চিঠি লিখিয়াছিল, প্রেম-লিপি। সেই চিঠি তার হাতে পড়িল।

সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড! তা অমন হয়। আলোক প্রাপ্তা? বয়স হইয়াছে; এখনও কি Fresh থাকে?

"রেণুকে কবিতা শোনায়। রেণু শুধায়, তোমার প্রেয়সী কে?"

"উত্তর করিতে পারে না। হাসিয়া রেণু বলে, আমি জানি।"

৪

রেণু বলিল, তোমার প্রেয়সীকে আমি জানি! নিজের উপরে রেণুর বিশ্বাস তো কম নয়।

"রেণু বলে, আঃ ছাড়, লাগে। কেউ দেখে ফেলবে। তুমি বড় বোকা।"

ঘোষেদের ছেলে বোকা, সময় এবং সুযোগ বোঝে না। দাসেদের ছেলে বোঝে—ক'জন রেণু তার মাষ্টারী করিয়াছে? দু'জন আলোক-প্রাপ্তা তো বটেই।

"অন্ধকার বারান্দায়, রেণু ও অজয়। প্রথম পরিচয়"—ভালমন্দ গাছের ফল খাইবার আগে তো? "অন্ধকার ঘনাইয়া আসে……ভাষার ঈঙ্গিত!"

"বক্ষের উপরে বক্ষ…অন্ধকারে লেলিহান অগ্নিশিখা। উন্মাদ নৃত্য!" এও ভাষার ঈঙ্গিত? বাকি রহিল কি? কতটুকু?

মা-গো! আলোকপ্রাপ্তা এতও সস্তা?

এত সস্তা—তবু মন ওঠেনা। ঝি-এর দল অবিন্যস্ত বসনে…… চকিতের জন্য……বেশ লাগে।

একথা নিশ্চয়ই ঘোষেদের ছেলের নয়, দাসেদের ছেলের।

বাড়ীর ওপাশে তেতলায় ঘোমটা-ঢাকা বৌ—নজর সেদিকেও। চুরি কয়া ধন আর দানে পাওয়া ধন, কোনটা বেশী? এক, দুই, তিন, চার—পাঁচ।

"ডেজীর মৃত্যুদিন!

"মাকে বলে, আমি আজ তোমার কাছে শোব। রেণু কাছে ছিল তাহার চোখ হঠাৎ জলিয়া উঠিল।" ছুটী নাই। একটা রাতও.....

দাসেদের ছেলে বলিবেন কি, প্রগতিপ্রাপ্তারা নিত্য অভিসারে আসা-যাওয়ার পথ ঠিক করে কি করিয়া?

"ডলি আর তার স্বামী। দেওয়া নেওয়ার ফাঁক নাই।" ডলির মনখানিই অজয়ের সঙ্গে, দেহ স্বামীরই কাছে। দেহের নিত্য-কামনা দুরান্তরের প্রিয় মিটাইতে পারে না।" দ্বৈতবাদী। আলোক প্রাপ্ত অদ্বৈতবাদী নয়?

"ডলি স্বামীর সঙ্গে কলিকাতায় আসে।"

সেই যে মায়ের সঙ্গে শুইবে বলিয়াছিল, সেই রাত্রি। মা ঘুমাইলে বিছানা হইতে উঠিয়া আসিল। রেণু তখনো বাড়ীর মেয়েদের সাথে তাস খেলিতেছে। "বারান্দা হইতে দেখে—রেণুর হাটুর কাছটা!"

দাসেদের ছেলেকে এমন কজনে হাটুর কাছটা পর্য্যন্ত দেখাইয়া দেখাইয়া রাখিয়াছে?

খেলার মাঝখানে তাস ছুঁড়িয়া ফেলিয়া রেণু বলে, বড্ড ঘুম পাচ্ছে, বাড়ী যাই। রেণু বাহির বাড়ীর দিকে যায়, সঙ্গে শোভা! রেণু বলে, তুই হবি আমার বডিগার্ড? শোভাকে বিদায় করিয়া দিয়া রেণু অজয়ের ঘরে ঢুকিয়া পড়ে! ধরা দেয়না! লিখিয়া যায়—"কাপুরুষ, মার আঁচলে আশ্রয় নিতে হ'ল শেষে!"

দাসেদের ছেলে এসব পান কোথায়? কলিকাতার কোন অঞ্চলে তরুণীদের এত আক্রমণ? আক্রমণ বড় বেশী হওয়ায় মাঝে মাঝে পলাইতে হয় কাহাদের? প্রেস-কর্ম্মচারীদের নয় তো? এরূপ আক্রমণেরই ফলে কি অধীনস্থ ক্ষুদে কেরাণীর সাথে ধনী-দুলালীর বিবাহ হয়? ছাপাখানার ভূতটী নাকি বিবাহিত। আপ্‌শোষ।

"রেণুর আপ্‌শোষ—ধরা-ছোঁয়া যায় না। একটা রাত্রির হতাশ।"

কার্ত্তিকের কুকুর? অরুদা আর অজয় সমান পালায় চলে চলে বুঝি। বাদ নাই। মাসে তিনটী দিনও না।

"শোভা রেণুকে বলে, নিজের মাথা তো খেয়েছো, দাদার মাথাটী শুদ্ধ খাবে?" এখনো বাকী আছে?

"গভীর রাত্রি। বুকের উপরে মুখ আর একরাশি চুল। গভীর অন্ধকার রাত্রের অস্পষ্ট অনুভূতি।"...এমনি নিত্য।

৭

বিমলা ছয় নম্বর। "বড্ড সরল; আসা যাওয়া করে...দিদি কাছে থাকে বলিয়া একটু শঙ্কিত।"

"রেণুর ভরা যৌবন, পুষ্পত বনভূমি—শ্যামল ক্ষেত্র!" কলমে এতও চলে! ভাল চাষী; আলোকপ্রাপ্ত, কিন্তু রুচি-বিকার নাই—ভারতচন্দ্র লজ্জায় মুখ লুকায়; দাশুরায় আর নিধুবাবু দূর হইতে গড় করে।

"**রেণুর শ্যামল ক্ষেত্র** ভাল লাগে না; **বিমলার নবাঙ্কুরে** মন মজে; ধরা ছোঁয়া যায়—রক্তমাংসের! গায়ে হাত পড়িলেই বিমলার চোখ বুজিয়া আসে!" শ্রীবিষ্ণু!

"কিন্তু তবু অন্ধকার রজনী রেণুর কাছ হইতে কেহ কাড়িয়া লইতে পারে না" বিমলা বুঝি কেবল দিনের? দিনেই ধরা-ছোঁয়া? রক্তমাংশ? চব্বিশ ঘণ্টা? ঘোষেদের ছেলের চেহারা দেখি নাই, দাসেদের ছেলের ভুড়িখানি দেখিয়াছি। অত ক্ষয়ের লক্ষণ তো নয়!

মা মরিয়াছেন; শোভার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিমলার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল, সে ফিরাইয়া দিয়াছে—বিবাহ করিবে না।

রেণুর সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। সে আসিয়া বুকের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তার মুখখানা বুকের উপরে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, রেণু কাঁদ্‌ছো?

"রেণু বলে, সব নাও—দেহ, মন। তোমায় ছাড়্‌তে পার্‌বো না।"

"দ্বিধা।

"রেণুর বিবাহ হইয়া যায়।

"সময় আসে, যখন দেহটাই মানুষের সব চাইতে বড় হইয়া ওঠে। গড়ের মাঠে বিমলা ইহার **আভাস** পায়। বিদ্যুতের আঘাত; বিমলা বলে, এর শেষ নাই?"

দাসেদের ছেলের জীবনে এই সময়টা কখন আসিয়াছিল শুনিতে পাই কি? আহা ভাবের অভিব্যক্তি!

"রক্ত আর মাংস এবং তাহারই বিকৃতি।" কলিকাতায় শুড়ীর দোকানের অভাব নাই, আর-কিছুর তো নাই-ই।

৮

"মামীমা পথ দেখিতে বলিয়াছেন। কাহাদিগকে লইয়া আপনাকে নিঃস্ব নিঃশেষ করিতেছে সে! তাহারা ভাগ্যহীনা। এমন কীর্ত্তিমানের সংশ্রবে আসিয়াও?

এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয় গণিয়াছি। আর গণিয়া কুলাইয়া উঠিতে পারি না। কলিকাতায় খোলার ঘরের অভাব নাই। দাসেদের ছেলে এসবও জানে?

"অবশেষে বিকার। কয়েক-দিনের পঙ্ক-স্নানের পর বিছানায় উপুর হইয়া খাতা লইয়া কবিতা লেখে।

"বিমলা ঘরে ঢুকিয়া বলে, আমাকে নেবে?

"সে শুধায়, কি দেবে?

"বিমলা বলে, দেহ। তোমার ভোগের নেশা মেটাতে পারবো বোধ হয়।" নিজের দেহের হিসাব আর ওর ক্ষমতা—দু'এতেই বেশ অভিজ্ঞতা আছে তো!

"বিমলাকে লইয়া নিজেদের গ্রামে।

"গ্রামের মেয়েরা ছিঃ ছিঃ করে। তাদের সব চাইতে যে মুখরা

তাহার হাত ধরিয়া বিমলা বলে, স্বপ্ন দেখেছি দিদি, পূর্ব্ব জন্মে এখানেই আমার ঘর ছিল।

"কেহ জিজ্ঞাসা করে, বিয়ে হয়েছে?

"বিমলা উত্তর করে, না হলেই বা ক্ষতি কি!"

দাসেদের ছেলে বাড়াবাড়ি করিয়াছে। আর একজন কিন্তু শেষাশেষি বিবাহ করিয়াছিল, পাড়াগাঁয়েও যায় নাই।

"বিমলা অন্তঃসত্ত্বা।"

৯

"ডলি।

"পতিব্রতা ডলি।" এমন পতিব্রতা নাকি আলোকপ্রাপ্ত সমাজে ঘরে ঘরে। দাসেদের ছেলে নিশ্চয়ই তাহার খবর রাখে।

ডলির ছেলে হইবে।

ছেলে ডলির স্বামীরই; গরুর গাড়ীতে করিয়া ঘুরিতে হইল না। নির্ব্বিঘ্নে ছেলে জন্মিল। ডলি ছেলের নাম রাখিবে। প্রবীর নয়, ইন্দ্রজিৎ নয়, শঙ্কর নয়, পিনাকী নয়, সজনীও নয়।

"অজয়।"

"ঘোষেদের সেই কীর্ত্তিমান্ ছেলের নাম।"

অন্তঃসত্ত্বা বিমলা আর তার গর্ভের ছেলেটীকে লইয়া গো-শকটে অজয় তাহার জয়যাত্রার চলিয়াছে।"

অজয়কে লইয়া জয়যাত্রায় বাহির হইল কে? ছাপার হরফে যা বাহির হয়, তার মধ্যে অচল যা তাই Printer's Devil বলিয়া চলিয়া যায়। অজয়ের লেখকের আশা, অজয়ও Printer's Devilএর নামের জোরে চলিয়া যাইবে।

যাক্ তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। আমরা ভাবি শনিবারের চিঠির সজনীবাবুর কথা। তিনি খিস্তি-খেউড় ছাড়িয়া বাজারে নাম

কিনিয়াছেন ; অশ্লীলতার জন্য জরিমানা দিয়াও অশ্লীলতার বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছেন ; সাহিত্যের Drainage Inspectorও সাজিয়াছেন। এত করার পরেও এমনি একখানা বই লইয়া বাজারে বাহির হইতে তাঁহার বাধে নাই। স্থল-বিশেষে গণ্ডারের চামড়াই যে মানুষে পায়, তা নয় ; পর্দ্দাহীন চক্ষুও পায় বটে !

তবু সজনীবাবুর প্রতিভাকে গড় করি। শিক্ষা ও রুচির অভিমানে অভিমানী যে সমাজ, তাহারই আলেখ্য দিয়াছেন তিনি। তিনি দেখাইয়াছেন, চিৎপুর অঞ্চলে যাহা প্রকাশ্য, সমাজ-বিশেষেও তাই। তফাৎ এই যে, সেখানের হতভাগিনীরা টাকার জন্য হাত পাতে আর এখানকার ভাগ্যবতীরা ফাঁদ পাতে রোমান্সের জন্য—দেহের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য।

ওরা থাকে সমাজের ঘৃণিত বস্তু হইয়া। আর এরা হয় বিস্ময়ের বস্তু। ওরা সমাজ ভাঙে আর এরা সমাজ গড়ে, সমাজের দলবৃদ্ধি করে।

* * * * *

এবারে ভাষার কথা, প্রথমেই চোখে পড়ে All present tense লেখার ঢং। এই ঢংটী ভাষায় কে প্রথম প্রবর্ত্তন করেন, তাহার ইতিহাস খুঁজিতে চাহিনা। দেখিতেছি বাংলার সমস্ত তরুণ লেখকের মধ্যে এই ফ্যাসানটী ছাইয়া গিয়াছে। কিন্তু শনিবারের চিঠির সম্পাদক শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস—যিনি খোঁচায় খোঁচায় তরুণ লেখকগণকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছেন—তো আর তরুণ লেখকের 'অগৌরব' স্বীকার করিতে রাজী নন্ ; তাঁহার এ বাতিক কেন ?

এই All Present tense লেখার ঢংটী নূতন ; কিন্তু ন্যাকামো ভিন্ন ইহাকে কি বলা যাইতে পারে ? তবে যদি ইহারা বলেন, ব্যাকরণকে সংক্ষেপ করিয়া আনিবার সাধু উদ্দেশ্যে এ কাজটী করিতেছেন, তাহা হইলে বলিব, ব্যাকরণ সংক্ষেপ করিতে না গিয়া আপনাদের বড় গোঁফ ছাটিয়া

আগে ছোট করুন, বড় ভুঁড়িটী কমাইয়া ফেলুন। Charity begins at home !

ভাষার ব্যবহার কি জন্য বলুন তো ? অবশ্যই আপনারা বলিবেন অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য। সজনীবাবু কিন্তু তাহাতে সায় দিবেন না। তাই সজনীবাবু একদিন—

'তোক্কাতারো—তোক্কাতারো তোক্কাতারো তি' লিখিয়া ধোক্কা লাগাইতে গিয়াছিলেন। আজ আবার ধোক্কা লাগাইতেছেন তাঁহার অজয়ের মধ্যে হাজার রকম 'তোক্কাতারো'র ব্যবহার করিয়া। নমুনাটা দেখিয়া যান—

ছোট্ট ছোট্ট চামচিকের মত ছেলেটী—(কড়াই ভাজা বা সজনের ডগার মত নয় !)

(১১) ডলি ঘাড় বাঁকাইয়া হাসে। বুড়ো ঘটতলার শাম্‌লা গাই ! (স্বার্থক উপমা ! মেয়ে নাগড়াই এর জড়িটাও জুড়িয়া দিলে আর একটু পরিষ্কার হইত।)

(১১) আকাশ গাঢ় নীল, রোদ যেন মায়ের স্পর্শ। (রোদ অবশ্য নীল নয়, কিন্তু নীল বস্তুটা কি ? মায়ের স্পর্শই কি নীল ?)

(১২) পরী, ডলি, রেশমী চুড়ি……মা ডাকে খাবি আয়। যেন চমকিয়া উঠে,…অন্ধকার অমাবস্যা-নিশীথের উল্কাপাত…(সমুদ্রের কল্লোল, প্রলয়ের গর্জ্জন, ডলির নথ, পরীর নাকছবি আর রেণুর ঘুড়ুরইবা বাদ যায় কেন ?)

(১৪-১৫) অন্ধকারে রঙ ধরিয়া উঠে, তারার জৌলুস—শুধু একটা অনুভূতি, যুগ-যুগ সঞ্চিত একটি অন্ধ মিনতি—

নামহীন, রূপহীন, তবু মূর্ত্ত।

সাপ আর পাখী, বেড়াল আর ইঁদুর।

সুন্দর অথচ ভয়ঙ্কর! পুরাতন অথচ নূতন!

কিন্তু হইলে কি হয়—খেলা—অসীম অন্ধকারের বক্ষে বুদ্বুদ্।

(মানেটা অবশ্য বুঝিতেছেন। অত্যন্ত গভীর অর্থ!—Fiddle-stick, দিল্লীকা লাড্ডু আর ঘোড়ার ডিম।)

উহারই পরে—(১৫) পেঁপের সরবৎ তেতো, তরমুজ যেন পচামাংস। একটা ব্যর্থ হাহাকার—শূন্যতা। মুক, বধির, অন্ধ।—(শনির দৃষ্টি বুঝি? আহারে!)

(১৭) বাড়ীখানা রাক্ষসের মত বাহুবিস্তার করিয়া দাঁড়ায়—(সে কি গো?) আকণ্ঠ তৃষ্ণা। জবাফুল ছিঁড়িয়া চিবায় (এমন তো শুনি নাই!) আকাশের আবরণ ছিঁড়িয়াছে (ছিঁড়িল কে?)

(৩৭) বোনের মৃত্যু-শয্যায় বসিয়া ডলি একটা অকথিত সুখ অনুভব করিয়া পীড়িত হয়। (সুখ-দুঃখে লুকোচুরি খেলাটি কি বিচিত্র!)

(৪৪) গভীর গাঢ় চোখ মেলিয়া তাহারা (বইগুলি) চাহিয়া থাকে। (সে কি গো?)

(৫২) শীর্ণ নদী সূর্য্যকরে ঝলকিয়া (ঝলসিয়া নয়) উঠে—যেন ইস্পাতের পাত। (উপমাটী চমৎকার নয় কি?) পুরাতন চিতার তলায় নূতন চিতা চাপা পড়িয়াছে। (তার মানে?)

(৫৪) আকাশ ধোঁয়ার কালো, বাতাস দুর্গন্ধ। চোখ কি ঘোলাটে হইয়া গিয়াছে? সে নীল কোথায় গেল? (অল্প কথায় কি সুবৃহৎ ভাব! সেই 'চেরাপুঞ্জির থেকে গোবি সাহারার বুকে একখানি মেঘ ধার দেওয়া'রই মত!)

(৫৫) বইগুলি.....কবন্ধের মত বাহুবিস্তার করিয়া দাঁড়ায়। (বই হ'ল কবন্ধ, তার গজাল বাহু! প্রিণ্টার হ'লেন সম্পাদক, তাঁর বেরুলো নভেল!)

(৫৬) দিগন্ত বিস্তৃত পথ জীবন্ত বাহু প্রসারিত করিয়া আছে। (আবার? সজনীবাবু জড়কে জীবন দিতে, মানুষের মত রূপ দিতে যেমন ওস্তাদ, তেমন বোধ হয় কোন সত্যিকার সাহিত্যিকই নন্!)

(৭১) মেয়ে আর পুরুষ, ঘর ও বাহির। (এখানেও অল্প কথায় কি গভীর ভাব! সজনীবাবু সর্টহ্যাণ্ড জানেন নিশ্চয়।

(১০১) সহর আর গ্রামে দড়ি টানাটানি চলে। (উদ্দেশ্যটী বুঝি, কিন্তু বলিবার ভঙ্গীটী! এখানেও সেই সর্টহ্যাণ্ড রিপোর্ট!)

(১১০) রেণুর শুধু হাঁটুর কাছটা দেখা যাইতেছিল। হেমন্তের বিশীর্ণ নদীই বটে। (**বিশীর্ণ নদী জিনিষটী কি?**)

(১১১) আপনা হইতে মাথাটা বুকের উপরে আসিয়া পড়িল, যেন একখানা তরবারি। বুক ফাটিয়া রক্ত বাহির হইল বুঝি? (টীকা অনাবশ্যক!)

পাঠক বোধকরি আবর্জ্জনা ঘাটিতে ঘাটিতে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এবারে অন্যদিকে চলুন। 'ঠেকে' শব্দটি আপনাদের কেমন ঠেকে? নিশ্চয়ই মধুর। মধুর না হইলে সজনীবাবু উহার এত ব্যবহার করিবেন কেন?—

বাতাস গরম **ঠেকে**.....কাদা মাংসপিণ্ডের মতন **ঠেকে**..... নিজের কাজেই অর্থহীন **ঠেকে**.....খেলার ঘর মধুর **ঠেকে**..... নিজের স্বর অস্বাভাবিক **ঠেকে**.....শানাই করুণ **ঠেকে**..... ভেল্‌ভেটের মতো নরম **ঠেকে**.....ইত্যাদি.....ইত্যাদি.....

কেমন বেতর ঠেকিতেছে না?

কেবল ইহাই নহে—গোদের উপরে বিস্ফোটক 'চুরি'ও আছে। 'অজয়'এর কোন্ কোন্ অংশ কোন্ কোন্ গ্রন্থকারের কি কি গ্রন্থ হইতে বেমালুম হজম বা পরিষ্কার ভাষায় চুরি করা হইয়াছে, তাহা আমরা আগামী সংখ্যায় দেখাইয়া দিব। রহু ধৈর্য্যং।

আবার গদ্যই নয়, পদ্যও আছে। বইখানি গদ্যে-পদ্যে—রবিবাবু শেষের কবিতার সঙ্গে 'ডুয়েল্' লড়িতে যাইতেছে যেন! কবিতার যা ছিরি! ভদ্রলোকের পাতে দেওয়ার উপযুক্ত নয় বলিয়াই আর ঘাঁটা-ঘাঁটি করিলাম না।

* * * *

স্বপ্নে দেখি, অক্ষয় জয়যাত্রায় বাহির হইয়াছে। কালো দেহ, বিরাট ভুঁড়ি, ইয়া গোঁফ আর খাটো চক্ষু। শনির মোরগ তার বাহন।

রবীন্দ্রঠাকুর সন্ত্রস্ত হইয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। অক্ষয় বড়াল, স্বরেন মজুমদার আর বিহারীলাল সরকার ডুগ্‌ডুগি বাজাইতেছেন; রেঁালা, জোলা, মোঁপাসা......এঁরা সব মশাল ধরিয়া জয়যাত্রার পথে আগাইয়া দিতেছে।

সেই গরুর গাড়ী, সেই পূর্ণগর্ভা নায়িকা, সেই শনির মোরগ—সব একাকার।

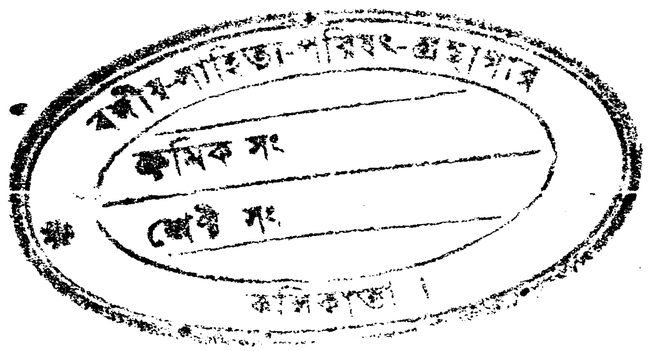

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
কলিকাতা

রহস্য

গড়-পাহাড় আর ফরাসী-বাগান যেথায় মিল
সেথায় মিলিত নাগ্‌ড়াই, চটি ও উচু হিল।
খাদ্য জোগাত সজ্‌নের লতা
খাটিত সে বেশী, মুখে কম কথা
আসিতে শিমূল সজ্‌নের পিঠে
পড়ে মোলায়েম্ কীল,—
ভীমুটা আসিয়া ধরিত যেন সে মড়ক-দেশের চীল!

ছাপাখানা ধারে বসিয়া কে গাহে প্রেমের গান
বড়্-দি' যে গায়, সজ্‌নে শুনিছে পাতিয়া কান।
ফোঁস্ কালনাগ? নিকটেই আছে,
কখন সেদিকে ফিরে চাহিয়াছে,
হাতের পুরুফে নড়চড় হ'তে
রাগিয়া অমনি টান—
ওধারে যদিও আরো জোরে চলে প্রেমের গান।

দিন থম্ থম্ দুপুরে সঘন নিশ্বাস ছাড়ে!
আসে রোজ রোজ, আজিও আসিবে বিশ্বাস হারে!
নিরালায় পেয়ে দিতে মুখে চুমা
বলে, 'একী গোঁফ! খোঁচা খাই, ওমা!'
কামাইয়া গোঁফ পরদিন আসি
পাইল না আর তারে—
'গোঁফটী কোথায়?' শুধায় বন্ধুরা—বলে না কারে।

"নব সংস্কার যুগের সূচনা"
(পৌষের প্রবাসীতে শ্রীযুত ধীরেন্দ্র চৌধুরী বেদান্তাচার্য্যের
প্রদর্শিত মতানুসরণে আর্ট স্কুলের হেড্ মাষ্টার
শ্রীমান রমেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর অনুকরণে "ভারতীয় চিত্র কলা")

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কি নিম্নশ্রেণীর জীব ?

(অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর মুন্সিয়ানা)

প্রবাসীর পৌষ সংখ্যায় বেদান্তচার্য্য (?) ধীরেন্দ্রনাথ "রামমোহন রায় ও রাজারাম" শীর্ষক প্রবন্ধে রাজা রামমোহন রায়ের তান্ত্রিক সাধনার যন্ত্ররূপে মুসলমান উপপত্নী গ্রহণের যুক্তি প্রদর্শনে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন এবং ঐ সংখ্যায়ই হিন্দুর "দুর্গা-পূজা"—প্রবন্ধের আলোচনায় যথেষ্ট বিষোদ্গীরণও করিয়াছেন; স্থানান্তরে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

রাজা (?) রামমোহন হিন্দুর পৌত্তলিকতা (?) সহ্য করিতে না পারিয়া যে নূতন ধর্ম্মমত প্রচার করিয়া নিজেকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তদুপরি কারুকার্য্য করিবার কি প্রয়োজন হইয়াছিল এই ধীরেন্দ্র চৌধুরী জীবটীর তাহা সহজেই বোধ্যগম্য। প্রশংসাদ্বারা কাহারও গৌরব-বৃদ্ধির সম্ভাবনা না থাকিলে অপরের নিন্দাবাদের Back-groundএর উপর স্থাপিত করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধির চেষ্টা আজ ধীরেন্দ্রনাথই যে নূতন করিতেছেন, তাহা নহে; ইহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যদের অধিকাংশই এই পথ অবলম্বনে আচার্য্য পদে উন্নীত হইয়াছিলেন; এবং ধীরেন্দ্রনাথও পূর্ব্বাচরিত সহজ পথ অবলম্বন দ্বারা আচার্য্যের গদী লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথ এক বিষয়ে তথাকথিত আচার্য্য পুঙ্গবদিগকে বহু পশ্চাতে ফেলিতে সক্ষম হইয়াছেন, ইহা স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য।

বর্ত্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব" সম্বন্ধে ধীরেন্দ্রনাথ আমাদিগকে আজ যে নূতন কথা শুনাইলেন, তাহার যথাযথ উত্তর তিনি পরমহংস দেবের শিষ্যমণ্ডলীর নিকট হইতে পাইবেন, এই ভরসায় এ বিষয়ে আমরা বর্ত্তমানে নীরব রহিলাম।

তিনি বলিতেছেন "রামপ্রসাদ হইতে রামকৃষ্ণ পর্য্যন্ত যিনিই Orthodox তন্ত্রসাধন করিয়াছেন তিনিই শক্তিগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, কিন্তু নৈকষ্য কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তানের পক্ষে এইরূপ তান্ত্রিক সাধনের জন্য গৃহীত শক্তিকে বৈধস্ত্রীরূপে ঘোষণা করিবার অধিকার কেবল রামমোহনেই সম্ভব হইয়াছে, অন্য কোন **নিম্নশ্রেণীর** জীবের পক্ষে সম্ভব হইত না"। তাহার কর্ত্তব্যে আর যাহাই থাকুক রামমোহনের তুলনায় রামকৃষ্ণ ও রামপ্রসাদ **নিম্নশ্রেণীর জীব**! রামকৃষ্ণের উপপত্নী বা শক্তি কবে কোথায় ছিল তাহা আমরা তাঁর নিকট জানিবার দাবী করি। রামপ্রসাদই বা শক্তি গ্রহণ কবে করিয়াছিলেন? এই মিথ্যা উক্তির জন্য প্রবাসী সম্পাদকও দায়ী। উপপত্নীকে বৈধপত্নী ঘোষণা করিলেই যদি সব দোষ কাটিয়া যায়, তবে কুসুমকুমারী ও নবতারার উপপতি প্রভৃতিও এই কৌশল গ্রহণে রাজা রামমোহনের দলভুক্ত হইতে পারে। তন্ত্রের মতে মুসলমানী কখনো শক্তিরূপে গৃহীত হইতে পারে না; ইনি শুধুই লালসা তৃপ্তির নিমিত্ত গৃহীত উপপত্নী ছিলেন।

আমরা এক্ষণে দেখাইতে চেষ্টা করিব, ধীরেন্দ্রনাথ রাজা রামমোহনকে 'নব সংস্কার যুগের' গৌরব প্রদান করিতে গিয়া কি ঘৃণিত উপায়ই অবলম্বন করিয়াছেন! খৃষ্টান পাদরী ও তাঁহাদের প্রচারক শিষ্য মণ্ডলীকেও তিনি এবিষয়ে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন।

রামমোহন সম্বন্ধে আজ Speculation করিবার সময় আসিয়াছে—কেন না ইহা প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। Speculationএর দিনে একজনকে মনোমত করিয়া গড়িতে গেলে বাধাপ্রাপ্ত হইবার

সম্ভাবনা খুবই কম। বিশেষতঃ এই প্রকার নিশ্চেষ্ট আলস্যপরায়ণ দেশে—যে দেশের লোক কথায় কথায় কেবলই বলে "কে যাবে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে?" কিন্তু বনের মোষ যে ঘরও আক্রমণ করিতে পারে এবং সময়ে সময়ে করিয়াও থাকে, ইহা যেন এঁদের মনেই থাকে না। আজ এই বুনো চৌধুরীটী হিন্দুর ঘর আক্রমণ করিয়া খুবই আস্ফালন করিতেছে। কাজেই এঁকে একটু শিক্ষা দিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমরা আরো কিছুকাল সবুর করিয়া দেখিব এঁর স্পর্দ্ধার সীমা কোথায়।

ধীরেন্দ্রনাথের প্রবন্ধের আলোচনায় আমরা রাজা রামমোহন সম্বন্ধে গুটীকতক কথা না বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না।

তান্ত্রিক সাধনের জন্য গৃহীত শক্তি (?)কে সাধন-উদযাপনের পর পরিত্যাগ না করিয়া "প্রচলিত প্রাজাপত্য মতে বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গে সম্পূর্ণ একাসনে বসাইয়া" রাজা রামমোহন নাকি হিন্দুসমাজের বিবাহ-সংস্কারের পথ 'শাস্ত্রীয় পন্থাতেই' অনেকটা সুগম করিয়া দিয়াছেন। এমন প্রগল্‌ভ ও অর্ব্বাচীন যুক্তি প্রদর্শন এই শ্রেণীর শাস্ত্রজ্ঞানহীন আচার্য্যদিগকেই শোভা পায়। আজিকার দিনে রামমোহন এরূপ সংস্কারসাধনের চেষ্টা করিলে না জানি কতই পুরস্কৃত হইতেন! ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞানশূন্য, আত্মকল্পিত সমাজ-সংস্কারকদের মধ্যে আজ অনেক রামমোহনের উদ্ভব হইয়াছে। পক্ষপাতশূন্য হইয়া বলিতে গেলে আমরা বলিতে বাধ্য হইব যে, তথাকথিত উদার মতাবলম্বীদের মধ্যে এবম্প্রকারের সমাজ-সংস্কারকের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে।

বেদান্তাচার্য্য (?) মহাশয়ের মতে রাজা রামমোহন বহুবিবাহ এমন কি মুসলমান স্ত্রী (উপপত্নী?) গ্রহণ করিয়াও "নব সংস্কার যুগের সূচনা" এইরূপেই করিয়াছেন। "নবসংস্কার যুগ" ইনি কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, বিশদরূপে না বলিলেও রামমোহনাদি সুসংবদ্ধ ও সনাতন

হিন্দু সমাজে যে এক উচ্ছৃঙ্খলতাপূর্ণ পাপপঙ্কিল যুগ আনয়নের ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা একটু স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। সমাজবন্ধন—তথা যে কোন প্রকারের বন্ধন হইতে মানব-মাত্রকেই মুক্তি দিতে গিয়া ইঁহারা দেশময় কি ব্যাভিচারেরর স্রোতই আনয়ন করিয়াছেন তাহা প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা দেখাইয়া দিবার প্রয়োজনীয়তা নাই। অধুনাতন উদারমতাবলম্বী (?) পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী অগ্রগামী দলের ঘরে ঘরে অনুসন্ধান করিলেই ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ মিলিবে। এই শ্রেণীর আবহাওয়ায় পরিস্ফুট মনোবৃত্তি লইয়া চৌধুরী মহাশয়ের ন্যায় ধুরন্ধরও আজ স্বীয়মত প্রচারের চেষ্টায় শ্লাঘা বোধ করিতেছেন। সর্ব্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয়, প্রবাসী-সম্পাদক নিরাপত্তিতে এই শ্রেণীর জঘন্য আলোচনা স্বীয় পত্রিকাতে স্থান দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। একশত বৎসরের প্রচার চেষ্টায় এই পঁয়ত্রিশ কোটী ভারতবাসী মধ্যে আজ "নব সংস্কার" যুগানুগামী (?) দিগের সংখ্যা অঙ্গুলীর সাহায্যে গণনা করা যায় বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এমতাবস্থায় এঁদের এই সব জঘন্য প্রপগণ্ডার মূল্য কি আমরা বুঝিতে অক্ষম।

রামমোহন শৈশবে তিনবার বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া অনিচ্ছাকৃত দোষ স্খালনের যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা; রামমোহন ২৩ বৎসর বয়সে প্রথম বিবাহ করিয়াছিলেন; আদিগুরুর দোষ স্খালনের জন্য এই প্রকার মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণের প্রয়োজন কি ছিল?

রামমোহনের বিবাহ সম্বন্ধে ওকালতী করিতে গিয়া এই পুরুষপুঙ্গব বলেন, "একমাত্র এই বহুবিবাহ ছাড়া বর্ত্তমান হিন্দু-বিবাহসংস্কারক আইনের সঙ্গে ইহার আর কোন অমিল নাই।" চৌধুরী মহাশয়ের ওকালতী বুদ্ধি যেন ক্ষুরের ধার! কি সুন্দর যুক্তি! এমন সব লোক যে-সমাজে আচার্য্যাখ্যা লাভ করিয়া থাকে, তাহাদের সমাজ সম্প্রসারণ গতি

নিয়মানুগামীই হইয়াছে। রামমোহনের মুসলমান উপপত্নী গ্রহণ ঘটনা নাকচ করিতে গিয়া বেদান্তাচার্য্য মহাশয় এক ছেলে মানুষী হেঁয়ালীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন; এই শ্রেণীর অপদার্থদিগের কথাবার্ত্তায় কেউ যে কাণ দেয় না, ইহার যুক্তিবত্তা যে মোটেই নাই তাহা নহে; পরন্তু প্রবাসী-সম্পাদক কি বলিয়া এই শ্রেণীর লেখকদিগকে আস্কারা দিয়া থাকেন ইহাই আমরা বুঝিতে অক্ষম।

রামমোহন ছিলেন এঁদের মত ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারক। ইনি বিবাহ করিয়াছিলেন তিনটি; এবং একটী ছিলেন মুসলমানী উপপত্নী। জনশ্রুতি রাজারাম এই মুসলমানীর গর্ভজাত সন্তান। যে সমাজে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত আচরিত সংস্কার মধ্যে বিবাহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংস্কার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সমাজের সংস্কার করিয়াছেন এই রামমোহন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্ত্রী বর্ত্তমানে তিন তিনটী বিবাহ করিয়া। তিনি এই শ্রেণীর সমাজ-সংস্কারক। প্রথম বিবাহিত স্ত্রীর জীবিতাবস্থায় এবং তাহার কোন প্রকারের দোষ অবিদ্যমানে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ— সমাজ এবং ধর্ম্ম-সংস্কারক মধ্যে ভোগলিপ্সার এই প্রকার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত একমাত্র রাজা রামমোহনই প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এ সব অতীত কাহিনী এতদিনে বিস্মৃতির গর্ভে লীন হইতেছিল; কার্য্যাভাব বশতঃই কি চৌধুরী মহাশয়ের এই কণ্ডুয়ন রোগ দেখা দিয়াছে এবং ফলে এঁকে লইয়া টানা হেঁচড়া আরম্ভ করিয়াছেন? এই রোগের উত্তম ঔষধ আমাদের জানা আছে; প্রয়োজন হইলে আরো ব্যবস্থা করা যাইবে।

ধর্ম্মের জন্য যাঁহারা ব্রাহ্ম হইয়াছেন তাঁহারা অপর ধর্ম্ম বা ধার্ম্মিককে কখনও আঘাত করেন না। চৌধুরী মহাশয় কোন্ উদ্দেশ্যে ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি। প্রয়োজন হইলে তাহা আমরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইব।

রামমোহনের অতখানি বুকের কলিজা কি করিয়া সম্ভব হইয়াছিল, ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বেচারা চৌধুরী কি এক বেফাঁস কথাই না বলিয়া ফেলিয়াছেন! জন্মজন্মগত সংস্কার-ভূত, কোন অন্তঃস্থলে থাকিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-বিরোধী চৌধুরী মহাশয়ের মুখ দিয়া আজি হঠাৎ ব্রাহ্মণ্য ও কৌলিণ্যরূপ রামনাম উচ্চারণ করাইয়া ফেলিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মে ক্রন্দন ব্যতীত প্রায়শ্চিত্তের বালাই নাই; নতুবা আজি হয়তো তুষানলের দ্বারা এই পাপ স্খালন করিতে হইত।

অন্যান্য তান্ত্রিক সাধকদিগের সহিত তুলনা করিতে গিয়া চৌধুরী মহাশয় রামমোহনকে এক অসাধারণ উচ্চশ্রেণীর জীবরূপে আবিষ্কার করিয়াছেন। কারণ এই উচ্চশ্রেণীর জীবটী সর্ব্বপ্রকার সমাজ-শাসন তথা ধর্ম্মের শাসন অমান্য করিয়া স্বীয় ভোগলালসার তৃপ্তিসাধন নিমিত্ত ক্রমান্বয়ে তিন-তিনটী স্ত্রীলোককে স্বীয় অঙ্কে আশ্রয় দিয়াছিলেন! এহেন যুক্তির সারবত্তার প্রসংশা না করিয়া পারা যায় না।

প্রয়োজন হইলে বারান্তরে আমরা তুলনামূলক দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, আমাদের বর্ত্তমানে **'রোহিনীকান্ত'**, চৌধুরী মহাশয়দের অতীতের রামমোহন অপেক্ষা কোন হিসাবে হীন পর্য্যায়ভুক্ত নহেন।

ধীরেন্দ্রনাথ বলিতেছেন, মুসলমানীকে শক্তি (উপপত্নী) রূপে গ্রহণ করিয়া তৎপর বৈধ পত্নীরূপে তাহাকে ঘোষণা করা কুলীন ব্রাহ্মণ রামমোহনেই সম্ভব হইয়াছিল। আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে, এই কলিকাতার "নবতারা" অথবা "কুসুমকুমারী"র কোন নৈকষ্য কুলীন উপপতি যদি তাহাদিগকে বৈধপত্নী রূপে ঘোষণা করে, তবে আলোকপ্রাপ্ত সমাজে তাহাদের স্থান হইবে কি না?

সাহিত্যের বাসরে বরবিভ্রাট

পোড়াবাজার মেলাই সার মিল্‌ছে সব্ সাহিত্যিক—
বুড়ো তরুণ কাঁচা ও ঝুন্ সব্ হাজির সবাই ঠিক্।
কন্যে আজ পরিয়া সাজ হাজির হয় সভার মাঝ—
কোথায় বর কোথায় বর ঘুর্‌ছে সব দিক্‌বিদিক্।

কবি রবি বর যে সে নেইতো রে কোথায় সেই?
বিশ্বভার ভাবনা তাঁর লগ্ন বে'র মনেই নেই।
ঘর বাহির গরহাজির বাহির ঘর সবাই খোঁজ্—
যায় লগন্ ধ্যান-মগন হারিয়ে বায় কবির খেই।

কাহার শাপ্ মেয়ের বাপ্ পাল বিপিন্ মাথায় হাত!
তাঁর পিছু বাঘ-শিশু রম্‌প্রসাদ্ আপনি কাৎ।
ভির্‌মী যায় বাগ্‌চী হায় রায় কবি শোক-ছবি—
তরুণ দল্ চক্ষে জল্ রেগে আগুণ তাহার সাথ্।

বরটী আর আনাও তার লগন যায় লগন যায়—
বিশ্বভার স্কন্ধে যার মোদের ভার দেবো না তায়।
জুট্‌লো বর কবির ঘর মেয়ের বর মেয়েই হোক্—
আবার চুপ্ সবাই খুব্ সম্মিলন স্তব্ধ প্রায়।

পাল বিপিন্ জ্ঞান-প্রবীণ আগে করে সম্প্রদান!
পরেই বর হর্ষান্তর পাঠ করে তার বয়ান্।
বর-কনে এক সনে বাসর ঘর জোগার কই?
যাক্ বাসর হোক্ আসর সরগরম্ রাত কাটান।

শান্তা-সীতা-কষ

স্থান ঃ—সোনাগাছি আদালত

বিচারকর্ত্রী—পতিতা কুমারী শ্রীমতী মানদাসুন্দরী দেবী স্বীয় আসনে উপবিষ্টা। আসামী পক্ষের উকীলগণ এবং সরকারী উকীল পতিতা শ্রীমতী সুরুচিবালা, শ্রীমতী কালিদাসী স্ব-স্ব আসনে উপবিষ্টা। পাব্‌লিক্ প্রস্‌ইকিউটর মহাশয়া, পেস্কার ডালিমমণি এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণও যথাস্থানে হাজির। গরহাজির কেবল আসামী শ্রীযুক্তা শান্তা দেবী ওরফে শান্তা নাগিনী।

বিচারক কহিলেন, আমি এখন মামলা আরম্ভ করিব। আসামী পক্ষের উকীল মুকুল ব্যানার্জ্জী উঠিয়া বলিলেন, হুজুরালী, আমার একটা আর্জ্জি আছে।

আদালত। আপনি কে?

উকীল। আমি আসামী পক্ষের উকীল। আমার মক্কেল অসুস্থ বিধায় তাঁহার হইয়া মামলা চালাইতে চাই।

আদালত। পিটিশনাদি আগেই করিয়াছেন দেখিতেছি। আপনার আর্জ্জি মঞ্জুর। এবারে পাব্‌লিক্ প্রস্ (ইকিউটর) মহাশয়া মামলার চার্জ্জ বুঝাইয়া দিবেন।

উকীল। আমার আর একটি আবেদন আছে হুজুরালী। আসামী উচ্চবংশসম্ভূতা। আসামীর স্বামী উচ্চশিক্ষিত ভদ্রসন্তান; আসামীর পিতাও স্ব-সমাজের একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। এ অবস্থায় এই আসামীর বিচারকার্য্য এই আদালত হইতে কোন পুলিশ কোর্টে লইয়া যাওয়া হোক।

পাব্‌লিক্ প্রস্। আমার ইহাতে আপত্তি আছে। আসামীর

বিরুদ্ধে যে শ্রেণীর অভিযোগ, তাহা এই আদালতেরই বিচার্য্য। আমি প্রমাণ করিয়া দিব, আসামীর অপরাধ এই আদালতের জুরিস্‌ডিক্‌সনের অধিবাসিনীদের সমধিক ক্ষতি করিয়াছে। তজ্জন্য এই মামলা অন্যত্র ট্রান্স্‌ফার করা যায় না।

আদালত। ট্রান্স্‌ফার স্থগিদ্ রহিল। এবারে পাব্‌লিক প্রস্ (ইকিউটর) মহাশয়া মামলার চার্জ্জ বুঝাইয়া দিবেন।

পাব্‌লিক্ প্রস্। আসামী উচ্চশিক্ষিতা, ভদ্রসন্তান ইহা আমাকে অবশ্যই মানিতে হইবে। তাহার পিতা ও স্বামীর সামাজিক সম্মান সম্বন্ধেও সংশয়ের অবকাশ নাই। এই জন্যই তাহার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তাহা আরও প্রবল। আসামী নাকি বাংলার একজন সাহিত্যিকা—অন্ততঃ একদলের নিকট সাহিত্যিকা বলিয়া পরিচিতা। আসামীর পিতার কয়েকটী মাসিকপত্র ও একটী ছাপাখানা আছে। এই মাসিক পত্র ও ছাপাখানার অস্তিত্বই আসামীর লেখনী-কণ্ডুয়নকে আহুতি দিয়া বাড়াইয়া তুলিয়াছে। ফলে আসামী বেপরোয়াভাবে কলম চালাইয়া বাংলার সরস্বতী মায়ের আঙিনাখানিতে একটী ডাষ্ট্‌বিনের সৃষ্টি করিয়াছে।

আদালত। ঈয়েস্—

পাব্‌লিক্ প্রস্। অভিযোগ-গঠনের জন্য পুলিশ যে-সকল Exhibit যোগাড় করিয়াছে, সেগুলি আমি আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করিতে চাই। এক নম্বর 'এক্‌স্‌হিবিট্' আসামীর রচিত উপন্যাস **'চিরন্তনী'**। এই বইটীর উপরেই আমি আজ বিশেষভাবে জোর দিতে চাই। আরো অনেক বস্তু সংগ্রহ করা ছিল; কিন্তু আমার বিবেচনায় আজিকার দিনের জন্য এটীই যথেষ্ট।

আদালত খানাতল্লাসকারীদের তলব করিলেন; তাহারা উঠিয়া সাক্ষ্য দিল যে, বাজারের পুরাতন-পুস্তকালয় খানাতল্লাস করিয়া তাহারা বইখানি পাইয়াছে।

আদালত আসামী পক্ষের উকীলকে প্রশ্ন করিলেন, আপনার মক্কেল আপনাকে দোষী বা নির্দ্দোষ, কি বলিতে চান ?

উকীল। নির্দ্দোষ।

পাব্‌লিক্ প্রস্। হুজুর, 'চিরন্তনী' উপন্যাসের নায়িকা করুণা অবিনাশ ও সুপ্রকাশ দুই ভাইয়ের নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইয়াছে। কখনো দড়ি ছাড়িয়া আল্‌গা দিয়াছে, কখনো শীকার পলাইয়া যায় ভাবিয়া কষিয়া ধরিয়াছে। করুণা প্রগতিপ্রাপ্তা ব্রাহ্মিকা। যে বয়সে সে ছোট ভাই-বোন-দের উপার্জ্জন (অবশ্য অসদুপায়ে নহে) করিয়া খাওয়ায়, সে বয়সটাও তার কম ছিল না। ব্রাহ্ম গৃহস্থের এহেন ধাড়ী মেয়ে দু'-দু'জন পুরুষের প্রেমের খোরাকী জোগান দিয়াছে, ইহা কেবল হুজুরালীর জুডিস্‌ডিক্‌-সনের মধ্যেই সম্ভব নহে কি ?

আদালত। আসামীর বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগটা কি স্পষ্ট করিয়া বলুন।

পাব্‌লিক্ প্রস্। আমার অভিযোগ একটী নয়, কয়েকটী। আমার প্রথম অভিযোগ আসামী আলোকপ্রাপ্ত ব্রাহ্ম-পরিবারের মধ্যে বেশ্যাতুল্য এক নারী চরিত্র সৃষ্টি করিয়া বেশ্যাদের পশার মারিবার চেষ্টা করিতেছে। কারণ এই প্রকারে অনেক প্রগতিপ্রাপ্তা নারী উপার্জ্জনের পথ প্রশস্ত করিয়া গিয়াছেন—ইহার পথ প্রদর্শিকা আসামী। দ্বিতীয় অভিযোগ হিন্দু আচার-বিচারের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া হিন্দুধর্ম্মের অবমাননা করিয়াছেন। তৃতীয় অভিযোগ—শব্দের অপব্যবহার করিয়া ভাষার শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়াছেন। চতুর্থ অভিযোগ.....

আদালত। আর নয়, এইগুলি এবারে প্রমাণ করুন।

পাব্‌লিক্ প্রস্। তাহাহইলে সাক্ষীদের এখনি ডাকিতে হয়।

আদালত। ডাকুন—

প্রথম সাক্ষী শ্রীমতী নবতারা দাসী সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইল।

সাক্ষী বলিল—আমার নাম নবতারা দাসী, নিবাস দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট ; পেশা—রূপহীন যৌবনের বেশাতি।

পাব্‌লিক্ প্রস্। আসামীর লেখা 'চিরন্তনী' বইখানি তুমি পড়িয়াছ ?

সাক্ষী। হাঁ।

পাব্‌লিক্ প্রস্। বইখানি পড়িয়া আসামী সম্বন্ধে তোমার কি মনে হইল ?

সাক্ষী। মনে হইল, আসামীর বই লিখিবার সখ ও সুযোগ আছে, কিন্তু ক্ষমতা নাই।

পাবলিক্ প্রস্। আর কিছু ?

সাক্ষী। হাঁ—আরও মনে হইল, ব্রাহ্ম যুবতীদের সম্বন্ধে আসামীর ধারণা ভাল নহে। তাই তিনি ব্রাহ্ম যুবতী করুণাকে এমন করিয়া আঁকিয়াছেন যে, সময় ও সুযোগ পাইলে সে আমাদের সহিত পাল্লা দিতে পারে।

আদালত। ইয়েস্—

পাবলিক প্রস্। আমার জবানবন্দী গ্রহণ হইয়া গিয়াছে।

বিচারক আসামী পক্ষের উকীল মুকুল ব্যানার্জ্জীর দিকে চাহিলেন উকীল মুকুল ব্যানার্জ্জী সাক্ষীকে জেরা করিতে দাঁড়াইলেন।

প্রশ্ন। তুমি বলিতেছ, ব্রাহ্মিকাদের সম্বন্ধে আসামীর ধারণা উচ্চ নহে ?

উত্তর। আসামীর লিখিত বইখানি পড়িয়া যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই বলিলাম।

প্রশ্ন। তুমি জান, আসামী নিজে একজন ব্রাহ্মিকা ?

উত্তর। এ কথা শুনিয়া আমি আরো বিস্মিত হইলাম ?

প্রশ্ন। বইখানি তুমি কোথায় পাইলে ?

উত্তর। এক বাবু আমাকে দিয়াছেন।

প্রশ্ন। তোমার সে বাবুটী কে ?

আদালত এ প্রশ্নে আপত্তি করিলেন। পরে নীরব উকীলবাবুটীর পানে চাহিয়া বলিলেন, ঈয়েস্! উকীলবাবু জানাইলেন যে তিনি আর জেরা করিবেন না। দুই নম্বর তিন নম্বর, চারি নম্বর সাক্ষীদের ডাকা হইল; তারাও অনুরূপ সাক্ষ্য দিল। আসামী পক্ষের উকীল জেরা করিতে গিয়া আরও খোঁচা খাইলেন মাত্র।

পঞ্চম সাক্ষী সরোজিনী দাসী, নিবাস নিতাইবাবু লেন। সে বলিল—বইখানি সে ভাল করিয়াই পড়িয়াছে।

আসামী পক্ষের উকীল। এই বইএর মধ্যে এরূপ কথা পরিষ্কার আছে জান যে, করুণা অবিনাশ ও সুপ্রকাশকে প্ররোচিত করিয়াছে ?

সাক্ষী। অবশ্যই সে অগ্রসর হইয়া করে নাই; উহাদের আকর্ষণের অনলে ক্রমাগত আহুতি দিয়াছে।

প্রশ্ন। বইএর ১২১ পৃষ্ঠায় আছে "অবিনাশের নিত্য আগমনের আড়ালে কি উদ্দেশ্য, করুণা সেটা জানে বলিয়া স্বীকার করিত না।" এখানে তো করুণার গরজ বেশী দেখা যাইতেছে না!

উত্তর। স্বীকার করাটা প্রগতির লক্ষণ নয়। মনে মনে সে জানিত, অবিনাশের আসাটা "করুণার গর্ব্বের রূপ ধরিয়াই দেখা দিত" এও ঐ বইএর ভাষা।

আদালত। এভাবে কতদিন অবিনাশ আসিয়াছে ?

সাক্ষী। অনেকদিন। প্রতিদিনই করুণা অবিনাশের সহিত হাওয়া খাইতে গিয়াছে; তার মোটরে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে।

আঃ উকীল। শেষে করুণা অবিনাশকে ছাড়িয়া দিয়াছিল তো ?

সাক্ষী। দিয়াছিল, কিন্তু আগে নিজেকে বন্ধক রাখিয়া, আঁটঘাট বাঁধিয়া। অবিনাশকে সত্য সত্য পরিত্যাগ সে ততদিনে করে নাই, যতদিন না সুপ্রকাশকে বাগে পাইয়াছে।

আদালত। সুপ্রকাশকে পাইয়া অবিনাশকে ছাড়িবার মানে ?

সাক্ষী। সুপ্রকাশ যুবক—সুদর্শন, বাঁশী বাজায়, কুস্তি লড়ে, গুছাইয়া গুছাইয়া প্রেমের কথা কহিতে জানে, আবার লেখাপড়াও জানে।

আদালত। Oh—the best target!

উকীল। হুজুরালী, করুণার এই কাজটাকে বর-সংগ্রহের চেষ্টারূপে ধরিয়া লওয়া যায় তো!

আদালত। সেটাও বেশ্যাবৃত্তিরই নামান্তর। বিবাহের জন্যই হৌক্ কি লালসার নিবৃত্তির জন্যই হৌক্ একটী দু'টী করিয়া পুরুষ চাখিয়া বেড়াইবার অন্য নাম বেশ্যাবৃত্তি।

উকীল। আমার পক্ষের কয়েকজন সাক্ষী আছে।

আদালত। তাহাদের নাম ফাইল করিয়া রাখুন; শুনানীর আগামী দিনে তাহাদের সাক্ষ্য লইব। অন্যান্য অভিযোগ প্রমাণের জন্য সরকার পক্ষে যে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে, তাহার সেইদিনই লইব।

আসামী পক্ষের উকীল সাক্ষীর নাম লিখাইয়া রাখিলেন—সত্যেন্দ্র-চন্দ্র মিত্র, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ও নলিনীরঞ্জন সরকার। সেদিনের মত আদালত বন্ধ হইল।

সাহিত্য ও অসাহিত্য

আর্টের অপার মহিমা! আর্টের নামে ভদ্রসমাজে নারীনৃত্য চলিয়া যায়, আর্টের নামে অশ্লীল ছবি ধর্ম্মধ্বজীদের কাগজের বুকে শোভা পায়। পৌষ মাষের প্রবাসীর প্রথম ছবিখানি খুলিয়া দেখুন। আর্টস্কুলের হেড্ মাষ্টার রমেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর আঁকা সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ! ছবিখানি যদি ছবির মতো হইত, অর্থাৎ ছবির figureগুলি যদি মানুষের অবয়বের সাদৃশ হইত, তাহাহইলে তো ছবিখানিকে পেরিশ

পিকচার বলিয়াই ধরিয়া লইতাম। যিনি এমন চমৎকার ছবি আঁকিতে পারেন তাঁকে কি বলিয়া প্রসংশ করিব জানি না। ইনি নাকি পূর্ব্বে কালীঘাটের পট আঁকিতেন। এখন হেড্ মাষ্টার হইয়াছেন। এঁর কাছে ছেলেরা শিখিবে ভাল।

পুরুষটীর (সিদ্ধার্থের বলিয়া মহাপুরুষের অবমাননা করিবনা।) সুমুখে যে রমণীটী শুইয়া রহিয়াছেন, তিনি অর্দ্ধ-বিবসনা। শরীরের নিম্নার্দ্ধে যে বস্ত্র আছে, তাহাও অতি সুক্ষ্মভাবে দেহের ভাজগুলির সাথে এমনভাবে মিশিয়া রহিয়াছে যে, বর্ণ ছাড়া দেহের সঙ্গে স্বাতন্ত্র্যের কোন লক্ষণ নাই।

রমণীটী শুইয়া রহিয়াছেন উপুর হইয়া পায়ের আঙুলে ও হাতের কনুইএ ভর করিয়া; অথচ স্তন দু'টি display করিবার ব্যবস্থা সঠিক রাখিয়াছেন। কোমর পর্য্যন্ত উপুর করিয়া রাখিয়া অবশিষ্ট অঙ্গ চিৎ করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্য একমাত্র স্তনের বাহার দেখান ব্যতীত আর কি হইতে পারে। এনাটমি অনুসারেও এই চিত্র মারত্মক ভুল। নীচে যে দুটী রমণী বসিয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা স্তনের প্রদর্শনী খুলিয়া খদ্দের ডাকিতেছেন। এমন ছবিটী সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের ছবি! প্রবাসী হিন্দুর দেব-দেবী লইয়া ব্যঙ্গ করিতে কসুর করে নাই; এবারে বৌদ্ধদের পালা! হিন্দুরা নিরীহ; বৌদ্ধরাও কি তাই? সরকার ইহার বিরুদ্ধে অশ্লীলতার চার্জ্জ আনিবেন শুনিতেছি

এক দলের নিকট প্রবাসীর সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলির সুখ্যাতি শোনা যায়। রামানন্দবাবুর জ্ঞানের পরিধি মাপিয়া দেখি নাই; তথাপি তাঁহার সম্বন্ধে ধারণা আমাদের ছোট নহে। তাঁর জ্ঞান ও প্রতিভাকে যেমন শ্রদ্ধা করি, দাম্ভিকতা ও বিজ্ঞতাকে তেমনি অপচ্ছন্দ করি। কিন্তু রামানন্দবাবুর ভাষাজ্ঞানের উপরে আস্থা স্থাপন করিতে পারি না এতটুকুও। অল্প কথাকে ঘোরালো করিয়া লিখিতে গিয়া তাঁহার রচনা কিরূপ হাস্যাস্পদ হইয়া ওঠে, তাহার কিঞ্চিৎ নমুনা দেখুন—

"বাহিরের দর্শকরূপে আমরা দেখিতেছি যে, ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কংগ্রেস ডোমিনিয়ন্ ষ্টেটাসের জন্য অপেক্ষা করিতে বাধ্য ছিলেন। ঐ তারিখ তাহার...কোনো প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল না; সুতরাং কংগ্রেসের পক্ষে পূর্ণ স্বাধীনতাকে লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করা কলিকাতা কংগ্রেসের স্বাভাবিক ও সঙ্গত ফল বলিয়া মনে করি। যদি কংগ্রেস্ তাহা না করিতেন, তাহাহইলে কংগ্রেসকে বলিতে হইত, আমরা ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস পাইয়াছি, অতএব পূর্ণ-স্বাধীনতাই লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্ না পাওয়ায় ইহা বলা চলিত না। কংগ্রেস্ আর কিছু বলিতে পারিতেন কি? কংগ্রেস কি বলিতে পারিতেন যে, ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্ অবিলম্বে; যখনই অতঃপর পার্লামেণ্টে নূতন ভারত-শাসন আইন পাশ হইবে, তখন হইতে পাওয়া যাইবে? তাহাও বলিতে পারিতেন না। কারণ এরূপ প্রতিশ্রুতি বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষীয় কোন ব্যক্তি দেন নাই। তাহা হইলে কি বলিতে পারিতেন, তথাপি আশা করিতেছি, ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্ অবশ্যই পাইব? তাহাও পারিতেন না। কারণ এরূপ আশার ভিত্তি কি? কিছুই বলিতে পারিতেন না..."

এইরূপ একটানা ভাষায় চলিয়াছে—বিরাম নাই। দোয়াত ভরা কালি থাকিলে আর যথেষ্ট অবসর থাকিলে এইরূপ হয়। কণ্ঠের থলিয়ায় অল্প সঞ্চয় থাকিলেও সারাদিন ধরিয়া গিলিত-চর্ব্বণ করা যায়। সেজন্য দুঃখ নাই। দুঃখ এইজন্য যে, ইহাই এদেশের জর্ণালিজমের আদর্শ এবং ইহারই দৌড় জেনেভা পর্য্যন্ত!

বিচিত্রা যে 'এরিষ্টক্রাটিক' কাগজ তাহা জানিতাম, কিন্তু সে যে একেবারে হাকিমী কাগজ হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা জানিতাম না।

তরুণ-হাকিম মিঃ অন্নদাশঙ্কর রায় আই-সি-এস্ বিচিত্রার Monopolised হাকিম, ইহাই আমাদের ধারণা ছিল। কিন্তু দেখিতেছি, বিচিত্রার বিচিত্র গগণে আর এক হাকিমচন্দ্র আসিয়া উদিত হইলেন! ইনি হাকিম (রচনা দেখিয়া তরুণ হাকিমই মনে হইতেছে) মিঃ সুধাংশুকুমার হাল্‌দার আই-সি-এস্। এই হাকিম-মহাশয় পৌষ সংখ্যা বিচিত্রায় 'কর্ত্তার কাণমলা'নামে এক না-নাটক না-কবিতা গোছের নাট্যকাব্য লিখিয়া বাংলার 'ওল্ড ফুল' ফাদারদের কাণমলা দিয়াছেন কি বাংলা মাসিকের পাঠকদের কাণমালা দিয়াছেন, ঠিক বুঝিলাম না। এই নাট্যকাব্যের নায়ক-নায়িকা, পাত্রপাত্রীরা সকলেই যেন চিড়িখানার জীব! হাকিম মহাশয়ের বাহাদুরী আছে, তিনি আদালতের দৃশ্য বর্ণনা করিতে গিয়া উকীল, ব্যারীষ্টারের সঙ্গে বিচারকরূপে সেসন-জজেরই কথা লিখিয়াছেন। আসামীকে একেবারেই দায়রায় সমর্পণ করিয়া ম্যাজিষ্টেটকে রেহাই দিয়াছেন! কেন? ম্যাজিষ্টেট্‌টী কি এখনো সেরেস্তার কাজে এপ্রেন্টিসী করিতেছেন?

আশ্বিনের শনিবারের চিঠির প্রথম ছবিখানি দেখিয়া আমরা বিস্মিত না হইয়া বরঞ্চ খুসী হইয়াছি। করজোড়ে মিনতি এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠপ্রদর্শন সে বরাবরই একসঙ্গে করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু তাহার এই বহুরূপী ভাব মুখে—স্থূল ইঙ্গিতে প্রকাশ করে নাই। আমরা কিন্তু মর্ত্তমান-মার্কা অঙ্গুষ্ঠ দু'টীর পেছনে ইয়া এক তাড়া গোঁফ আর ছোট দু'টী গোলাকার চক্ষু দেখিতে পাইলে অধিকতর খুসী হইতাম। অঙ্গুষ্ঠ দু'টী দেখিয়া আমাদের জনৈক রসিক বন্ধুতো আনন্দের আবেগে গাহিয়াই উঠিয়াছিলেন—

না জানি কতেক মোটা ভুঁড়িখানি তার গো
এত মোটা হাতখানি যার—
নাহি জানি বাহু তার রম্ভা তরু প্রায় গো
মর্ত্তমান অঙ্গুষ্ঠ যাহার!

না জানি সে মস্তিষ্কের গোবর কাহার নাদ
এত বিষ্ঠা রহে যার ঘটে—
মানিকতলা স্পারে চর্কিতে দেখিনু গো
আঁকিয়া রাখিনু মনঃপটে।

আমাদের নরেনদা এখনো নিশ্চিন্ত মনে হাটিয়া চলিয়া বেড়াইতেছেন কোন সুখে? সজনী যে তাঁহার পশার মাটি করিতে বসিল! নরেন-দা কাব্যদীপালি তৈরী করিয়া নাম করিয়াছিলেন, সজনী তাহার উপর আর-এক আলি বাঁধিবে নূতন এক কাব্য-সংগ্রহ ছাপাইয়া! এই কাব্য-সংগ্রহে সজনী আপনার কবিতাগুলি বেশী করিয়া ভরিয়া দিয়া নরেনদার উপেক্ষার ক্ষোভ মিটাইবে। এই নূতন 'কাব্যালি' দিয়া সজনী নাকি বেশ দু'পয়সা গুছাইয়া লইতেও পারিবে—কারণ শনিচক্রের মোহিত আর সুশীল এখানিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য করিয়া দিবে এবং এই ভরসাতেই নাকি সজনী এই মহৎকার্য্যে হাত দিতেছেন।

কালিকলমের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার দু'টী মাম্‌লা দায়ের হইয়াছে শুনিয়া কেহ কেহ উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছেন দেখিতেছি। ইঁহাদের উল্লাসের কারণ এই যে, এতদিনে তরুণ লেখকদের শায়েস্তা করিবার পথ পড়িল। কিন্তু হায়! তরুণ সাহিত্যিকগণের শুভাকাঙ্ক্ষীদের এই উল্লাস নিতান্তই বৃথা—তরুণের কাগজ কালিকলম মামলার দায়ে পড়িলেও রচনা দু'টী তরুণের নহে; প্রবীণেরই। নিরুপম গুপ্তের নামে যে রচনাটী, সেটী নাকি প্রবাসী-পর্য্যায়ের মহেন্দ্র রায়ের—যিনি মেটারলিঙ্কীয় মহেন্দ্র রায় বলিয়া পরিচিত। ইনিই গবেষণার গো-রচনা ছাড়িয়া গল্প লিখিবার

সময়ে নিরুপম গুপ্ত নাম ধরিয়া তরুণ সাজিয়া বসেন। অতিরিক্ত তারুণ্য দেখাইতে গিয়া ইনিই কালিকলমের ঘাড়ে মামলার বোঝা চাপাইয়া দিয়াছেন। দ্বিতীয়টী সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এই বন্দ্যোপাধ্যায় পুঙ্গবও তরুণ নহেন; বরং তরুণের উপরে ইঁহার আক্রোশ আছে। শনি মণ্ডলের ইনি একজন চাঁই, সজনীর পার্শ্বদ। সজনী ইহার বইও ছাপিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছে। ইনিই আপনার নভেল চিত্রবহার ৩৬৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিলেন—ট্যাঁকে নেই পয়সা,...এসেছে মেয়ে মানুষ...?

———

তরুণে-শনিতে মিলন এক দিক দিয়া, গঞ্জন-প্রকাশালয়ে আর ডিম্ব লাইব্রেরীতে মিলন অন্যদিকে। নজরুলের বুলবুল প্রবাসী প্রেস হইতে ছাপাইয়াও শনির দৃষ্টি এড়ানো যায় নাই। শ্রীশ্রীগোপাল না হয় ব্যবসার খাতিরে সব পারেন, কিন্তু নজরুল সহ্য করিতেছেন কি করিয়া?

———

তাড়াহুড়া করিয়া ছাপিবার দরুণ ভাল করিয়া প্রুফ্ দেখিতে না পারায় "পয়লা নম্বর" রবিবারের লাঠিতে অনেক ভুল রহিয়া গেল। পরবর্ত্তী সংখ্যা হইতে এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা যাইবে।

———

Printed and Published by Keshab Sen at Vidyoday Press, 16/1A Beadon Street, Calcutta.

প্রথম বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩৩৬ [দ্বিতীয় সংখ্যা

হিন্দুত্ব ও জাতীয়তা

ধর্ম্ম আগে না জাতীয়তা আগে, এই প্রশ্ন অনেক জায়গায় শুনিতে পাই। কেহ কেহ বলিতেছেন, ধর্ম্ম যেখানে জাতীয়তার পরিপন্থী, সেখানে ধর্ম্মকে বর্জ্জন করিয়া করিয়া জাতীয়তার ভিত্তিকে শক্ত করিয়া ধরিয়া থাকা কর্ত্তব্য। আবার কেহ কেহ ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য জাতীয় স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতেও প্রস্তুত।

তৃতীয় পক্ষ আবার উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের এক মূলসূত্র খুঁজিতেছেন। যতদিন ধর্ম্মকে শাস্ত্রানুশাসনের সমষ্টিরূপেই কেবল দেখা হইবে এবং জাতীয়তাকে দেশের বা সমাজের সাধারণ শান্তিময় অবস্থা হইতে পৃথক করিয়া লইয়া একটী বিশিষ্ট রূপ দান করিবার চেষ্টা চলিবে, ততদিন এই দু'টী বস্তুর মিলন কিছুতেই সম্ভব হইবে না। সর্ত্তাপেক্ষ মিলন আসল মিলনকে ঠেকাইয়া রাখিবে মাত্র।

আমরা হিন্দু; আমাদের ধর্ম্মগত যে সত্তা, তাহাই আমাদের হিন্দুত্ব।

[এই হিন্দুত্ব আমাদের জীবনের বহু ধারার মধ্যে, একটী নহে। ধর্ম্ম যদি মানুষকে কেবল মাত্র ঈশ্বরোপাসনার প্রণালী বলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইত, তাহাহইলে তাহাকে বহুমুখী জীবনের একটী মাত্র দিক বলিয়া মনে করিতে পারিতাম। কিন্তু মানুষ যাহা ধারণ করিয়া রহিয়াছে—বিশ্বসংসারে যাহার উপরে মানুষের স্থিতি, গতি, বিস্তৃতি এবং বিস্মৃতি, তাহাই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম তাহাকে কেবল ঈশ্বরের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াই ক্ষান্ত হয় না; তাহার নিজের জীবনের সহিত, সংসারের সহিত, দশজনের সাহত, বিশ্বের সহিত পরিচয় করাইয়া দিবার ভারও ধর্ম্মই গ্রহণ করে।

বিশেষ করিয়া আমাদের হিন্দুধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্ম আমাদের জীবনের দশবিধ সংস্কারের মধ্য দিয়া জীবনের বিভিন্ন অংশকে মধুময় করিয়া দেখিবার উপদেশ দেয়—জীবনের মধ্যে জীবনকেই বড় করিয়া দেখিবার শিক্ষা না দিয়া আদর্শের পূজা করিতে শিক্ষা দেয়। যেখানে প্রতিপদে নিরুৎসাহ ও নিরুদ্যম আসিয়া মানব জীবনকে গ্রাস করিতে চায়, পাপভয় প্রত্যেকটী মুহূর্ত্তকে বিষময় করিয়া তুলিবার উদ্যোগ করে, সেখানে হিন্দুর ধর্ম্মানুশাসন তাহাকে 'অমৃতের পুত্র' বলিয়া সম্বোধন করিয়া এবং তত্ত্বমসি বলিয়া অভিনন্দিত করিয়া হিন্দুকে তাহার মানবত্ব বলিয়া ভাবিতে ও বুঝিতে শিখায়।

ধর্ম্মের উচ্চতম আদর্শও বুঝি ইহাই। ধর্ম্মগত যে জীবন, তাহা যখন ঠিক ঠিক মানবত্বে 'অমৃতের পুত্রত্বে' পৌঁছাইয়া দেয়, তখন আর তাহার কোন কর্ত্তব্য বাকা থাকেনা। 'যতো বাচা নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' যে ঈশ্বর, তাঁহাকে পাইবার পথ-নির্দ্দেশের মাত্র ভার ধর্ম্মের বা ধর্ম্মানুশাসনের উপরে। আমাদের ধর্ম্ম আমাদের শিখাইয়াছে, কেবল মন্দিরে গিয়া দেব-বিগ্রহের মাথায় পুষ্প-বিল্বদল দিয়া আসিলেই ধর্ম্মাচরণ শেষ হইবে না—গর্ভাধান হইতে পুনরায় শ্মশানশয্যা গ্রহণ

পর্য্যন্ত সারাটী জীবনে ধর্ম্মের বিধি ব্যবস্থা অনুসারে তাহাকে চলিতে হইবে; আহার বিহার সংযমিত করিতে হইবে; প্রবৃত্তিকে সংযমিত করিতে হইবে; সমুদয় চিত্তবৃত্তিকে আপনার পরমার্থের—জন্য 'বহুজন-হিতায় বহুজন সুখায়াচ' নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

এ গেল ব্যক্তিত্বের দিক। সমাজ-গত বা সংঘ-গত যে জীবন, যাহার অনেকগুলির সমষ্টিতে একটী সমাজ, একটী জাতি বা একটা দেশ গড়িয়া ওঠে, তাহাকেই আমরা সামাজিক হিসাবে ব্যক্তিত্ব বলিয়া ধরিয়া থাকি। হিন্দুধর্ম্ম জীবনের এই দিকটীকে জীবনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় করিয়া দেখিতে শিক্ষা দিয়াছে—ব্যক্তিগত সুখদুঃখকে উপেক্ষা করিতে শিখাইয়া, সমাজের জন্য ব্যক্তির আত্মবলিদান ব্যবস্থা করিয়া।

হিন্দুর সামাজিক জীবন যাপনের যে প্রথা, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বলিয়া তাহাকেই অভিহিত করা হয়। বর্ণাশ্রমবিরোধী হিন্দু বলিয়া পরিচিতগণ হিন্দুর হিন্দুত্ব আর বর্ণাশ্রমকে একই জিনিষ বলিয়া থাকেন। জীবন আর জীবন-যাপন প্রণালী যদি এক হয়, তবে ঐ দুই জিনিষও এক হইতে পারে; কিন্তু যতই যুক্তিসঙ্গত ও সারবান্ হোক, পথ ও লক্ষ্য কখনও এক হইতে পারে না। ব্যক্তিগত মুক্তি-আকাঙ্খা যাহার একান্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে বর্ণাশ্রমের বেষ্টনী মধ্যে বাঁধিয়া রাখিবার উপদেশ হিন্দুর ধর্ম্মানুশাসকগণ কখনো দেন নাই—শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি যুগাবতারগণ সকলেই নিজে বর্ণাশ্রম কতকাংশে ভঙ্গ করিয়াছেন; কিন্তু বর্ণাশ্রমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে ছাড়েন নাই।

আজিকার সমাজ যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, বর্ণাশ্রমকে আমরা তাহার অনুপাতে বিচার করিব না—হয়তো মনুষ্যত্বের ও নীতির দিক দিয়া অধঃপতন বর্ণচতুষ্টয়ের ঘটিয়াছে। আমরা কেবল ইহাই দেখিব যে,

বর্ণাশ্রমের প্রবর্ত্তন সমাজের ঐক্য-সাধনের জন্য—সমাজকে ও সামাজিক জীবনকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিবার নিমিত্ত নয়।

একই মানুষের কর্ম্মশক্তি বিভিন্নদিকে পরিস্ফুরিত হইয়া উঠিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। সাধারণতঃ তাহার চিত্তবৃত্তি বিশেষ এক কর্ম্মধারা বা চিন্তাধারাকে আশ্রয় করিয়া তাহারই মধ্যে বিকশিত হইতে চায়। মনের ও দেহের এই স্বাভাবিক দাবীকে পরিপূরণ করিয়া সমষ্টি হিসাবে সমাজের শৃঙ্খলতা-বিধান জন্যই চতুর্বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু সে বিভাগ ব্যক্তিগত, বর্ণগত নয়। বর্ণগত বিভাগকে ধর্ম্মনৈতিক না বলিয়া রাষ্ট্রনৈতিক বলা চলে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন জাতির সৃষ্টি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন হইতে উদ্ভূত—সমাজের দাবী অবশ্য ইহা দ্বারা পরিপূরিত হইয়াছে। তারপর ব্রাহ্মণ। পাশ্চাত্যে রাষ্ট্রশক্তিই ব্রাহ্মণকে অর্থাৎ priest বা ধর্ম্মযাজকসম্প্রদায়কে সৃষ্টি করিয়াছে; আর আমাদের দেশে ব্রাহ্মণই ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য-শূদ্রের মধ্য দিয়া রাষ্ট্র এবং সমাজের গঠন করিয়া দিয়া আপনাদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে ধর্ম্ম ও পূজা অর্চ্চনার মধ্যে। রাষ্ট্রও তাহারই মস্তিষ্কে পরিচালিত হইয়াছে—তাহারই অঙ্গুলি-হেলনে রাষ্ট্রশক্তির ভাঙাগড়ার খেলা চলিয়াছে। কেবল নিজে সে পাশ্চাত্যের পুরোহিত-সম্প্রদায়ের ন্যায় রাষ্ট্রের কাছে নিজকে ধরা ছোঁয়া দেয় নাই; তাহার প্রদত্ত রাজভোগে নিজের পরিপুষ্টি করিতে না যাইয়া আপনার পর্ণ-কুটীরে বাস ও শাকান্ন-ভোজনে পরিতৃপ্ত থাকিয়া আত্মমর্য্যাদা এবং রাষ্ট্র ও সমাজানুশাসন-রচনা করিবার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

আজিকার ব্রাহ্মণ বা আজিকার বর্ণাশ্রম কি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা দেখিয়া বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে বিচার করিতে যাওয়া এবং সর্ব্বধ্বংসী বিপ্লবের সৃষ্টি করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। হয়তো মনুষ্য জাতিরই অধঃপতন ঘটিয়াছে;

হয়তো সভ্যতার নামে বর্ব্বরতাই পৃথিবীকে গ্রাস করিতে চলিয়াছে। অগ্নি উজ্জ্বল বলিয়া কি তাহাতেই ঝাঁপ দিতে হইবে?

জাতিত্ব ব্যক্তিগত কিংবা বর্ণগত, ইহা অবশ্যই একটী সমস্যা। মানুষের চিত্তবৃত্তি তাহার জন্ম, তাহার পিতা-মাতা ও তাহার বংশানুক্রমিক সংস্কারের উপরে অনেকখানিই নির্ভর করে। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বর্ণগত জাতিত্বের সৃষ্টি। এক বংশের বা এক জাতির মধ্যে এক-আধ জন যখন বংশানুক্রমিক চিন্তাধারা ও কর্ম্মধারা না পাইয়া জন্ম হইতেই ভিন্ন মনোবৃত্তি পাইয়া বসে, পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী তাঁহাকে কিছুতেই অভিভূত করিতে পারে না, তখন তাহাকে স্ব-বর্ণের বা স্ব-সমাজের গণ্ডী-মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রয়াস ভালো কি মন্দ, তাহার ন্যায়-বিচারেও হিন্দুর ধর্ম্মানুশাসন অন্ধ ছিল না। ক্ষত্রিয় রাজার মনে যখন ব্রাহ্মণত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল, আগ্রহের আকুলতা পরীক্ষা করিয়া লইয়া সমাজ তাহার সে আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে দ্বিধা করে নাই। আর এক ক্ষত্রিয় রাজর্ষিকে আমরা এক সঙ্গে উপনিষদীয় তত্ত্বব্যাখ্যা, রাজ্য-পরিচালনা ও কৃষিকার্য্য করিতে দেখিয়াছি। বিশিষ্ট প্রতিভার স্থান সকল দেশের সকল সমাজেই উন্মুক্ত; আমাদের দেশেও ইহার ব্যতিরেক ঘটে নাই।

Rationality যাহাকে বলা হয়, সেই বস্তুটী আমাদের দেশে অপরিজ্ঞাত ছিল। এখানে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যষ্টির দাবীর চেয়ে সমষ্টির দাবীকে প্রশ্রয় দিত এবং সকলের সঙ্গে আপোষে সামঞ্জস্য-বিধান করিয়া চলিতে পারিত। চতুর্বর্ণ লইয়া যে সমাজ, তাহাই আমাদের দেশের আদর্শ। যখন চতুর্বর্ণের প্রত্যেকেই সমষ্টির ইষ্টানিষ্টের দিকে লক্ষ্য করিয়া আপনার কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইত, তখন তাঁহারা যে আপনা-দিগকে একই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করিত এবং সমষ্টির সাধারণ

স্বার্থবুদ্ধি বা জাতীয়তা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইত, তাহাতে সন্দেহ করিবার কি আছে ?

এই বর্ণাশ্রম-সঙ্গত যে সমাজ, তাহা যে নির্ব্বিঘ্নে চলিয়াছে এমন নহে। যুগে যুগে ইহার উপর দিয়া বিপ্লবের বন্যা বহিয়া গিয়াছে। চতুর্ব্বর্ণের উপরে ব্যক্তির বা ব্যক্তি-সমষ্টির বিতৃষ্ণা ঐ বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছে। ঐ বিপ্লব যে সব-সময়ে অনিষ্টের হেতু হইয়াছে, এমন নহে। যে ব্যক্তিগত বিতৃষ্ণার এই সকল বিপ্লব সম্ভাবিত করিয়া দিয়াছে, সেই বিতৃষ্ণার উদ্ভব হইয়াছে সমাজ-প্রভুত্ব দ্বারা ব্যষ্টির আত্মকর্ত্তৃত্ব-বিলোপে অথবা ব্যষ্টির প্রতিভা-বিকাশে বাধা প্রদানে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শাস্ত্র-নির্দ্দেশ সাধারণের জন্য, বিশিষ্ট প্রতিভার জন্য নয়—প্রতিভা আপনার পথ আপনি খুঁজিয়া লইয়াছে, সমস্ত সমাজে এক বিপ্লব ঘটাইয়াছে। কিন্তু বিপ্লব যত প্রবল শক্তিতেই প্রবাহিত হোক, সনাতন সমাজ তাহাতে বিচলিত হয় নাই; সকল বাধা অগ্রাহ্য করিয়া সকল বিদ্রোহ দমন করিয়া আপনার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়াছে।

আজিকার রাজনীতির বড় কথা Democracy বা সাধারণতন্ত্র ; তাহার চেয়েও আধুনিকতর রাষ্ট্রীয় প্রগতি সূচিত হইয়াছে Socialism বা সমাজতন্ত্রে। আমাদের দেশের বর্ণাশ্রমও এই সমাজতন্ত্র। তবে গঠন-প্রণালী স্বতন্ত্র। একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলেই ইহা হৃদয়ঙ্গম হইবে।

ছদ্ম-মহারাজ

স্থান ঃ—বড়বাজারের রাজসভা

সিংহাসনে শ্রীশ্রীছদ্ম-মহারাজ। দুই পাশে উপবিষ্ট উপরাজা ধামানন্দ এবং অমাত্য ছুছুন্দর

মহারাজ। ছুছুন্দর !
করেছিনু তোমারে স্মরণ
মন্ত্রগৃহ-সংগঠনে অমাত্য-বাছাই
হ'ল যবে নগরীর মাঝে,
ভেট লয়ে রীতিমত
হিন্দু-প্রতিনিধি বলি
দাগি দিনু কয়েক জনারে—
নিত্যবাছাধন মোর
গৈরিক-পতাকা লয়ে হাতে
দ্বারে দ্বারে পরিক্রমা কতই করিল !
আনন্দের হাটে তব করিতে প্রচার
নব্য-হিন্দুয়ানীদের এ ভোট-সমর,
দিয়াছিনু এত্তেলা তোমারে—
কিন্তু পাই নাই !
কোথা ছিলে ছুছুন্দর বীর,
নব্য-হিন্দুয়ানী ভক্ত—
তরুণ কুমার জর্ণালিষ্ট ?

ছুছুন্দর। হায় প্রভু !
শুনেছিনু আদেশ তোমার—
কিন্তু আমি ভাগ্যহীন,
না পারিনু পালিতে আদেশ।
জানি, আজি আনন্দের হাটে
গৌরাঙ্গ-সেবক মজুন্দার
দেয় মোরে প্রতি মাসে যেই কাণাকড়ি
তাহাতে পোষায় নাকো পাণীয়-খরচ,
অর্থাভাবে নারীর ভিজিট
জোগাইতে নাহি পারি শিকার খুঁজিয়া
ফিরি নৈশ অন্ধকারে যেথানে সেথানে
বালক-বালিকা কিছু না করিয়া ভেদ !
হিন্দুয়ানী করিয়া প্রচার,
গৌরীদানে 'খুকী-বলি' করিয়া ভৎ সনা,
করি লম্বা স্তব-স্তুতি তোমা মহারাজ—
রাজদ্বারে পাই কিছু কিছু।
তাই রাজা,
এ যাত্রায় নিমক-হারামী
করিতে মরেছি কত ঘৃণায় লজ্জায়—
সে সকল বুঝাইব তোমারে কেমনে ?

মহারাজ। আর বুঝাইবে !
কথায় ভিজে না চিড়া—
কার্য্যকালে না পাইনু খুঁজিয়া তোমারে !
যজ্ঞ পণ্ড হ'ল—

বকাণ্ড কয়টী অনুচর,
লণ্ড-ভণ্ড করিল সকল !
তুমি রৈলে চম্পট মারিয়া
চির-নিকেতন তব মেছোহাটা মাঝে !
এ হেন দুর্ব্বুদ্ধি হ'ল কেন ?

ছুছুন্দর। গান্ধী-ভক্তি করিয়া বিক্রয়
অসহযোগের মিথ্যা বুলি কপচাইয়া
অল্প-স্বল্প পায় যাহা কিছু
তাহা দিয়া চলে ব্যয় আনন্দ-হাটের।
ভোটযুদ্ধে মহারাজে হইলে সহায়,
আনন্দের ঠাঁট তার
যাইত ভাঙ্গিয়া এতদিনে।

মহারাজ। কত জোটে আনন্দের হাটে
গান্ধী ভক্তি করি ফিরি ?
তার বেশী আমিই কি পকেট হইতে
নাহি পারিতাম দিতে ?
ছিল যবে দুর্দ্দিন তাহার
আনন্দের ঠাঁট আমি নিজে জোগায়েছি।
গুঁফো আর ভুঁড়ো বৈষ্ণবীর
পেটে হাত দিয়া দেখ,
ফোক্‌লা বৈষ্ণবীর দেখ টাকে হাত দিয়া,
মোর দেওয়া দানা সেথা গিস্ গিস্ করে ?
আরো কিছু জোগাইতে পারিতাম না কি ?

ছুছুন্দর। গুঁফো আর ভুঁড়ো বৈষ্ণবীর

মনে প্রভু আতঙ্ক বিষম——
তব ট্যাক বন্ধ বলি মিশন উদ্বাস্ত,
মিথ্যানন্দ যেথা সেথা ফিরে অসহায় !
একান্ত নির্ভর যদি হয় তোমা পরে
পাছে তার সেইরূপ অবস্থা বিষম
ঘটে অকস্মাৎ—
হয় কাৎ একদিনে আনন্দের হাট
গৌরাঙ্গ-শ্রীপাট—
তাই তারা অতি সাবধান ।
কি করিব প্রভু আমি উঞ্ছবৃত্তি ধারী
মরমে মরিয়া শেষে হাত গুটাইয়া
রহিলাম গৃহকোণে বসি !

মহারাজ । তুমি তো রহিলে গৃহকোণে !
এদিকে যে মোরে দিল শাল
দত্ত ও বড়াল
পাল আর মুখুয্যে করিয়া বধ !
নব্য-হিন্দু মার্কাধারীগণ
ভোটযুদ্ধে হ'য়ে পরাজিত
মার্কা ক্রয় তঙ্কা তারা ফিরিয়া চাইছে ।
ছুছুন্দর ! অপদার্থ—অপদার্থ তুমি !

ছুছুন্দর । গৌরীদান বন্ধ আন্দোলনে
হয়েছিনু সহায় একদা,
নারীর বিত্তাধিকার আসিছে আবার,
তখনো সহায় হব আমি !

দীন-সেবকের কাছে বহু উপকার
এখনো পাবেন মহারাজ ।
মঠ-অনাচার কথা করিতে নির্দ্দেশ
সুকৌশল আমার লেখনী
রহে স্তব্ধ তব নারীযজ্ঞ কালে শুধু ।
নারীযজ্ঞ লয়ে কত কুৎসা চতুর্দ্দিকে,
খিস্তিতে নিপুণ আমি
বসে বসে শুনি সে সকল ।
যদি মহারাজ
মুখ বন্ধ না করেন মোর—
নীরবে শুনিব নাকো
খিস্তি কিছু ছাড়িব কাগজে ।

মহারাজ । ছুছুন্দর, ভালোবাসি তোমা—
এই কি তাহার পরিচয় ?
সত্যই কি আমি
হ'তে পারি বিরূপ তোমার পরে ?
কোন ভয় নাই তব,
allowance পাবে রীতিমত
মাস অন্তে ঘরে বসি গণিয়া গণিয়া ।
আসিছে ত্বরায়
নারীর বিত্তাধিকার আইন—
সমর্থন কর গিয়া তায় ।
নব্য-হিন্দুয়ানী মতে
শ্যালক কুটুম্ব-শ্রেষ্ঠ সহোদর হতে,

সে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হোক
নবগত এই আইনে।
যাও বৎস, চেষ্টা দেখ—
এই আইন হয় যাতে পাশ,
ট্যাক পূর্ণ করি দিব সময় হইলে।

(ছুছুন্দরের প্রস্থান)

ধামানন্দ। ছুছুন্দর হইল বিদায়,
এবার আমারে কহ প্রভু
কি আদেশ অধম জনার পরে ?

মহারাজ। গুরুকার্য্য তরে বৎস ডাকিয়াছি তোমা,
ছুছুন্দর সুমুখেতে
ব্যক্ত করিব না বলি
অগ্রে দিনু তাহারে বিদায়।
অন্তরঙ্গ তুমি আমাদের,
অন্তরের কথা তাই তোমারেই বলি।

ধামানন্দ। প্রভুর সে অনুগ্রহ !

মহারাজ। অনুগ্রহ নহে বৎস, তব যোগ্য ইহা—
তব সম শক্তিধর
হিন্দুদ্বেষী নাহি কেহ বেন্মদৈত্য মাঝে,
হিন্দু বলি পরিচয় দিয়া
সর্ব্বনাশ করিতে হিন্দুর
তোমা সম একজনও
নাহি দেখি এই বাঙলায়।
শোন বৎস গোপন কাহিনী।

জান তুমি মোর নারী-আশ্রমের কথা—
সেথা বহু নারী আছে
রূপে ও যৌবনে ধনী তারা,
বিবাহের ছল করি
পাঠাইয়া দিয়া তাহাদের
পাঞ্জাবে ও সুদূর সিন্ধুতে,
অর্থ উপার্জ্জন মোর হয় সুপ্রচুর।
বাদী তায় দেশের সমাজ
বলে তারা বাঙালী হিন্দুর
কন্যারে পাঠাই কেন সুদূর সিন্ধুতে,
চায় কৈফিয়ৎ মোর কাছে।
তুমি বৎস দিব্যজ্ঞান করিয়াছ লাভ
ব্রহ্মের প্রসাদে——
সিন্ধু আর বাংলা তব কাছে
কিছু মাত্র ভেদাভেদ নাই।
তুমি যদি আন্তর্জ্জাতিক
বিবাহের ঘোর আন্দোলন
তুলিবারে পার তব ত্রিপল কাগজে,
মম কার্য্য সমাধায়
সাহায্য হইবে যৎকিঞ্চিৎ—
কর্ম্মান্তে দক্ষিণা পাবে মোটা।
বল, রাজি ?

ধামানন্দ। রাজি কিবা ?
বাজি ধরিবারে যদি বল,

তাও পারি আজি আমি।
টাকা—টাকা—টাকা মাত্র সার—
এ নীতি আমার!
টাক যত বেড়ে ওঠে টাকা খেই বাড়ে।
তব কার্য্য—সে তো নহে মোর
অগৌরব-জনক কিছুই।
সমাজ-সংস্কার বলি
ব্যাখ্যা তায় সকলে করিবে
মোরে খ্যাতি দিবে,
পূজা হবে মোর লোক লোকে।
মহারাজ! আদেশ তোমার
বহুমানে লইলাম শির পাতি।

বঙ্গমাতার বঙ্গ-পরিক্রমা

বঙ্গমাতা তাঁহার সখী গুর্জ্জরমাতার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। সমুদ্রমেখলা গুর্জ্জরমাতা তখন দাঁতে মিশি ঘসিতেছিলেন, বঙ্গমাতাকে দেখিয়া কুন্দদন্ত অধরোষ্ঠের মধ্য হইতে অঙ্গুলি নামাইয়া আগ্রহব্যাকুল কণ্ঠে কহিলেন, এই যে সই! তারপর কি মনে করে?

বঙ্গমাতা বলিলেন, শুনলুম ভাই তোর ছেলেরা তোর পায়ের শিকল ভাঙ্‌বার জন্যে কি একটা শুভায়োজন করছে, তাই দেখতে এলুম।

গুর্জ্জরমাতা হাসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ—হ্যাঁ করছে বটে। জানিস্ তো ভাই, আমার টেকো ছেলেটা চিরদিনই একটু দুর্দ্দান্ত। একে তো

চরকা নিয়ে বারোমাস 'ঘ্যানোর' 'ঘ্যানোর' করে বছরে একটী দিন আমায় নাক ডেকে ঘুমোতে দেয় না। তার ওপরে এই নয়া ফ্যাসাদ। বাছার আমার ছাগলের দুধ খেয়ে বুদ্ধি খুলে গেছে; জানে, ইংরেজ জাতটা নেমকহারাম নয়। হক্-না-হক্ জোর করে ওকে খানিকটা নূন খাইয়ে দিতে পারলেই ও আমাদের গুণ গাইবে, তাই নূন নিয়েই উঠে পড়ে লেগে গেছে।

বঙ্গমাতা কহিলেন, ছেলেটার মাথায় একটু ছিট আছে। তবু আমার ভাই ওকে ভালো লাগে। আমারো একটী পাগ্‌লা ছেলে ছিল ভাই; কিন্তু ভগবান্ তাকে কেড়ে নিলেন।

গুর্জ্জরমাতা জিজ্ঞাসিলেন, কেন? এখন যারা আছে?

রাম! রাম! তারা আবার মানুষ? আপনাদের মধ্যে কামড়া-কামড়ি মারা-মারি করে ফিরছে! জীবনে ঘেন্না ধরে গেছে বোন্!

গুর্জ্জর মাতা কহিলেন, তাইতো! তা তাদের একটু বলে কয়ে দেখনা ভাই—কিছু করে কিনা।

বঙ্গমাতা নিরাশার ভাবে বলিলেন, আর বল্‌বো! বলাবলির ঠাঁই আর রেখেছে তারা? কর্পোরেসানী মধুচক্র নিয়ে কি কাণ্ডই না বাধিয়েছে! একটা তো মেওয়া—তার পেছনে ধাওয়া কর্‌তে গিয়ে কেউ পড়েছে উপুর হয়ে—কেউ পড়েছে হোঁচট খেয়ে! নাকানি চুবোনি খেয়েও ছাড়ছে না!

দুই সখীতে আরো কিছু কথাবার্ত্তা হইল। তারপর ম্লান মুখখানি ঘোমটা ঢাকিয়া লইয়া, র‍্যাপারখানি পিঠের নীচে আরো খানিকটা টানিয়া দিয়া বঙ্গমাতা উঠিয়া পড়িলেন।

(২)

বেলা সাড়ে নয়টা।

বলাই আসিয়া দুই তিনবার ডাকাডাকি করিয়া গিয়াছে, তাই ওয়েলিংটনের মহাপ্রভু গা-মোড়া দিয়া বিছানার ওপরে উঠিয়া বসিয়াছেন। ভৃত্য আসিয়া কখন তামাক সাজিয়া দিয়াছে—পুরানো চিমসে রঙের গড়গড়াটা—বাপ্‌দাদার আমলের বাড়ীখানিরই মতো জরাজীর্ণ। হোক্, নলটা তো নতুন—আর ফ্যান্সীও বটে। নলেই ঠাট্ বজায় থাকে, গড়গড়া যেমনই হোক্ না। ওটা যুগধর্ম্ম!

বলাই আবার আসিল।

মামা, বাইরের ঘরে একজন স্ত্রীলোক বসে আছেন, আপনার সাক্ষাৎ চান।

এক মুখ ধোঁয়ায় ঘর ভরিয়া দিয়া মহাপ্রভু কহিলেন, স্ত্রীলোক!

বলাই কহিল হাঁ মামা, স্ত্রীলোকই বটে। বয়স হয়েছে, কিন্তু চেহারা ফেরেনি। সাজসজ্জার বালাই নেই। দেখে মনে হচ্ছে, ইতর নয়—নেহাৎ অবস্থায় ফেরে পড়েই হয় তো আপনার কাছে এসেছে।

কিন্তু—ইয়ে তুইতো সব জানিস্ বলাই, আমার তো সাহায্য কর্‌বার সময় নেই। চেক্ বইএর শেষ পাতাটা পর্য্যন্ত ফুরিয়ে গেছে—একাউন্ট ক্লোজ্‌ড্ আপ্। এ দিকে সংসারও প্রায়...

থাক্ মামা, থাক্। তোমার মুখে ও সব শুন্‌লে আমরা মনে বড় ব্যাথা পাই। তা ওঁকে ফিরিয়েই দেই?

মহাপ্রভুর মহাপত্নী পাশের ঘরে ছিলেন। তিনি কাংস্য কণ্ঠে জিজ্ঞাসিলেন, কাকে ফিরিয়ে দেবে বলাই?—বলিতে বলিতে প্রভুজায়া ঘরে ঢুকিলেন। বলাই কহিল, মামার সঙ্গে একটী স্ত্রীলোক দেখা করতে এসেছেন মামী মা, তাঁকে।

মহাপ্রভু পত্নীর আঁচলের চাবিটীরই সামিল; সন্দেহ করিবার কিছু ছিল না। তাই প্রভু বলিলেন, স্ত্রীলোক? কষ্ট করে এসেছেন হয়তো! ফিরিয়ে দেবে কেন বাবা, নিয়েই এস না। মহাপ্রভু পত্নীর পানে চাহিয়া বলিলেন, কিছু চাইতে এসেছে হয়তো গিন্নি।

চাইতেই যদি বা এসে থাকে, তা হ'লেও কি ফিরিয়ে দেওয়া যায়? আমার হাতে যা কিছু আছে, তা থেকে কিছু দেওয়া যাবে 'খন। যাও বলাই, নিয়ে এস বাবা।

বলাই চলিয়া যাইতেছিল, মহাপ্রভু ডাকিলে সে ফিরিল। প্রভু কহিলেন, বর্ম্মা অয়েল কোম্পানীর বিল-সরকারও বুঝি বসে আছে বলাই? বলেছিস্ তো, আমি বাড়ী নেই? তা স্ত্রীলোকটীকে গিয়ে বল্‌বি যে, গিন্নি মা ডাকছেন। দাসী চাকরের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে; গিন্নির এখন বারো রকমের কাজ। তিনি কাজে চলিয়া গেলেন।

বলাইয়ের পেছনে বঙ্গমাতার প্রবেশ। বলাইয়ের প্রস্থান।

বঙ্গমাতা। বাবা!

প্রভু। মা—

বঙ্গমাতা। আমায় চিনেছো বাবা?

প্র। না মা, চিন্‌তে পার্‌লুম না তো।

ব। আমি বঙ্গমাতা। এক সময়ে আমায় চিনেছিলে; তারপরে যখন জেলে যাওয়ার পালা সুরু হ'ল, তখন ভুলে গেলে। ভুলে কাশী রওয়ানা হলে, সঙ্গে নিয়ে গেলে আমার বোন্‌পো তিলকের হিসাবের কিছু টাকা।

প্র। সে পাপ তো কাশীবাসের পুণ্যেই ক্ষালন করেছি মা—

ব। পাপ-পুণ্যের বিচার কর্‌তে আমি আসিনি বাবা, আমি এসেছি তোমায় একটী প্রশ্ন জিজ্ঞেস কর্‌তে। ভোল্ বদ্‌লে তুমি

আবার স্বদেশীওয়ালা সেজেছো। দেশভক্তির পণ্যে কর্পোরেসনের মেওয়া কিন্‌বার জন্যে আদাজল খেয়ে লেগে গেছো! সত্য-সত্য দেশভক্তি কি তোমার আছে বাবা?

প্র। পরীক্ষা কর্‌তে চাও মা?

ব। হাঁ, চাই। গুর্জ্জর-বোনের কাছে গেছ্‌লাম। তার চরকা-পাগল টেকো ছেলেটার কথা শুনে মনে স্ফুর্ত্তি হয়। মায়ের পায়ের শেকল ভাঙ্‌বার জন্যে সে লবণ-সমুদ্রে পাড়ি দিচ্ছে। তুমি আমার জন্যে ঐ রকম কিছু কর বাবা।

প্র। আমি?

ব। তুমিই বাবা। আমার দস্যি-খোকা জেলে যাওয়ার পরে তুমিই তো আপনাকে তার স্থলাভিষিক্ত বলে জাহির করেছো, 'নাশানাল মিলিশিয়া'র জন্য আবেদনপত্র ছাপিয়েছো—আমার সেবার সার্টিফিকেটে মেওয়া লুফ্‌বার ফিকিরে ঘুর্‌ছো। তুমি ছাড়া আর কার কাছে যাব বাবা?

প্রভুর চক্ষু চড়ক গাছ! হাত হইতে আলবোলার নল খসিয়া গেল; স্খলিত কাপড়ের খুঁট কোমরে জড়াইতে জড়াইতে মুক্ত-কচ্ছটিকা প্রভু কক্ষ হইতে নিক্রান্ত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—হরে! বাথ্‌রুমে জল দিয়ে যা, একখানা সাবানও আনিস্‌রে, আর আমার একখানা কাপড়।

বঙ্গমাতা অগত্যা উঠিয়া পড়িলেন। বলাই ততক্ষণে বাহিরের জুতার দোকানে ভাড়ার তাগাদায় গিয়াছে; মোটরকারখানি সংস্কারের অভাবে অব্যবহার্য্য হইয়া রহিয়াছে, কাঁহাতক আর ইহুদী-ব্যবসায়ীর মোটরের ভাড়া জোগানো যায়? মহাপ্রভু তো আর ট্যাক্সী চাপিতে পারেন না—বড়মানুষির ভাওতায় যে তাঁকে মেওয়া জিনিতে হইবে।

(৩)

ধর্ম্মতলায় যেখানে জে, এফ্‌ ম্যাডানের আফিস, তাহার কিছু এদিকে একটা বাড়ী। বাড়ীটা এক কুমার ডাগ্‌দারের। বঙ্গমাতা ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট আর ধর্ম্মতলার জংসনে ট্রাম হইতে নামিয়া কিছু পিছু হটিয়া বাড়ীটার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। দরওয়ান তখন চট্‌পট্‌ শব্দে অঙ্গে তৈল-মর্দ্দন করিতেছে। এ বাড়ীর দরওয়ান সে, আওরৎ-লোকের কদর বুঝে। তৈল-মর্দ্দন বন্ধ রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কাহা মাংতা মায়ী?

হিন্দি ভাষাটাকে সার্ব্বজনীন করিয়া তুলিবার আয়োজন হইয়াছে; তাই বঙ্গমাতা একখানি "সহজ হিন্দী শিক্ষা" কিনিয়া ভাষাটা শিখিতেছেন। ভাঙা হিন্দীতে উত্তর করিলেন, সাহেব্‌কা সাথ্‌ মোলাকাৎ কর্‌নে চাহিয়ে।

দরওয়ান একটুক্‌রা কাগজ-পেন্সিল বঙ্গমাতার হাতে দিলে মাতা শুধু লিখিলেন—'বঙ্গমাতা'। কাগজ লইয়া দরওয়ান্‌ উপরে উঠিল। খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া মাতার হস্তে নোট্‌ দিল—'এ ভিজিট্‌—কর্‌ নট্‌ মোর্‌ দ্যান্‌ থ্রি মিনিট্‌স্‌'! আঁচলে চোখের কোণ্‌টা মুছিয়া লইয়া মাতা তাহার সঙ্গে সঙ্গে উপরে উঠিলেন। ডাগ্‌দার সাহেব তখন প্রাতরাশ শেষ করিয়া ইলেক্‌সন-বোর্ডের দৈনিক মিটিঙে হাজিরা দিবার জন্য গাড়ী জুতিবার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মাতাকে দেখিয়া নমস্কার করিয়া কহিলেন, হ্যালো মাদার, আই থিঙ্ক, ইউ আর অল্‌ রাইট্‌!

মা মুচ্‌কি হাসিলেন। বাছাধনরা যা হইয়া উঠিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অল্‌রাইট থাকা ছাড়া উপায় কি? সাহেব বলিলেন, কি মনে

করে মা? তিন-মিনিটের বেশী তো সময় নেই! তোমারই কাজে যেতে হবে—বুঝ্‌লে কি না?

মা বলিলেন, তোমাদের ইলেক্‌সনী কাজ কি করে আমার কাজ হয়, সে তর্ক এই তিন-মিনিটে নয়। কিন্তু বাবা লবণ-টবন নিয়ে কিছু—

ডাগ্‌দার বলিলেন, বাই জোভ! তুমি সিভিল ডিস্‌ওবিডিয়েন্সের কথা বল্‌ছো? সে তো মা সুভাষ ফিরে না এলে নয়। সতীন সেন কিছু কিছু বল্‌ছে বটে, আর কুমিল্লার আশ্রমওয়ালারাও সোর্‌গোল বাধাবার চেষ্টা কর্‌ছে সত্য, কিন্তু সুভাষ না এলে বাংলায় ওসব হবার জো নেই মা।

তোমরা?

আমরা? পাগল হয়েছো মা? আমি যদি ওসবে ভিড়ি, তাহ'লে রোগীর বোঝা কে নেয়? পিরীতের—গড্‌ সেভ্‌ মি—পীড়িতের সেবাও তো কম কাজ নয়, চৌষট্টি টাকা ভিজিটের মধ্যেও এতে 'গ্লোরি' আছে। যাঃ—সাড়ে তিন মিনিট হ'ল!—বলিতে বলিতে ডাগ্‌দার ছুটিয়া বাহির হইলেন! বঙ্গমাতা ঠায় বসিয়া ছিলেন। বাহিরে মোটর ষ্টার্টিং এর শব্দে তাঁহার চমক ভাঙিল। তিনি কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

(৪)

উড্‌বর্ণ পার্কের কাছে সাহেবী ধরণের বাড়ীটী। রিক্সা হইতে নামিয়া বাড়ীতে ঢুকিবার পথে দরোয়ান বাধা দিল। কার্ড পাঠাইয়া অতিকষ্টে ব্যারিষ্টার বোসের সঙ্গে দেখা। সাহেব তখন সোফায় বসিয়া মেয়রীর স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। বঙ্গমাতার মুখে তাঁহার অভিপ্রায় শুনিয়া বলিলেন—তুমি ঠিক যায়গায় আস নি মা। ফরওয়ার্ডকে বৈকুণ্ঠধামে পাঠিয়ে আমরা যে

লিবার্টি প্রিচ্‌ কর্‌ছি, সে লিবার্টি তোমার পায়ের শেকল খসাবার জন্যে নয়—আমাদের ঠাঁট বজায় রাখিবার জন্যে। সুভাষ জেলের বাইরে থাক্‌লে দু'একবার ঢুঁ মেরে দেখতে চাইতো বটে; তা এ সময়ে তার জেল হওয়ায় আমরা সে বিষয়ে নিশ্চিন্তি হয়েছি। লবণ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি কর্‌লে মুজাকালুর মতো দু'একটী সুটিং কেশও তো হ'তে পার্‌তো মা! বুঝ্‌লে কিনা—তার চেয়ে জেলের ছাদে ন্যাশনাল ফ্লাগ হয়েষ্ট করা আর জেলের মধ্যে মা সরস্বতীর পূজো দেওয়া অনেক ভালো। তুমি প্রভু আর ডাগ্‌দারের কাছ থেকে ফিরে এসেছো? তা আস্‌বেই তো! ন'লের কাছে? তার দেখা কি পাবে মা? সে তার অবিদ্যার কাছে থেকে এসেই ছোটে আফিসে। তোমার কথা শুন্‌বার ফুরসুৎই তার হবে না। তার চেয়ে একটা কাজ কর মা! আরাণকোলো জাহাজ থেকে চট্টল সদ্যঃ নেমে এসেছে। দেশের কাজে তারাই তো আজকাল এড্‌ভান্স কর্‌ছে। তার কাছে একবার যাও।

বঙ্গমাতা উঠিলেন। তিনি কক্ষের বাহিরে গেলে পার্শ্বস্থিত খিদিরপুরী বোসকে লক্ষ্য করিয়া ব্যারিষ্টার কহিলেন, আবদার ছাখো! ইলেক্‌সনের ঝামেলাই মিটিয়ে উঠতে পারিনে, এর মধ্যে ওর জন্যে নূনের লড়াই কর!

(৫)

এল্‌গিন রোডে চট্টলেশ্বরের আবাস। গুপ্ত সাহেব আসিয়া ঘন ঘন পরামর্শ লইতেছেন; হেয়ার ষ্ট্রীট হইতে চক্রবর্ত্তী আসিতেছেন 'নোট' লইতে। বৌবাজার হইতে মিত্র আসিতেছেন ভোট ক্যাম্পেইনের খবর জানাইতে। চট্টলেশ্বর ব্যস্ত কত! এই ব্যস্ততার মধ্যেও চট্টলেশ্বর যখন শুনিলেন, বঙ্গমাতা আসিয়া 'ভিজিট কার্ড' পাঠাইয়াছেন—সকল কাজ ছাড়িয়া মাতাকে অভ্যর্থনা করিতে ছুটিলেন। চট্টলেশ্বরীকে লইয়া

পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া সম্পূর্ণ স্বদেশী-প্রথায় মাতার চরণ বন্দনা করিলেন। ভাব দেখিয়া মাতার মনে আশার সঞ্চার হইল। স্নেহ-সম্ভাষণ করিয়া চট্টলেশ্বরকে মনের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। বিষণ্ণ মুখে চট্টলেশ্বর কহিলেন, তাই তো মা, বড্ড অসময়ে এসেছো। আর যদি দু'দিন পরে আসতে, তাহলেই দেখতে, আমি ঠিক ট্যাক্স বন্ধ আরম্ভ করে দিয়েছি।

মা শুধাইলেন, কিন্তু এখন ?

এখন যে আমি বড্ড ব্যস্ত মা। বার্ম্মা থেকে জাহাজ এসেছে আমায় নিয়ে যেতে। এবারে সরকারী অতিথিশালার নিমন্ত্রণ। ফিরে এসেই আমি চাটগাঁয়ের সমুদ্র-কুলে নুন তৈরী কর্‌তে ছুট্‌বো।

বঙ্গমাতা কহিলেন, বাধিত হইলাম বৎস।

(৬)

বঙ্গোপসাগরের কুলে বঙ্গমাতা ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। সাগরের উত্তাল তরঙ্গ দেখিয়া জীবনে বিতৃষ্ণ তাঁহার লোভ হইতেছিল ঐ তরঙ্গ-মধ্যে ডুবিয়া মরিতে। বাংলাদেশে দড়ি ও কলসী নাকি দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে ; সমুদ্রের জলে নাকি তাহার আবশ্যক করে না।

জয়ডঙ্কা

নব হিন্দুয়ানীর বিজয়ডঙ্কা তুমুল মন্দ্রে
বাজিছে ঐ
তোরা ওঠ্ সবে ওঠ্ চল্ সবে চল্ সময় তো আর
নাহিরে সই।
ওরে ঈশানের হাতে ডম্বরু বাজে হরের মুখের
বাজে বিষাণ
যত ভদ্দরজন লাজে পলায়ন ত্রাসে ছুটে আসে
যত কৃষাণ!
ওরে পরগাছা সম ভবঘুরে যত সমাজের যারা
দাড়ি ও গোঁফ,
আজ তারাই সাজিছে নবযুগে Priest, প্রোটেষ্ট্যাণ্টের
তারাই পোপ!

(২)

শোন 'রিফর্ম্ম' 'রিফর্ম্ম' ধ্বনি হরদম্ বিদারি' গগণ
নাদিত আজ
ওরে রি ফর্ম্মের তরে 'গেরো'ধারী যত সন্ন্যাসী দল
করিছে সাজ।
আর মিশে তার সাথে ধনী মহাজন অবলা-বিকানো
পেশাটী যার,
দেখ নবদ্বীপ হ'তে বিধবায় কিনি সিন্ধু—কেরলে
করিছে পার।

হায় সুদে নারী খাটে অবলা-ভাণ্ডারে রক্ষা ফিকিরে
ঘুচায় ভুখা।
তারা রিফর্ম্মের নামে বড় পিঁড়ি পায়, সমাজে তাদেরই
মিলিছে হুকা!

(৩)

হোথা আর দেখ মিশে তার সাথে আসি তরুণ কুমার
জর্ণালিষ্ট—
ওগো রিফর্ম্মের সে যে ঘন ক্ষীরটুকু নব-moral এর
সে যেগো Jist.
সে যে তাহারি ভাষায় কাঠ-রিফর্ম্মার ধর্ম্ম-উপদল
গঠন করে—
দেখ নব-তন্ত্র তার নব-বিস্তাধরী দুই কূলে হিন্দু
তাতেই সরে!
আজি যাহা কিছু আছে সবি ভাঙিবার বিধান সে দেয়
কাগজে লিখি,
যত উপচীয়মান তরুণের দল সে অপ-বিধানে
লইল শিখি।

(৪)

আসি জুটে তার সাথে লম্পট দল মিত্রের বেশে
দেশে অরি—
ছিঃ ছিঃ কায়েত হইয়া পত্নী বানায় ব্রাহ্মণ-দার
হরণ করি।

ওরে কোথা গিরিরাজ কোথা হর আজ কার উমা দেখ
কাহার ঘরে!
দেখ লোকজন মাঝে সধবার সাজে ডবল সিঁদুরে
বিহার করে।
আজ তারি লম্পট রসিক নাগর রিফর্ম্ম আইনে
পাণ্ডা হয়—
ওরে পোড়া দেশে হেন কোংকা কি নাই পাষণ্ড যায়
ঠাণ্ডা রয়?

(৫)

যত ভূত-প্রেত দল মিলিছে সকল বেহ্ম দৈত্য
তাহার সাথ—
সেই দৈত্য-চরণে বিনয়-বচনে হইলা সকলে
নিমেষে কাৎ।
দেখ দেবের ঘরের দানব নায়ক থাল কাটি আনে
গাঙ-কুমীর
শেষে একদিন তারে পস্তাতে হবে এ কথা সে মনে
জানেনা স্থির!
ওরে দৈত্যের তালে দেব নাচে আজ সকল গর্ব্ব
আজিকে শেষ—
গিয়া রিফর্ম্ম-সায়রে সিনান করিতে ডুবিল সে, নাই
সন্দ লেশ!

(৬)

আজি ভূত প্রেত সাথে প্রমথও নাচে তাধিন তাধিন
ধাধিন্ ধিন্—
চীফ্ Popularityর মহাবারিধির তরঙ্গে দোলে
নাচিছে ক্ষীণ!
দেখ মহামহো তার মহিমা ভুলিয়া গড্ডলিকায়
ভাসিল ঐ
যত রুই-কাৎলার এই দশা যদি চুনো পুঁটি কথা
কাহারে কই?
তারে কে বলেছে তার কান গেছে কাটা খুঁজে ফিরে তাই
চতুর্দ্দিক—
দেখ কান দুটী তার যদিও রয়েছে আপনার ঠাঁই
এখনো ঠিক!

(৭)

ওরে অতএব ভাই তোল সবে হাই রিফর্ম্মের তরে
বাহির হই—
ওর অবস্থা কাহিল সকলি বাতিল নূতন কিছুরে
বরিয়া লই।
তার সে নূতন কিছু কি হবে সে কথা কিছু নাহি বুঝি
পরিষ্কার—
শুধু এইটুকু বুঝি যা ছিল সকলি করিতে হইবে
বহিষ্কার!

কহ রিফর্ম্ম রিফর্ম্ম বুলি হরদম্ বুলি কপ্‌চাও
মালাটা জপ
আর যদি পার সবে বিপুল গরবে ধরমে আইনের
দুয়ারে সপ।'

সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্

প্রবাসী-পর্য্যায়ের মোহিতলাল মজুমদার কখনো কখনো 'সত্যসুন্দর দাস' এই নামে প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন। সত্য এবং সুন্দরের এই দাসটী কিরূপে সত্যসুন্দরের সেবা করেন, তাহাই আমরা এই প্রবন্ধে দেখাইব। এই মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ের স্বরূপ কেবল একটী নয়, কয়েকটী :—

(১) কবি মোহিতলাল মজুমদার,
(২) দার্শনিক তত্ত্ব-বিশ্লেষণকারী, সাহিত্যরসিক,
(৩) শনিবারের চিঠির বিজ্ঞ এবং পণ্ডিত প্রথম প্রবন্ধ লেখক,
(৪) অধ্যাপক মোহিতলাল মজুমদার।

কবি মোহিতলালের কবিতা কখনো সংস্কৃতবহুল শব্দের নীরস গাঁথুনীতে দায়ে-পড়া ছন্দের বাঁধুনীতে দেখা দেয়—ভাষার কঠোরতা ভাবের হত্যা করিয়া, কখনো বা জাফ্‌রাণী গাল আর ইরাণী ঠোঁটের—বুক-দাড়িম্বের ঝিলিক লইয়া ভাৎহীন কুৎসিৎ ইঙ্গিত জানাইয়া যায় মাত্র! তাঁহার কবিতার এই দুইটী মূর্ত্তির মধ্যেই কিন্তু একটী জিনিষ ফুটিয়া ওঠে; সে জিনিষটী শ্লীলতার আবরণে বা অনাবরণেই অশ্লীল ও অশিব বস্তুর অবতারণা।

মোহিতলাল সত্যসুন্দরের সাধনার ভাণ যতই করুন, তিনি যে স্পর্শ-রসিক এবং অকবি ছাড়া আর কিছুই ন'ন, তাহা তাঁহার কবিতার মধ্যদিয়া প্রকাশ। মোহিতলাল বলিয়াছেন—

অন্ধ আমি, দিশেদিশে গন্ধ তাই করে দিশাহারা
চিরদিন মধু করে মধুর বঞ্চনা!
করাঙ্গুলি ক্ষত হয়—হেরি না যে কাঁটার প্রহরা,
দৃষ্টিহীনে করে সবে বৃথাই গঞ্জনা!

স্পর্শ-রস না হয় কবিকে দিশাহারা করিয়াছে; কিন্তু কাঁটার পাহারা না থাকিলেই করাঙ্গুলি ক্ষত হইবে কেন। অঙ্গুলি বরং ক্ষত করে, ক্ষত হয় কি করিয়া?

তারপর—

অন্ধ আমি—জাগি তাই সারারাত পরশ-পিয়াসে
শয়ন-শিয়রে মোর জ্বলে না প্রদীপ,
হেরি নাই মুখ তার, বুক শুধু বাঁধি বাহুপাশে,
অঙ্গে অঙ্গে শিহরিয়া ফোটে লক্ষনীপ!

মুখটী দেখিবার পর্য্যন্ত প্রয়োজন নাই; বাহুপাশে বুক বাঁধিলেই চলিবে। এমন স্পষ্ট স্বীকারোক্তি আর দেখিনাই!

দুই দেহ-তটে সেকি দুরন্ত প্লাবন!

কবি মোহিতলাল! সত্যসুন্দরের সাধনা তোমার স্বার্থক। এই প্লাবনের মধ্যে দুরন্তপণাই তোমার বিশেষত্ব বটে। কারণ—

মিটাতে চাহি না তৃষা নিস্তরঙ্গ অমৃত-সরসে,
চাই মৃত্যু, চাই নব-জনম আশ্বাস!

"মন্দিরে মন্দিরে" কবি "পরশ-ভিখারী" হইয়া ফিরিতেছেন; একে তৃপ্ত না হইয়া বহুতে মজিয়াছেন কিন্তু দেবতারে স্পর্শ করিয়া প্রণাম করা

কেন? সে দিকে তো 'জুৎ' করিবার আশা বেশী নাই!

যে কথা আর কেহ লেখনীর মুখে ঢালিতে পারেন নাই, মোহিতলাল তাহাই ঢালিয়াছেন—

দেহ-দ্রুমে বিকশিল মনোজ-মন্দার!
শুক্তিগর্ভে সুদুর্লভ মুকুতা-সঞ্চার!

মুক্তা ঢালিবার জন্য আবার বাহু প্রসারণ; এবারে যে নিত্য হাহাকারই ঘটিবে তাহাতে সন্দেহ কি? আকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে; কিন্তু মুক্তা আসে কোথা হইতে? শুক্তিগর্ভ না হয় অনেক ধরিতে পারে; কিন্তু শক্তি কোথায়?

আবার দেখুন—

অক্ষর যৌবনা শ্যামা নৃত্যচক্রে যতি ভঙ্গহীন!
বিষ্ণু নাভি-পদ্মশায়ী স্রষ্টা-প্রজাপতি
তাঁরি আলিঙ্গনে বাঁধা বধূটী যুবতী!

অনঙ্গলীলার এ নৃত্যচক্রে পুরুষই যতিভঙ্গহীন বলিয়া জানিতাম—বিশেষতঃ স্পর্শ-রসিক মোহিতলালের ন্যায় পুরুষ। কিন্তু এখানে তাহার বিপরীত। তারপর—

'বিষ্ণুনাভি-পদ্মশায়ী স্রষ্টা-প্রজাপতি'! উপমাটা আর কিছুর সঙ্গে দেওয়া চলিত নাকি? একেবারে বিষ্ণুনাভি-পদ্ম আর স্রষ্টা প্রজাপতি। শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু!

কবি প্রশ্ন করিতেছেন—

'কক্ষে কক্ষে সবিস্ময়ে খুলিব কি ইন্দ্রিয়-দুয়ার'?

একেবারে কক্ষে কক্ষে ইন্দ্রিয়-দুয়ার খুলিয়া বেড়াইবেন? সেকি? শ্লীলতা-হানির মামলায় পড়িবেন যে! ওদিকে 'দেহ-পঞ্চবটী তলের' কথা। পঞ্চবটী তলটী কি? রাম! রাম! কবিতা রাজদ্রোহের ফ্যাসাদে

পড়ে জানি। গানও পড়ে য়াছি। কিন্তু অশ্লীলতার দায় হইতে কি কবিতা একেবারেই মুক্তি পাইবে? কবি নিজেই নিজের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন—

দেহ ভরি কর পান কবোষ্ণ এ প্রাণের মদিরা,
বৃলা মাখি' খুঁড়ি লও কামনার কাচমণি হীরা।
অন্ন খুটি লব মোরা কাঙালের মত,
ধরণীর স্তনযুগ করি দিব ক্ষত
নিঃশেষে শোষণে, ক্ষুধাতুর দশন-আঘাতে করিব জর্জ্জর
আমরা বর্ব্বর!

মড়ার বাড়া যেমন গাল নাই, তেমনি নিজেকে বর্ব্বর স্বীকার করিয়াছে যে, তাহারো আর কসুর লইতে নাই। আমরাও লইতাম না —যদি না এই 'বর্ব্বর'টীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে বসানো হইত।

কবি আর কবির প্রেয়সীকে স্রষ্টা সংযুক্ত-দেহ করিয়া গঠন করেন নাই, কবির এই আপ্‌শোষ। কিন্তু কবি এ আপ্‌শোষ মিটাইয়াছেন দুই দেহের মধ্যে সেতুর রচনা করিয়া—

দেহ হ'তে দেহান্তরে বাঁধিলাম কী সহজে
.....সেতুর বন্ধন।

সেতুটী কি স্থায়ী হইবে, না হাওড়ার পুলের ন্যায় ভাঙিয়া রাখা যাইবে? ইহার কাছে ভারতচন্দ্রের সেই—

সহিয়া সহিয়া সহলে সহলে।
পশিল ভ্রমর কমলের দলে॥

সেও যে রুচির গর্ব্ব করিতে পারে। যাহা হউক যাঁহার সহিত নিজের

সেতুর বন্ধনে বাঁধিয়াছেন, তাহার নগ্ন-মূর্ত্তির মহিমা বর্ণনা করিতেও কবি দ্বিধা করেন নাই—

তারপর যতবার হেরিয়াছি, সখি, তোর
নগ্ন তনু শুভ্র অশোচন,
মানব-কলঙ্ক-মসী, লোক-শিক্ষা সুকঠোর
অকাতরে করেছি মোচন।

'অশোচন' শব্দটী কিন্তু ভাল দেখায় না—কি একটা বিশ্রী কথা মনে করাইয়া দেয়; গা বমি বমি করে। এই 'অশোচন' তনুখানি যখন-তখন দেখিলে 'মানব কলঙ্ক-মসী' না হোক, 'মনুষ্যত্ব-মসী' যে দূর হইয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? আবার—

আমি চেয়ে থাকি অনিমিষ আঁখি মরণ-শয়নাগারে;
প্রলয় ঘটাই, তবু নিবে যাই মলয়ের ফুৎকারে!

কবি 'বাতি' শব্দটী স্থলে সুকৌশলে 'যাই' শব্দটী ব্যবহার করিয়া এবং শয়নাগারের পূর্ব্বে 'মরণ'কে অনাবশ্যকরূপে টানিয়া আনিয়া আসল উদ্দেশ্য গোপন করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছেন। যে প্রলয় মলয়ানীলকে সঙ্গে করিয়া আনে, সে প্রলয় যে আর কিছু হইতে পারে না, এ কথা যেন আমরা বুঝিতে পারি না!

কবি-প্রিয়ার বুকের বর্ণনাটা একটু শুনিবেন? অভিনবত্ব আছে—

উঠপাখী তার ডিম-জোড়া কি লুকিয়েছে ওই বুকে?
নাচতে গেলে গলার মালা দুই দিকে যায় ঠুকে।

কবি যেমন, কবির প্রিয়াও তেমনি। কবি খোঁজেন কায়া আর প্রিয়া ফেরেন ছায়ার পেছনে। আরশী লইয়া লুকোচুরি খেলেন—

রাতের বেলায় জ্বালিয়ে বাতি মুকুরে তার মুখ দেখে,
কাঁচলখানি খুলেই আবার মুচ্‌কি হেসে বুক ঢাকে!

কিন্তু কতক্ষণ ঢাকিয়া রাখিবে? যতক্ষণ না...যাক্—হাতের কাছে মোহিতলালের বিস্মরণী বইখানি ছিল; শেষের দু'টী মাত্র মুখস্ত ছিল। স্বপন-পশারী বইখানি কাছে থাকিলে সত্যসুন্দরের সত্য-সাধনার আরো অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিতাম! কিন্তু এবারে যেটুকু দেখাইলাম, তাহা হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, এ হেন একজন কবি-ভ্রাতা ঘরে থাকিলে তরুণী ভগ্নীর পক্ষে 'বাপের চাইতে ভাইকে ডরানো' ছাড়া উপায়ান্তর থাকে না।

ঘাস খেতে পথের ভুল

একটী বলীবর্দ্দ মাঠের মধ্যে চরিয়া বেড়াইতে ছিল। ঘাস খাইতে খাইতে হঠাৎ তাহার দৃষ্টি পড়িল এক নধর-দেহা, খর্ব্ব-শৃঙ্গা, উদ্‌ভিন্ন-যৌবনা গো-নন্দিনীর উপরে। স্বেচ্ছাভ্রমণশীল বলীবর্দ্দ আর উদ্‌ভিন্ন-যৌবনা গো-নন্দিনী! ফল যাহা হইবার তাহাই হইল, বলীবর্দ্দ ঘাস খাওয়া ছাড়িয়া গো-নন্দিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। বিষয়টা নিশ্চয়ই কাব্যের বস্তু। বলীবর্দ্দ লিখিতে জানে না; কিন্তু তদনুরূপ প্রকৃতি বিশিষ্ট মনুষ্যবর্দ্দ লিখিতে জানে—উক্ত ঘটনা লইয়া সহজেই একখানি কাব্য রচনা করিয়া বসিল। কাব্যখানি সম্প্রতি গঞ্জন-প্রকাশালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে; আমরা ডিম্ব লাইব্রেরী হইতে উহার এক খণ্ড নগদ মূল্যে খরিদও করিয়াছি। কাব্যরস-পিপাসু পাঠকগণের জন্য উহার কিছু স্যাম্পেল (স্যাম্পেন নহে) নীচে তুলিয়া দিলাম। পড়িয়া পাঠক পৌষমাসের "নিকাশী" কাগজের সঙালোচনার সহিত মিলাইয়া লইবেন—

পরিণয় সঙ্গীত

সহর পথে বাজ্‌ছে ভেরী
পাট করে নে বাঁকা টেরী,
"নিকাশী" যে নিকাশ করে
কান্তা-পীতা দুই তনয়া
কেরাণী ধায় অধীর হ'য়ে
সজ্‌নে সেও পুরুফ্‌ ফেলে
কেরাণী বীর মালা পেল
সজ্‌নে মরে আপ্‌শোষেতে

চল্ ওরে চল্ নাইকো দেরী
চল্‌রে ছুটে সবে
মহা মহোৎসবে।
সেই-সে ধামা-মন্দ-ঘরে
স্বয়ম্বরা হবে
ওরে স্বয়ম্বরা হবে।
মনের আশা মনে বয়ে
ছুট্‌ছে কলরবে
কি হবে, কে ক'বে?
পিয়ায় পেয়ে অধীর হ'ল
বৃথাই জনম তবে—
আমি বৃথা এনু ভবে।

প্রলয় ও সৃষ্টি

সন্ধ্যা বেলা যেও একবার
নদীর ঘাটে
সঙ্গে কারেও নিওনা যেন, একলা যেও
পল্লী-বাটে।
সত্যি যেন একলা যেও
কোরো না ভয়—
কেউ রবে না ওৎটী পেতে
কেহই নয়।

ঝুম্‌কো-লতা ঝুল্‌বে ধীরে
ঘাটের কাছে
দেখ্‌বে তারে কুমড়ো লতা
জড়িয়ে আছে !
তেম্‌নি যদি বাহুর পাশে
তোমায় ধরি,
গো-ভূত ভেবে আত্‌কে উঠে
যেওনা পড়ি।
ঝড় যদি বয়, ভূকম্প হয়
ভয় পেওনা—
প্রলয় শেষে সৃষ্টি আসে
তাও জানে না ?

লীলা

এক, দুই, তিন, চার, নাহি যায় গণা
তবু ভরিল না চিত্ত তার,
মাঘোৎসব গেল চলি, কতনা মিটানু
মিটিল না পিপাসা আমার।
পিতার প্রার্থনা-গৃহে ফি-রোজ হাজিরা দেই
রহি চোখ বুজি,
মনে ত্রাস, যত কচি সবুজের দল আসি
ফিরে গেল বুঝি।

সমাজেতে যত ভ্রাতা দেখিয়াছি একে একে
নিতুই নূতন,
ভগিনীর প্রেমে তারা খাইয়াছে হাবুডুবু
না যায় গণন !

গোবর সঙ্গীত

কথার উপরে কথা গেঁথে শুধু ছলনা করা
কে দোয়াবে গাই, গোবর কুঁড়িয়ে পুরিবে ঘড়া ?
হোথা একধারে জ্বালাইয়া বাতি
গোবর কুড়ায়ে কাটাও যে রাতি ?
সকাল হইতে ঘুঁটে দিতে দিতে হও যে সাড়া !

ঘুঁটে-কুড়ানি রাণী ছিল কার চোখের বিষ
সুয়ো তার পরে এক এক করে তুলিত রিষ !
রাজার নজর থাকে কত 'খন
কেই বা বল তা করিবে গণন ?
নিকাশী-নিকাশ করিতে দেয় সে হামেসা শীস্‌ !

ঘুঁটে-কুড়ানীর অধম সেযে গো সাজিল শেষ
মনের দুঃখে ধরিল খাদির বিষম বেশ !
গোবর-কুঁড়ায়ে ঘুটে দেওয়া আর
হা হন্ত ! আজ হ'লনা তাহার
গোবরখানিরে মগজে ভরিয়া ফিরিল দেশ !

কেন ?

ছিলাম আমি তোমার পেটে, তাই তুমি মা—
বল, কথা সত্য কি না ?
বাবার পেটে ছিলাম নাক' শুনেছি তা—
তবু ও কেন সে মোর বাবা ?
বল্ না মাগো, বল্ দেখি তা ।

চুপ্

চুপ্‌টী করিয়া থাক, আর কথা কহিও না আজ—
সকল কথার শেষ মিলনের পূর্ণানন্দ মাঝ।
অস্ফুট সঙ্গীত ধ্বনি তাই আজি শুনাও আমারে
কঙ্কণের রিণিঠিনি রবে ধর তাল সে ঝঙ্কারে।
উথলিত সিন্ধুবক্ষ ফেণায়িত ত্রিবেণী-সঙ্গম—
পূর্ণ কুম্ভ পড়ে থাক, হোক নবযুগ সমাগম।
এলায়িত কেন তনু ? নয়ন মুদিয়া কেন আসে ?
শিথিল কবরী বাঁধ, ফুলমালা থাক্ পড়ি পাশে।

চিহ্ন

এসেছিল স্বপ্ন-মাঝে পিয়া মোর—ভোরে
বাঁধিয়া লইনু বাহুডোরে,
তাহার পরশে মোর তনুখানি উঠিল শিহরি
কদম্ব-পরাগ চক্র পরি!

ঢলিয়া পড়িল মাথা স্পর্শে তার এ দেহ আকুল
কি করিল ভুল—
জেগে দেখি বঁধু নাই তারি চিহ্নখানি
শয্যায় রাখি গেছে ; স্বপ্ন ঘোরে কি হ'ল ? কি জানি !

ক্ষীর ও নীর

সতীত্ব বিনাশ-যজ্ঞ

কয়েক মাস পূর্ব্বে কালিয়া গ্রামে যশোহর-খুলনা যুব-সম্মিলনের বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। তখন সেই অধিবেশনে পঠিত বলিয়া 'সতীত্ব' নামে হলুদ কাগজে ছাপা একটি প্রবন্ধ বাহির হয়। লেখিকা বলিয়া অশ্রুমতী দেবী নাম্নী কোনও নারীর নাম তাহাতে ছিল ; ইহা লইয়া বেশ একটু হৈ চৈ তখন পড়িয়া গিয়াছিল। পরে শুনা যায়, এ প্রবন্ধ নারীর বেনামীতে কোন নরপুঙ্গবেরই লেখা ; আর সে অধিবেশনে এরূপ কোনও প্রবন্ধ পড়া ত হয়ই নাই, অনুমোদনের জন্য কর্ত্তৃপক্ষের হস্তগতও হইয়াছিল না। কেহ কেহ এই প্রবন্ধ সভায় বিতরণ করিতে গিয়াছিল ; তাহা লইয়া বরং একটা মারামারিই হয়।

যাহা হউক, যেই লিখিয়া থাক্, গোড়াতেই এইরূপ একটি কথা ছিল, 'আমি **এই নিষ্ঠুর একনিষ্ঠ সতীত্ব বিনাশ-যজ্ঞে ব্রতী**'।

এই লেখক বা লেখিকার খুব নিন্দা তখন হইয়াছিল। কিন্তু কেন যে এ নিন্দা তার হইল, বুঝি না। কারণ, জন কতক সেকেলে গোঁড়া বুড়াবুড়ী ছাড়া নারীর একনিষ্ঠ সতীত্বের বিনাশযজ্ঞে ব্রতী লেখক বা কবি আজকাল কে নয়, তাহা ত বড় দেখিতে পাই না।

স্বার্থপর পুরুষ সতীত্বের দোহাই দিয়া নারীকে জন্মের মত তার ভোগের দাসত্বে বাঁধিয়া রাখিয়াছে,—নারীর নারীত্ব বা মনুষ্যত্ব এই শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়া পঙ্গু হইয়া থাকে, স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারে না,—বিবাহের একটা মন্ত্র পড়িয়া কাহারও হাতে সঁপিয়া দিলেই প্রেম হয় না,—আর প্রেম যদি না হইল, তবে সেই বিবাহকর্ত্তার সঙ্গেই মাত্র আমরণ মিলিত হইয়া কোন নারী থাকিবে, বিবাহকর্ত্তরই বা বিবাহিতার উপরে এরূপ একটা দাবী কোন অধিকারে করিবে,—ইহার বড় অত্যাচার, আর এই অত্যাচারে, জীবনযাপনকরার চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কিছু হইতে পারে না, এইরূপ বাধ্যতামূলক সতীত্বের কু-নীতি, আর প্রেমাস্পদ যেই যখন হউক না, তাহার সহিত মিলনের অন্যায় বাধা অবিলম্বে দূর না হইলে মানবজীবন এ পৃথিবীতে বাস্তব কোনও সুখের অধিকারী হইবে না—স্বরাজলাভে দেশেরও উদ্ধার হইবে না,—এই সব রকম মন্তব্য স্পষ্ট কথায় কি অর্দ্ধস্পষ্ট ইঙ্গিতে ছাপার অক্ষরে বাহির হয় না,—এরূপ পত্রিকাই বা আজকাল কয়খানি দেখা যায়? নব্য কাব্য উপন্যাসের ত কথাই নাই যে বইগুলি যত এইরূপ অবাধ যৌন-সম্বন্ধের নগ্ন চিত্র—অঙ্কিত করিতে পারে, তত তাহার বাহবা পড়িয়া যায়, আর বাজারে তাহা বিকাইয়া যায় গরম এক এক কাপ চায়েরই মত!

ইহাদের সব বই পড়িলে গ্রাম্যনারীদের ভাষায় এই গালি মুখে আসে—হাঁরে হতভাগা মিন্সে! তোর কি মা-বোন নেই রে?

কিন্তু এই গালি দিয়াই বা কি হইবে? ইহারা মা-বোনও বিচার করে না। আমাদের দেশে সহোদর ভাইবোনে আর খুড়তুত, জ্যেঠতুত, মাসতুত, মামাত, পিসতুত ভাই-বোনে তফাৎ বড় কেহ করে না। সকলেই সকলের সমান দাদা, দিদি, ভাইটি, বোনটি। এই ভাই-বোনগুলা

True facts.

কি সব কাণ্ডই না নায়ক-নায়িকারূপে অবিরত ইহাদের সব গল্প-উপন্যাসে চলিতেছে। আবার আজ যাহাকে—মা বলিয়া ডাকিতেছে, কালই হইতেছে সে প্রণয়িনী! মা আর ছেলে কেউই বড় কম যায় না! ইহাই হইতেছে, এখানকার তরুণ সাহিত্য। তরুণ-তরুণীরা ত আছেই, শিক্ষিত উচ্চপদস্থ প্রবীণ একজন 'তরুণ' আবার ইহাদেরও ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন। ইঁহার এক নায়িকা—মা ডাকিয়াছে এমন একটা তরুণের সঙ্গে—যে তরুণ আবার মহাত্মার ডাকে দেশসেবায়ও আত্মদান করিয়াছিল—তার সঙ্গে দূর এক বিজন দেশে চলিয়া গেলেন সেখানে মা-ছেলে শেষে তারুণ্যের লীলায় দেহ উৎসর্গ করিলেন! তারপর একদিন এই নায়িকার স্বামীটা আসিল; বেচারা কিছু জানিত না। বেয়াকুবের মত স্ত্রীকে গিয়া চুম্বন করিল। স্ত্রী এই চুম্বনস্পর্শে আপনাকে অশুচি বোধ করিলেন! গৃহান্তরে গিয়া আচমন করতঃ—(বাহ্যাভ্যন্তর-শুচি কামনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণই কোন্ না করিয়াছিলেন?) জপের মালা হাতে লইয়া বীজমন্ত্র জপ করিতে বসিলেন!! (শান্তি, নরেশ চন্দ্র)।

ইহার উপরে আর কি বলিব? এরূপ অদ্ভুত একটা হাস্যরসের অবতারণা জগতের সাহিত্যে কোনও হাস্যরসিকই বোধহয় আর করিতে পারেন নাই!—হাস্যরসের জন্য একটা নোবেল প্রাইজ নাইকি? থাকিলে অবিসংবাদীরূপে তাহা ইঁহারই প্রাপ্য!

নূতন একখানি পত্রিকা আবার কিশোরকিশোরীদের মুগ্ধ করিবার জন্য বেণুর সুর তুলিয়াছে। এক সংখ্যায় দেখিলাম, এক তরুণ পথিক তাঁহার কিশোরী বান্ধবীদের (এখন আর ভাইবোন নাই, সব বন্ধু-বান্ধবী)—লক্ষ্য করিয়া কিছু সদুপদেশ দিতেছেন। গোড়াতেই সুর ধরিয়াছেন—"ওগো কিশোরী!"—তারপর বলিতেছেন শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ করা হইতেছে, কারণ, বিদ্যালয়ে

সীতা, সাবিত্রী, সতী প্রভৃতি নারীগুলার জীবনচরিত পড়ান হয়, আর এই সব পড়িয়া তাহারা সতী-ধর্ম্মের আদর্শ শেখে, স্বাধীন মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা হারায়। আর একস্থলে এই তরুণ বলিতেছেন, বাপ-দাদারাই তাঁহার এই কিশোরী বান্ধবীদের পরম শত্রু, কারণ, টাকা দিয়া তাঁহারা ইঁহাদের পাত্রস্থা করেন। প্রেমের টানে আসিয়া নিবে না, টাকা চায়, এমন সব পাত্রে 'স্থা' করিয়া যৎপরোনাস্তি অবমাননা বাপ দাদারা তাঁহার এই বান্ধবীদের নাকি করিতেছেন! এবং ইনি উপদেশ দিতেছেন, তোমরা বিদ্রোহ কর; বাপ-দাদারা পাত্র আনিয়া সভায় বসাইলেও বিবাহ করিও না।

কিন্তু কচি কচি কিশোরী বান্ধবীদের এই বিদ্রোহে উত্তেজিত না করিয়া অপেক্ষাকৃত পাকা দড় তরুণ বন্ধুদেরও এ কথাটা ইনি বলিতে পারিতেন, বিবাহে তোমরা পণ নিও না। বাপ-দাদারা নিতে চাহিলে বিদ্রোহ করিও। বিদ্রোহ তাহারা আজকাল অনেকেই করিয়া থাকে। বিদ্রোহই তারুণ্যের ধর্ম্ম বলিয়া উপদেশও অবিরত শুনিয়া থাকে। তাহাদের বিদ্রোহটা বাপ-দাদাদের বেশ সহিয়াও এখন যাইতেছে, কিন্তু তার ইঙ্গিতও কিছু করেন নাই (যদিও তরুণ বিদ্রোহের ডঙ্কা আর যেদিকে যত উচ্চরোলে বাজুক, এদিকে একেবারেই নীরব! রব ওঠে বরং উল্টা; বাপ-দাদাদের তবু কিছু সরম ভরম আছে, তরুণরা দাবী করিয়া বসেন একেবারে বিলাত যাইবার খরচা। না পাইলে চিরকৌমার্য্যের স্ফূর্ত্তিতেই তাঁহারা জীবন-যাপন করিতে চান)।

যাহা হউক ইহা বলিলে যেমন নূতন কিছু বলা ত হইত না। সাধারণ ভাবে নারী নয়, তরুণীও নয়, একেবারে কচি কচি সব কিশোরী! তাহাদেরই কাণে আর কাণের ভিতর দিয়া মরমে তরুণ এই বন্ধু-বিদ্রোহের ডাক 'পশাইতেছেন!'—একটা নূতন কিছু করার বাহাদুরী আর কাকে

বলে? ইহার উপরে আরও একটা বাহাদুরী কেহ হয়ত করিবেন, শিশুদের এই বলিয়া—"ওরে তোরা যে বাপ-দাদার কোলে উঠিস্, গলা ধরিয়া চুমা খাস, তার রসতত্ত্ব কেউ বুঝিস্? ফ্রয়েডের বই রূপকথার ভাষায় তর্জ্জমা করিয়া দিতেছি। ঠান্‌দিদিদের কাছে তাই আগে শোন।

আবার একজন উদীয়মান যশস্বী লেখক সুবিখ্যাত ও সর্ব্বত্র সমাদৃত এক পত্রিকায় ধীরগম্ভীর এক আলোচনাপ্রসঙ্গে লিখিতেছেন, যৌবনে যৌন সংযমের চেষ্টায় বয়স্থা কুমারী আর যুবতী বিধবাদের মধ্যে বহুবিধ স্নায়বিক রোগ দেখা দেয়, পরিমিত যৌন-সম্ভোগই ইহার একমাত্র প্রতিকারের উপায় বলিয়া ইনি নির্দ্দেশ করিতেছেন, এবং সেই উপায় অবলম্বন করিতে কুমারী ও বিধবাদের উপদেশ দিতেছেন! কিন্তু কি ভাবে এই উপায় তাহারা অবলম্বন করিবে? এমন কথা কোথাও বলেন নাই যে, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রথম যৌবনেই কুমারীদের এবং বাল-বিধবাদেরও বিবাহ হওয়া উচিত। বলিলে তবু বুঝিতাম বৈধ বা সুনীতিসঙ্গত একটা পথ তিনি দেখাইতেছেন। সুতরাং ইহার উপায় যে এই লেখকের মতে কি, তাহা আর খুলিয়া বলিবার দরকার কিছু নাই।

এই গেল 'তরুণ' সাহিত্যের ধারা। এ সাহিত্য একেবারে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে, হিন্দু ভারতের ধর্ম্মপ্রাণা, সতীত্বের আদর্শে জগদবরেণ্যা নারীকুলকে সতীত্বভ্রষ্ট না করিয়া ছাড়িবে না।

কেন? না—পাশ্চাত্য সমাজের আধুনিক একটা খেয়ালের নকলে তাহাদেরও মাথায় এই খেয়াল ঢুকিয়াছে, যৌন-লালসাই মানব চিত্তের একমাত্র বৃত্ত, যৌন সম্ভোগই একমাত্র সুখ, আর অবাধ এই সুখভোগেই মানবজীবনের পরম সিদ্ধি লাভ হয়।

মানবসমাজে সংসার স্থিতি বলিয়া একটা বস্তু আছে, মাতাপুত্র পিতাকন্যা ভাইভগ্নী গৃহস্থ গৃহিণী এইরূপ বহু সম্বন্ধে নরনারী পরম

আনন্দে মিলিয়া সেই স্থিতিকে রক্ষা করিতেছে, মানবসৃষ্টিও তাঁহার জীবনপ্রবাহকে মানব মহাধর্ম্মের মঙ্গলধারায় পরিচালিত করিতেছে, এ সব কথা ইহাদের মনেও কখনও হয় না। নারী মানবের মাতা, শৈশবের ধাত্রী, গৃহিণীরূপে গার্হস্থ্যধর্ম্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। মায়ের ছেলে হইয়াও নারীর এই মূর্ত্তি ইহাদের চক্ষে কখনও পড়ে নাই। এই মহাধর্ম্ম পালনের জন্য কি উপাদানে বিধাতা নারী হৃদয় গড়িয়াছেন, কি সব স্বর্গসুধাস্রাবী বৃত্তির বীজ সেই হৃদয়ে নিহিত করিয়াছেন, লক্ষ্য করিয়া দেখিবার ভাগ্য ইহাদের কখনও হয় নাই। আর পাশ্চাত্য সাহিত্যের অতি ন্যক্কারজনক কতকগুলি নোংড়ামোকেই বেদবাক্য বলিয়া ইহারা ধরিয়া নিয়াছে ; তাই মনে করে, যৌনবৃত্তির উপরে আর বৃত্তিই কিছু নারী-হৃদয়ে নাই, আর এই বৃত্তির রসবৈচিত্র্য কি বেদনাবৈচিত্র্য কে কত সরু তুলি টানিয়া দেখাইতে পারে, তার চেষ্টা করে আর যে যত তাই পারে, সাহিত্যগগনে জয়জয়কার তার তত উচ্চ তত ঘন রোলে ওঠে !

পাশ্চাত্য বহুবিধ বিষের হাওয়ার মত এই হাওয়াটাও আসিয়াছে, জোরে তার বিষ ছড়াইয়া সর্ব্বত্র বহিতেছে আরও কিছুকাল বহিবে। হাওয়ার সঙ্গে নাচিয়া যারা চলিতেছে তাদেরই হয় ত একদিন অরুচি ধরিয়া যাইবে (হাজার হউক এই দেশেরই সব মায়েদের ছেলে ত সব) তখন যদি বন্ধ হয় কিন্তু ইতোমধ্যে যে বিষ তরুণ তরুণী নামলাঞ্ছিত তরলমতি যুবগণের—বিশেষতঃ বালিকা কুলকন্যা ও কুলবধূদের—মনে ইহা সঞ্চারিত করিতেছে, তাহার ক্রিয়া যে কতকাল চলিবে আর সংসার স্থিতি কতদূর যে তাহার বিপর্য্যস্ত হইবে, তাহা ভাবিতেও প্রাণ শিহরিয়া ওঠে, বিষের কাঁটা ছড়াইয়া যাওয়া যত সহজ, তুলিয়া নেওয়া তত সহজ নয়।

চপল তরুণ সাহিত্যের কথাই কেবল বলিলাম, ধীরগম্ভীর প্রবীণ সাহিত্যের প্রগতিপরায়ণ ধারকদের মনেও এই সন্দেহ উঠিয়াছে, সতীত্ব নারীর অপরিহার্য্য ধর্ম্ম কি না, বিবাহ ও সংসারস্থিতি (Institutions of marriage and family life) ব্যতীতও সৃষ্টিপ্রবাহ ও মানবসমাজ চলিতে পারে কি না এবং সেই সমাজই বর্ত্তমান এই সমাজ অপেক্ষা মানবজীবনের উন্নততর একটা অবস্থা কিনা, বহু প্রবন্ধে এমন কি উপন্যাসাদিতেও কতকটা দার্শনিক ভাবে এই সমস্যার আলোচনা তাহারা করিতেছেন এবং ঝোঁকটা ইহাদের সতীত্বপাশ (?) হইতে নারীজীবনের মুক্তিতে যেরূপ সমাজ বলিতে পারে সেইদিকেই যেন বেশী।

বলা বাহুল্য, ইহাও নব্য য়ুরোপের বিশিষ্ট একটা ভাব ও চিন্তার ধারা এবং তাহা হইতেই এদেশে ধার করা। ইঁহারাও মানবজীবনে যৌন স্বাধীনতার আনন্দের দিকটাই কেবল দেখিতেছেন, অন্যদিক্‌গুলার কথা ভুলিয়া যাইতেছেন তরুণ কাব্য-বিলাসীরা যাহা করিতেছে কেবল ভাবের নেশায় ইঁহারা তাহাই করিতেছেন। ধীর-গম্ভীর যুক্তির ধারায় কিন্তু যে যুক্তি আর সব চাপিয়া দিয়া কেবল একটা দিকেরই প্রাধান্য ধরিয়া মাত্র তার নির্দ্দেশে চলে, তাহা সুযুক্তির ধারা নয়।

যাহা হউক যে দিক্ দিয়াই যে পক্ষ চলুন, উভয় পক্ষই সমান সতীত্ববিনাশযজ্ঞে ব্রতী।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ, এম, এ,

(বসুমতী—৭ই ফাল্গুণ)

অজয়ের জয়যাত্রা

—শেষাংশ—

অজয় আবার জয়যাত্রায়।

চলিয়াছে সে পূর্ণগর্ভা নায়িকা লইয়া—গরুর গাড়ীতে। এ নায়িকার অর্থাৎ উপন্যাসখানির গর্ভস্থ শুটী হইতেছে ভাষা। সত্যিকার ভাষা এখনো গর্ভ হইতে বাহির হয় নাই। আগে সে ভূমিষ্ঠ হইবে; তারপর সজনীবাবু তা দিয়া তাহাকে পরিপুষ্ট করিবেন এবং তাহারও পরে সে দশজনের মধ্যে চলিবার উপযুক্ত হইবে। আপাততঃ গর্ভিনীকে গরুর গাড়ীতে চড়িয়া কিছুদিন ইতস্ততঃ বেড়াইতে হইবেই। শুনিতেছি, কেনা-বেচার বাজারেও উপন্যাসখানি গরুর গাড়ী করিয়াই চলিতেছে, দোকানদারের বুক্-সেল্‌ফের স্থায়ী শোভা হইয়া। বইএর গোড়ায় সজনীবাবু Lafcadio Hearnএর কবিতাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন—

Things never changed since the time of Gods
The Flow of water and the way of Love.

আরো একটা জিনিষের পরিবর্ত্তন নাই, সেটী সজনীবাবুর এই পূর্ণগর্ভা উপন্যাসটীর ———হস্তান্তর আইন নাকি এখানে নিষিদ্ধ।

২

সজনীবাবুর অজয় গদ্যে-পদ্যে লেখা। রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতার। সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলিতেছে বলিয়াছিলাম; শেষের কবিতার সঙ্গে না-হোক আগের কবিতার সঙ্গে পাল্লা তো দিতেছেই।

রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন :—

আজি আসিয়াছ ভুবন ভরিয়া
গগনে ছড়ায়ে এলোচুল

সজনীকান্ত লিখিলেন—

প্রেয়সী আজিকে গগন ব্যাপিয়া ওই
মাতাল মেঘের উড়িতেছে এলোচুল

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

আজি শ্রাবণ-ঘন গগন-মোহে
গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মত নীরব ওহে।
সবার দিঠি এড়ায়ে এলে।

সজনীকান্ত ইহাকে Expand করিলেন—

মোহন মায়া মেলে তোমার এলে আমার স্বপন মাঝে

রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন—

এ ঘোর রাতে কিসের লাগি
পরাণ মম সহসা জাগি

সজনীকান্ত একটু ঘুরাইয়া লইয়া লিখিলেন—

লক্ষযুগ তোমার লাগি
স্বপন দেখি উঠিল জাগি

রবীন্দ্রনাথ বলাকায় কি লিখিয়াছিলেন—সজনীকান্ত হুবহু তাহার অনুকরণে লিখিলেন—

সায়াহ্ন তপন
স্বর্ণমায়া করিয়া বপন
ধীরে ধীরে যায় অস্তাচলে;
দীঘির চঞ্চল কালো জলে
কাঁপিল সাঁজের তারা উড়াইয়া ধূলি
ফিরিল গ্রামের পথে হাম্বারব তুলি
গোষ্ঠ হ'তে ক্লান্ত ধেনু।

রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন—

স্মরণের গ্রন্থি টুটে
সে যে যায় ছুটে
বিশ্বপথে বন্ধন-বিহীন।

সজনীকান্ত একই কথা অন্য ভাষায় লিখেছেন—

দিবসের সমারোহে
ভুলিতেছে এ-নিখিল নিশীথের বিদায়-বেদনা!

রবীন্দ্রনাথ যখন উর্ব্বশীর বন্দনাগীতি গাহিলেন—

উষার উদয় সম তুমি অকুণ্ঠিতা

তখন সজনীকান্ত পার্শীবাগানের ছাপাখানায় বসিয়া দেখিতেছেন—

উষার উদয় সম আসিতেছে রেণু!

রবীন্দ্রনাথ যে নকল-নবীশীতে এত পটু তাহা জানিতাম না! রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'বৈশাখ'এ যে শ্মশান-বৈরাগীর বর্ণনা করিয়াছেন, তাহারও পরিকল্পনা তিনি সজনীকান্তের অজয় হইতেই পাইয়াছেন। সজনীকান্ত লিখিয়াছেন—

বর্ষণ কামনা কর। আমি নিঃস্ব রিক্ত হায়—
শ্মশান-বৈরাগী,
তীক্ষ্ণ তীব্র রৌদ্রে বসি সদা শিহরাই—

ইহারই ভাবোদ্ধার করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গোটা কবিতাটাই লিখিয়া ফেলিলেন! সজনীকান্ত লিখিয়াছিলেন—

নিখিলের পুষ্প যত চিত্ত মোর ওঠে বিকশিয়া,
অনন্ত আনন্দ-রস ধারা বক্ষে পড়ে যে ক্ষরিয়া;
* * *
শুধু শান্তি অবিরাম নিখিলের সঙ্গীত-কাকলী
উঠে যে উছলি।

ইহারই ছন্দানুবাদ ও শব্দানুবাদ করিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা,
ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ-শোণিমা,
* * * *
অখিল মানসস্বর্গে অনন্ত-রঙ্গিণী,
হে স্বপ্ন-সঙ্গিণি!

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গুপ্তপ্রেমে কি লিখিয়াছেন—সজনীকান্ত তাহার সহিত যুড়ি দিয়া লিখিলেন—

সমাজ সংসার মিছে সব
মিছে এ জীবনের কলরব
কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব!

সজনীকান্তের নিপুন হাতে পড়িয়া রবীন্দ্রনাথের কবিতা গুলির যা-হোক সদ্গতি হইল। এতটা সংশোধন গ্রামারের টীচারেরও সাধ্য ছিলনা।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—

বিরহ-তাপে তাপিত বুকে
নাইবা দিলে সান্ত্বনা—

সজনীবাবু লিখিলেন—

বিরহ-তাপে তাপিত বুকে
লাগিছে জলকণা।

এমন কত দেখাইব? সজনীবাবুর অজয় নাকি বছর ত্রিশেক আগে লেখা হইয়াছিল; রবীন্দ্রনাথ কেমন করিয়া খাতাখানি পাইলেন—পাইয়া আগাগোড়া একটা নকল রাখিলেন, তারপর সুবিধামত উহারই পদগুলি 'লেজা-মুড়া' বাদ দিয়া নিজের কবিতাগুলিতে ভরিয়া

দিতেছেন। শুনিতেছি, এই প্রবন্ধ বাহির হওয়ার পরে সজনীবাবু হাইকোর্টে আবেদন করিয়া রবিবাবুর যে-কবিতাগুলি তাঁহার অজয়ের কাব্যাংশের নকল, যে গুলির ছাপা বন্ধ করিবার জন্য বিশ্বভারতীর উপরে ইঞ্জাংসন আনিবেন। শ্রীযুক্ত প্রশান্ত মহলানবীশ মহাশয় এখন হইতেই রবীন্দ্রনাথের কাছে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করুন না।

প্রেমের অঙ্কুর

প্রাচীন কবি গাহিয়াছেন "সখি প্রেমকি অঙ্কুর আত জাত ভেল—" ইত্যাদি। কিন্তু দ্বাপর যুগে গয়লার ছেলের মধ্যে প্রেমের অঙ্কুর মিলিত কিনা আমাদের সে কথা নিঃসংশয়ে জানা না থাকিলেও—এই ঘোর কলিতে যে সাহিত্যিক মহলে ভূরি ভূরি মিলে এ কথা নিশ্চয়।

কমলগঞ্জন সাহিত্যিক বলিয়া পরিচিত। সাহিত্যরস তাহার মধ্যে কতটুকু আছে তাহা রসিকরা বিবেচনা করিবেন.—তবে বড় বড় সাহিত্যিকের জীবনী সে দুই চারি খানি রচনা করিয়াছে বলিয়াও বটে এবং প্রত্যেক সাহিত্য-সভায় মহোৎসাহে উপস্থিত হয় বলিয়াও বটে, আমরা মানিয়া লইয়াছি সে সাহিত্যিক! এহেন কমলগঞ্জনের গৃহে একটী অতি রূপসী ভার্য্যা ছিল,—বাঙ্গালীর ঘরে অত রূপ সাধারণতঃ নজরেই পড়ে না। এই নিরুপমা স্ত্রীটীর সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথাই বলিত, সে সব কথা থাক,—তবে একটা কথা সকলেই স্বীকার করিত যে, এমন সুন্দরী স্ত্রী কমলাগঞ্জনের ঘরে মানায় নাই। শুনিয়া সে বেচারা ভ্রূকুটী করিত এবং নিরুপমা ঘরে আয়না মুখ দেখিয়া দীর্ঘ শ্বাস ফেলিত।

সাহিত্যিক মহলে পূরা প্রসার করিতে হইলে দু'চারিজন সাহিত্যিক বন্ধুকে মাঝে মাঝে ঘরে আনিয়া এক পেয়ালা চা ও সাধ্যে কুলাইলে দু'একখানা মাছের কচুরী খাওয়ান আবশ্যক। সে ত্রুটী কমলগঞ্জনেরও ছিল না। দু'এক জন সাহিত্যিক বন্ধুকে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিত। আমরা কিন্তু তখনই বলিয়াছিলাম "বাপুহে—সাবধান!" কমলগঞ্জন আমাদের বুঝাইত,—স্ত্রীকে নাকি সে যথাসম্ভব গোপনেই রাখে।

তীর্থাঙ্কুর এক পূরাপূরি ভ্যাগাবণ্ড সাহিত্যিক; বড় সাহিত্যিকদের মোসাহেবী করিয়া সাহিত্যিক মহলে ঘোরে এবং 'স্বামীর জন্য স্ত্রীর বেশ্যাবৃত্তি করাও সতীত্বের নিদর্শন' এই উচ্চাঙ্গের শাস্ত্র কথা কেতাবে লিখিয়া যশস্বী হইবার চেষ্টা করে। এই তীর্থাঙ্কুর নিরুপমার সহিত বৌদি সম্পর্ক পাতাইয়া ফেলিয়াছিল এবং সময়ে অসময়ে কমলাগঞ্জনের গৃহে উপস্থিত হইত! ধীরে ধীরে প্রেমের অঙ্কুর গজাইলে সে সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। অবশেষে একদিন নির্জ্জন গৃহ দেখিয়া বলিয়া ফেলিল "বৌদি তোমার এত রূপ, শুধু শুধু নষ্ট কর্চ্ছ কেন?"

নিরুপমা ঈষৎ আরক্ত হইয়া কহিল, "কি করব?" "না, না বলি খারাপ কিছু না করেও ত অন্য উপায়ে—এই ধর না কেন, বায়স্কোপে আজকাল এ্যাক্ট্রেস খুঁজছে, পাচ্ছে না,—সেখানে গেলে সাধু উপায়ে কত অর্থাগম হয়। এমন রূপ মাঠে মারা যাচ্ছে, শুধু শুধু!"

নিরুপমা উজ্জল চক্ষু মেলিয়া, কহিল কে নিয়ে যাবে ভাই বায়স্কোপে?

তীর্থাঙ্কুর সামনের দিকে ঝুকিয়া বসিয়া কহিল, "যাবে বৌদি?" নিরুপমা কহিল, কিন্তু উনি—"

তীর্থাঙ্কুর কহিল "না জানালে ওঁকে! চলনা—"

তারপর কি পরামর্শ হইল ভগবান জানেন, কিন্তু সেই দিনই স-কন্যা নিরুপমাকে লইয়া গিয়া তীর্থাঙ্কুর শিয়ালদহের কাছাকাছি মনুমেণ্ট

হোটেলে তুলিল। নিরুপমা তখন নূতন উৎসাহে পরিপূর্ণ, তাই রাত্রে যখন যখন তীর্থাঙ্কুর তাহার মুখখানি নিরুপমার মুখের কাছে লইয়া আসিল, নিরুপমা ওষ্ঠ দু'টী বাড়াইয়া ধরিতে বিন্দুমাত্র আপত্তি করিল না।

হোটেলে খাবার খরচ বেশী, তীর্থাঙ্কুরের আয়ের মধ্যে ত মোসাহেবীর প্রসাদ! অগত্যা কিছুদিন বাদে টালা অঞ্চলে একখানি বাড়ীভাড়া করিতে হইল; মা মেয়ে দুজনের খরচ কম নয় ত! বেচারার প্রাণ যায় আর কি! পিরীতে এত ফ্যাসাদ পূর্ব্বে জানিলে বোধ হয় এমন সর্ব্বনেশে পিরীত করিত না!

যাহাই হউক উপায় শীঘ্রই হইল। একজন অতি-গরম কবি ও একজন অতি-নরম কবি নিরুপমার রূপের খ্যাতি শুনিয়া তীর্থাঙ্কুরের শরণাপন্ন হইলেন। মুখ শোঁকাশুঁকি হইল। তীর্থাঙ্কুরের হাতে টাকা গুঁজিয়া দুইজনেই পালা করিয়া গমনাগমন সুরু করিলেন। তীর্থাঙ্কুরের অনেকটা রেহাই পাইল!

কমলগঞ্জন প্রথমটা মুষড়াইয়া পড়িয়াছিলেন; পরে "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ" এই মহামন্ত্রে মনে বল আনিলেন। তখন আবার সাহিত্যিক মহলে যাতায়াত সুরু করিলেন। এই ভবানীপুর সাহিত্য-সম্মিলনের দিন কোমর বাঁধিতেছেন দেখিয়া আমরা বলিলাম, "দাদা করছ কি? সে ভ্যাগাবণ্ড্‌টা যদি আসে?" দাদা হঠাৎ ঈষৎ হাসিলেন।

কিন্তু যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল, দ্বারের কাছেই সাক্ষাৎ।— তীর্থাঙ্কুর দাঁত বাহির করিয়া কহিল, 'দাদা ভাল ত?' দাদা হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিলেন, দাঁতে দাঁত চাপিলেন; পরে কহিলেন, "হ্যাঁ ভাল," ঈষৎ হাসিলেন।

আমরা হরি হরি বলিয়া পালা সাঙ্গ করিলাম। পাঠকদেরও বোধ হয় ধৈর্য্য আর নাই। তবে এইটুকু তাঁহাদের কাছে নিবেদন যে, গৃহে যাঁহাদের সুন্দরী ভার্য্যা আছে, তাঁহারা যেন কথা-সাহিত্যিক আর শিল্পী দেখিলেই দুর্জ্জন বলিয়া দূরপরিহার করেন!

প্রথম অঙ্ক

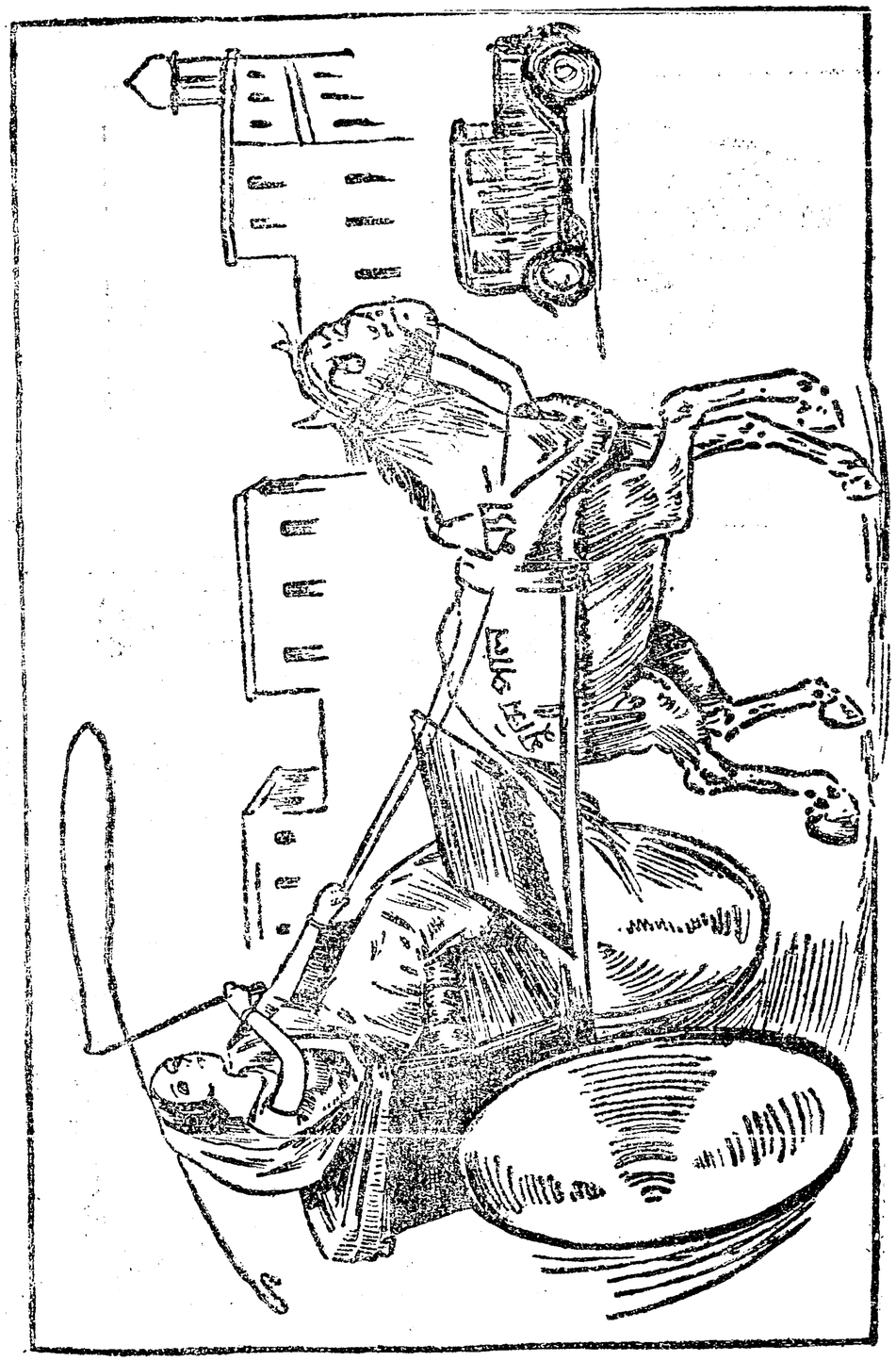

"সিংহ-নন্দিনী" বনাম 'গোস্বামী' —।

মুন্সীপালী ছ্যাকড়া গাড়ীতে।

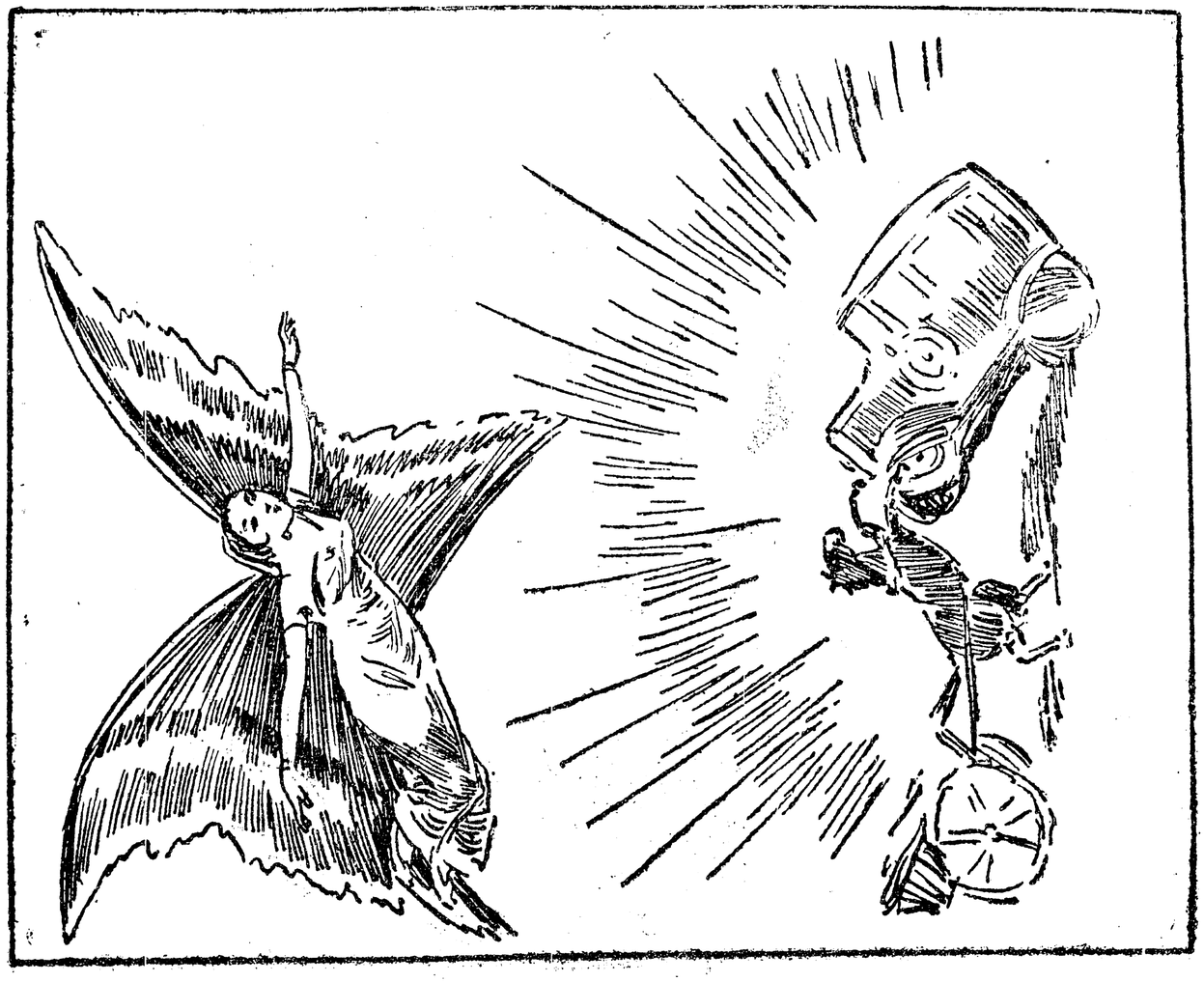

দ্বিতীয় অঙ্ক

রোলস্‌-রয়েস্‌-এ

তৃতীয় অঙ্ক

নূতন মধুর সন্ধানে

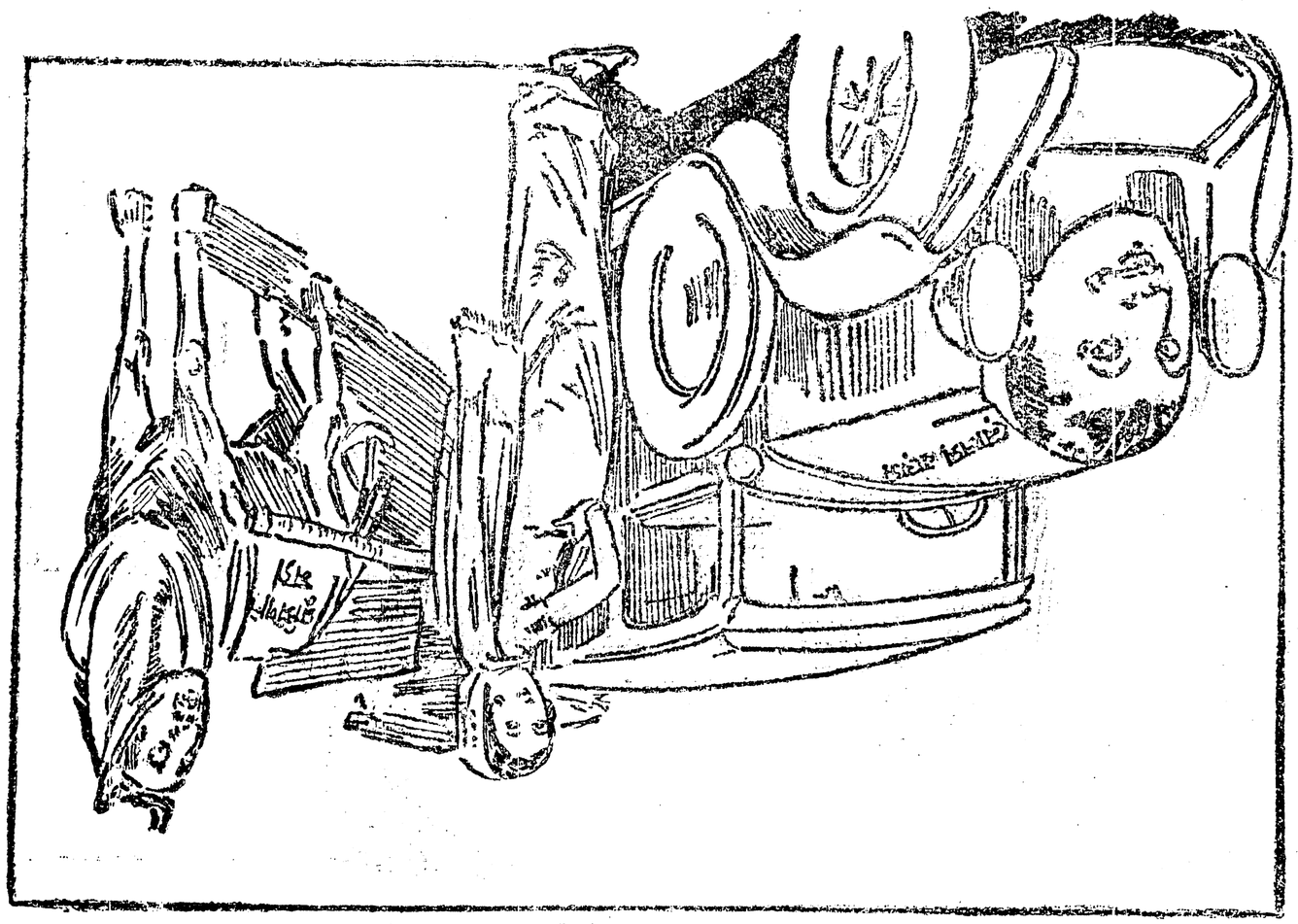

দুঃশাসন-দ্রৌপদী সংবাদ

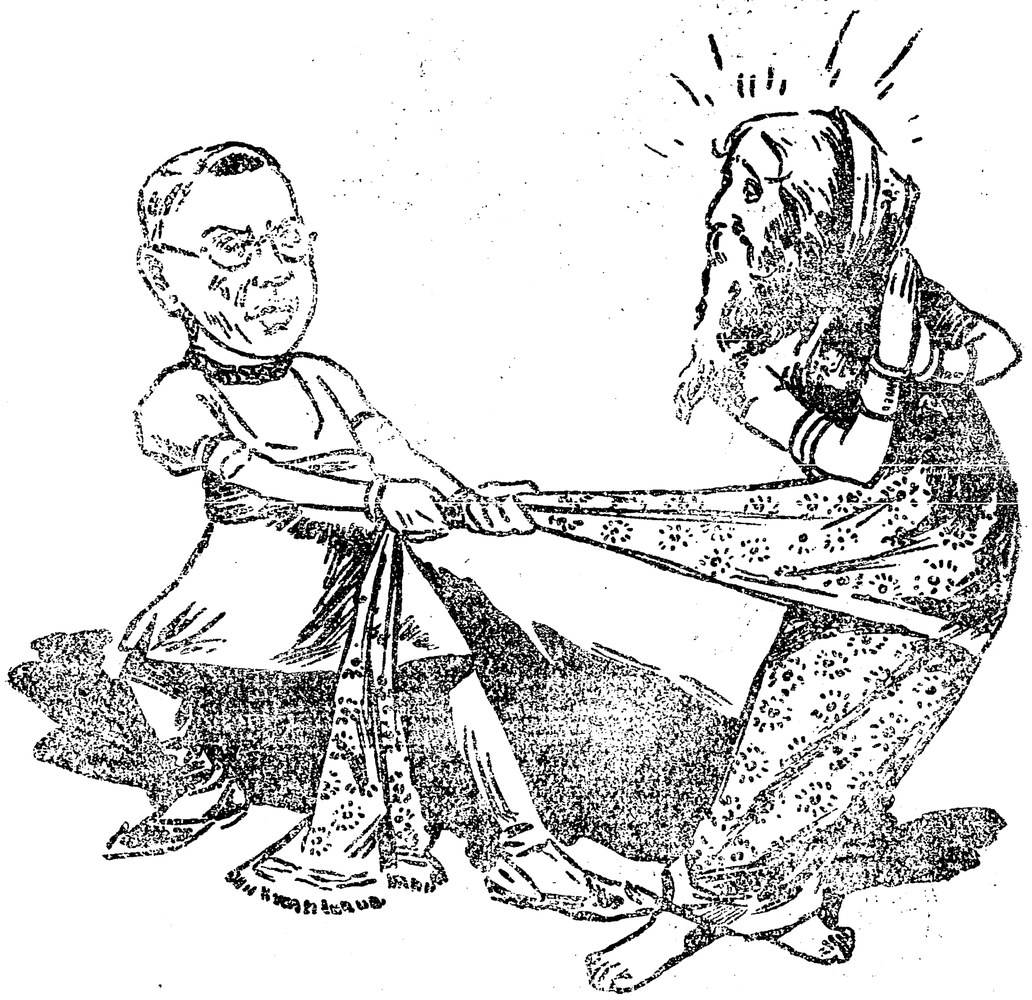

সভা-রাক্ষসী কিছুতেই ক্ষমা কর্‌লে না !

—রবীন্দ্র নাথ—(বিচিত্রা, ফাল্গুন)

সমাজের খুঁটিনাটি

মিঃ গুরুসদয় দত্ত আই সি এস্ বর্ত্তমানে ময়মনসিংহের ডিষ্ট্রিক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট। ইনি ব্রাহ্ম—এবারে ইঁহার উৎসাহে ময়মনসিংহে মাঘোৎসব বিশেষ জাঁকজমকের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। প্রতি বৎসর এই উপলক্ষে ১১ই মাঘ তারিখে বালক-বালিকা সম্মিলন হয়। এবারে হইয়াছে 'যুবক-যুবতী সম্মিলন'! কলিকাতার দম্‌দম্ গার্ডেন পার্টি অভিভাবকগণের আতঙ্কের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে—ময়মন্‌সিংহে তাহার প্রবর্ত্তন! সমাজ ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে বটে! নির্জীব কচুরি পানার বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াও দত্ত-সাহেব কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই; এবারে তাঁহার অভিযান সজীব সমাজের বিরুদ্ধে। দত্ত সাহেবের অনন্ত বিরহের সান্ত্বনা সরোজনলিনী দত্ত-সমিতি হইতে প্রচারিকা শ্রীমতী লাবণ্য-লেখা চক্রবর্ত্তী 'মিশনারী' কাজে ময়মনসিংহে গিয়াছিলেন; তাঁহার উদ্যোগে মহিলা সম্মিলনে সর্দ্দা আইনের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে ভোট লওয়া হয়। বোর্ডিংবাসিনী বয়স্থা কুমারী ও ব্রাহ্মিকাগণ অবশ্যই Self-contradiction করিতে পারেন না, তাই No-পন্থীর চেয়ে Yes-পন্থীরা দলে ভারী হয়। সমিতির 'মিশনারী' কাজের ফলে ব্রাহ্মধর্ম্মীর কুলবৃদ্ধি হইতেছে তো?

* * * *

ব্রাহ্ম সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানিতা মহিলার সতীত্বের মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে ৬০ হাজার টাকা! অবশ্য হাইকোর্টের বিচারে এই মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে; ব্রাহ্মিকার নিজের বিচারে ইহার দর অনেক কম—মাত্র একখানি রোল্‌স্ রয়েস্ গাড়ী! দুষ্ট লোকে বলিয়া বেড়াইতেছে যে, ইহার পরে আক্কেল সেলামীর ৬০ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে ফেলিয়া রাখিয়া একখানি রোল্‌স্ রয়েস্ লইয়া শিকারে বাহির হওয়া যাইবে। অতঃপর

ইন্দোর আর মমতাজে মন মজাইবেন না, পাতিয়ালা সর্দ্দারের শির লইয়া সর্দ্দার-পত্নীর পাণি-গ্রহণের জন্য ব্যস্ত হইবেন না, নাভা-নরেশ রাজ্য খোয়াইবেন না—রোল্‌স্ রয়েস্ লইয়া বাংলা দেশের আলোকপ্রাপ্ত মহলে ধাওয়া করিলেই চলিবে!

* * * *

ভারতে সতীত্ব ছিল অমূল্যরত্ন। অর্থদ্বারা সতীত্বের মূল্য নির্দ্ধারণ ভারতের এ স্বপ্নেরও অতীত। সেই দেশেই আলোকপ্রাপ্ত সমাজে সতীত্বের নিলামে সব চেয়ে উচু ডাক লইল ৬০ হাজার টাকা! সামাজিক সংস্থান হিসাবে ঐ সমাজের কোন cultured পরিবারের সম্মান যদি ঐ পরিবারের একশত ভাগের একভাগ হয়, তাহা হইলে সে সকল পরিবারের দুলালীদের সতীত্বের মূল্য ছয় শত টাকায় নামিবে নিশ্চয়। ছয়শত টাকা জোগাড় করিতে আর শ্রীরামপুরী জমিদার-নন্দনের সন্ধানে বাহির হইতে হইবে না; কলিকাতার মাড়বারী সমাজ এ বিষয়ে অত্যন্ত উদার।

* * * *

তুলসী গোঁসাই-বনাম রমলা গুপ্তার মামলার সম্বন্ধে প্রবাসী-সম্পাদক তাঁহার প্রবাসী বা মডার্ণ রিভিউ কাগজে একটী ছত্রও লিখেন নাই—এটা অবশ্য স্ব-গোত্র-প্রীতি! ব্রাহ্ম-সমাজের কেলেঙ্কারী কথা গোপন করিবার আগ্রহে রামানন্দ বাবু জর্ণালিষ্টিক্ এটিকেট্ পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। সঞ্জীবনীর কৃষ্ণকুমারবাবুর ভণ্ডামীর ভড়ং নাই; তিনি সঞ্জীবনীতে খবরটী দিয়াছেন। তবে খবরের নীচে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাংশে তাঁহার উপযুক্ত হয় নাই। শ্লেষটুকু গোস্বামী গোষ্ঠীর উপরে ছাড়িয়া ব্রাহ্ম গোষ্ঠিকে বেকসুর খালাস দিয়া তিনি একদেশদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন!

* * *

ঢাকার কোন বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী নাকি তাঁহার ভাইকে 'বিবাহ' করিয়া ভাই-বোনে স্বামী-স্ত্রী ভাবে বাস করিতেছেন। ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ অবশ্যই অন্যান্য বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে 'ভ্রাতা-ভগিনীর যৌন-প্রেম' নামক নূতন বস্তুটী শিক্ষালাভ করিতেছেন। শিক্ষয়িত্রীটী গ্রাজুয়েট এবং বলা বাহুল্য, আলোকপ্রাপ্ত সমাজের; অধিকিন্তু সর্দ্দা আইনের অত্যুগ্র সমর্থক।

বাঙ্‌লার বিপ্লবী মনোভাব

এ কথা বাঙ্‌লার যুবকদের কাছে একরূপ open secret-এর মত দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে, বাঙ্‌লার রাজনীতি ক্ষেত্রে দৃশ্যতঃ যে দুইটী বিবদমান দল দেখা যাইতেছে তাহা সেনগুপ্ত কিম্বা সুভাষচন্দ্রের দল নয়—মূলতঃ তাহা হইতেছে বাঙ্‌লার বিপ্লববাদীদেরই দুইটী দল—পরস্পর পরস্পরের প্রতি শব্দভেদী বাণ সন্ধান করিতেছে। যাঁহারা বিপ্লববাদী দলের বাহিরে—তাঁহারা যদিও এই দ্বন্দ্ব-যুদ্ধকে ব্যক্তিগত প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার দিক্ হইতেই দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলেও যাঁহারা বিপ্লববাদীদের অনুচর অথবা তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন তাঁহারা দাবী করেন যে, এ বিবাদ ব্যক্তিগত নহে কর্ম্ম-পদ্ধতি—programme of work লইয়াই। তাঁহারা বলেন যে, এই দুই দল দুই প্রকারের কার্য্যপ্রণালীর পক্ষপাতী। একদল চাহেন—Irish method অর্থাৎ Guerilla-warfare (খণ্ড যুদ্ধ) চালাইয়া—aggressive minority দ্বারাই স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে—আর একদল বলেন তাহা নহে— স্বাধীনতা অর্জ্জনের পথ হইতেছে Russian methodএর অনুসরণ করা অর্থাৎ একটী mass movement এর দ্বারা General Strike খাটাইয়া বিদেশী

শাসন-যন্ত্রকে অচল করা। যাঁহারা এই পরবর্ত্তী প্রথার পক্ষপাতী তাঁহারা মূলনীতি হিসাবে অহিংসায় বিশ্বাসী না হইলেও—মহাত্মা গান্ধীর আইন অমান্য অনেকটা Russian method minus violence অথবা Russian method plus non-violence বলিয়া মহাত্মাজীর কার্য্যপ্রণালীর অনুরাগী। প্রসঙ্গক্রমে এ কথা বলা যাইতে পারে যে, মহাত্মা গান্ধী নিজের কার্য্যপ্রণালীতে ঋষি টলষ্টয়ের প্রভাব স্বীকার করিয়াছেন—সুতরাং তাঁহার কার্য্যপ্রণালী যে অনেকটা Russian methodএর অনুরূপই হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

যাঁহারা প্রথমোক্ত দলের, তাঁহারা মহাত্মা গান্ধীর ঘোরতর বিরোধী এবং তাঁহার প্রতি অযথা নিন্দা এবং উপহাস করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। 'স্বাধীনতা' নামক সাপ্তাহিক কাগজখানিতে এই শ্রেণীর মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। লাহোর কংগ্রেসের পর হইতে 'স্বাধীনতা' কিরূপে মহাত্মাজীর প্রতি আক্রমণ চালাইয়া আসিতেছে, তাহা যাঁহারা এই কাগজখানি পাঠ করিয়া থাকেন তাঁহারাই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। মহাত্মা গান্ধীর প্রতি আক্রমণের প্রতি-আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে এ প্রবন্ধ লেখা নহে—কেন না মহাত্মা গান্ধী সেই শ্রেণীর মহামানবের অন্তর্ভুক্ত যাঁহাদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"He came to save others—He Himself could not save" আমরা কেবল উপরোক্ত দলের মতবাদ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া নির্ণয় করিতে চাহি যে, মতবাদ হিসাবে উহার প্রকৃত মূল্য কত খানি। এই আলোচনার সুবিধা হিসাবে তিনটী দিক হইতেই এই মতবাদের মূল্য কসিয়া দেখিতে পারি—

১। উহাদের কার্য্যপ্রণালীর প্রয়োগ-সম্ভাবনা আমাদের দেশে কিরূপ?

এবং ঐ প্রণালী অবলম্বিত হইলেও উহাতে স্বাধীনতা অর্জ্জন সম্ভব হইবে হইবে কিনা?

২। যদি ঐ প্রণালীতে স্বাধীনতা অর্জ্জন সম্ভব হয়, তাহা হইলে সে স্বাধীনতারই বা স্বরূপ কি?

৩। ভারতের সাধনা ও সভ্যতার দিক হইতে এবং বিশ্বসভ্যতা ও culture যে দিকে অগ্রসর হইতেছে, সেই দিক হইতে ঐ কর্ম্মপদ্ধতির কোন সামঞ্জস্য—আছে কিনা?

প্রথমতঃ বিপ্লবপন্থার কার্য্যকারিতা ও প্রয়োগনৈপুণ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা এই বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে চাই—যে যাহারা যখন তখন অতিবিজ্ঞ ভাবে "Non-violence-এ কিছুতেই স্বাধীনতা অর্জ্জন হইবে না" এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহারা তাঁহাদের পন্থা কি করিয়া কার্য্যকরী হইতে পারে একমাত্র আইরিস জাতির নজীর ব্যতীত তাহার অন্য কোন সুস্পষ্ট ব্যাখা আজ পর্য্যন্তও দিতে সক্ষম হন নাই—অবশ্য উত্তরে তাঁহারা বলিতে পারেন আমরা গুপ্ত-সমিতির সহায়তায় যাহা করিতে চাই, তাহার ব্যাখ্যা বাহিরে প্রকাশ যোগ্য নয়। এ কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও—আজ পর্য্যন্ত যে সমস্ত গুপ্তসমিতির কাহিনী তাঁহাদেরই বড় বড় চাঁইদের দ্বারা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে কোথাও তাঁহারা এ বিষয়টী সম্বন্ধে কোন যুক্তি দিতে পারেন নাই, বরং তাঁহাদের ভিতরই কেহ কেহ বিপ্লবীদের ভিতরে কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে যে একটা Bankruptcy of intellect ছিল, তাহা কখনও বা প্রকারান্তরে—কখনও বা খোলাখুলি ভাবেই স্বীকার করিয়াছেন। যাঁহারা এইরূপ মত প্রকাশ, করিয়াছেন, তাঁহাদের দুইজনের নামও করা যাইতে পারে একজন হেমচন্দ্র কানন গুঁই—বারীণদার ঝুনো হেমদা আর একজন ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

যাহাহউক তাঁহাদের 'শাসন-সংযত কণ্ঠের' দোহাইতে ধরিয়া লওয়া গেল যে, আমাদের পক্ষে সশস্ত্র বিপ্লব হইলে জয়ী হইবে। যদিও ইহা ধারণা করা বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রের পক্ষেই সম্ভব নয় যে, যে প্রণালী অবলম্বনে অস্ত্র-ব্যবসায়ী আইরীশ জাতি তাঁহাদের লক্ষ্যে পৌঁছিতে সমর্থ হইয়াছেন—তাহাও পূর্ণভাবে নয় (এ কথা কাহারও অজ্ঞাত নহে যে Irish Free Stateএর constitution Dominion Status-এরই অনুরূপ; কোন কোন অংশে তাহাপেক্ষাও হীন; পূর্ণ স্বরাজ ত নহেই!) কি করিয়া আজ বহুশতাব্দী অস্ত্র হইতে বঞ্চিত এবং গৃহে গৃহে গুপ্তচর দ্বারা বেষ্টিত ভারতবর্ষের মত এত বিস্তীর্ণ দেশের পক্ষে উহা সম্ভবপর হইবে? তার পরেই উঠে আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন এই সশস্ত্র বিপ্লবদ্বারা অর্জ্জিত স্বাধীনতার স্বরূপ কি? ইহা কি আমাদের কাম্য প্রকৃত স্বাধীনতা না অপর কিছু? বিপ্লবপন্থী স্বাধীনতাবাদীদিগের (যাঁহারা নিজদিগকে একমাত্র "আদি ও অকৃত্রিম" স্বাধীনতার প্রচারক বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন এবং যাঁহারা কলিকাতা কংগ্রেসে স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই বলিয়া মহাত্মাজীকেও ভীরু আখ্যা দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই) নিকট হইতে পাওয়া যাই নাই। ঐ প্রশ্নের উত্তর তাঁহাদিগের নিকট হইতে মিলে নাই বটে, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত কোন কোন কাগজে এরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন যে, মহাত্মা গান্ধীর অর্থে স্বাধীনতা হইতেছে মাত্র একাদশটী সর্ত্ত! মহাত্মা গান্ধী কিন্তু ঐ একাদশটী সর্ত্ত সম্বন্ধে পরে লিখিয়াছিলেন যে, ঐ সর্ত্তগুলি দারিদ্র-জনসাধারণের মুখ চাহিয়াই রচিত হইয়াছে, ঐ সর্ত্তের প্রধামতমগুলি হইতেছে ভূমিকর ৫০ পার্সেণ্ট কমাইয়া দেওয়া, লবণকর বন্ধ করা, সৈনিক ব্যয় ৫০ পার্সেণ্ট কমান এবং উচ্চ-বেতনভোগী কর্ম্মচারীদিগের বেতন ৫০ পার্সেণ্ট কমান ইত্যাদি। তিনি বলিতেছেন যে, স্বাধীনতা অর্থ যদি দরিদ্রদিগের শোষণ বন্ধ করা না

হয়—তাহাহইলে জনসাধারণের কাছে ঐ স্বরাজ বা স্বাধীনতার অর্থ কি?

আমাদের বিপ্লবী 'স্বাধীনতা'বাদীরা ইহাতে সন্তুষ্ট নহেন; তাঁহারা এরূপ ভঙ্গিতে মহাত্মাজীর সর্ত্ত সম্বন্ধে ঈঙ্গিত করিয়াছেন যেন তাঁহাদের স্বাধীনতা বস্তু মহাত্মাজীর স্বাধীনতার ধারণা হইতে অনেক বৃহৎ। এই বৃহৎ বস্তুটীর সম্বন্ধে তাহারা সুস্পষ্ট কিছুই বলেন নাই—স্বাধীনতাবাদী-দিগের স্বাধীনতা সম্বন্ধে ধারণা আজ পর্য্যন্ত আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে কিছুই জানিতে পারি নাই। জানিতে পারি নাই সত্য, কিন্তু তাঁহাদের ভঙ্গিতে ও ঈঙ্গিতে কিছু বুঝিতে পারিয়াছি। বুঝিয়াছি এই যে, স্বরাজের পূর্ব্বেই আমার স্বাধীনতার যে চিত্র দেখিতেছি, পরেও তাহাই দেখিব। আজ আমরা যেরূপ দেখিতেছি একদল স্বাধীনতাবাদী:বিপ্লবী নেতা অমুক ঘোষ—কি অমুক দাস তাঁহাদের অনুচরবৃন্দ লইয়া আর একদল স্বাধীনতা-বাদীদিগকে দাবাইবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন—স্বাধীনতা পাইলেও দেখিব, এই অমুক ঘোষ—কি অমুক দসই হইয়া উঠিয়াছেন এক-একটি ক্ষুদে War-Lord বা Military Dictator. ইতিহাসের নজীরও আমাদের এই কথারই প্রতিধ্বনি করিবে; ফরাসী বিপ্লবের কথা না হয় বহু অতীত বলিয়া ছাড়িয়াই দেওয়া গেল, যেখানে দেখা গিয়াছিল একজন বিপ্লবী নেতা আর একজন বিপ্লবী নেতার প্রাণদণ্ড দিতেছেন এবং পরে এই দণ্ডদাতা নেতা আর এক নেতার দ্বারা দণ্ডিত হইতেছেন! যে Irish জাতির ইতিহাসকে এই বিপ্লবী দল Gospel বলিয়া মনে করেন, সেখানেও আজপর্য্যন্ত বিপ্লবী নেতা ডিভেলেরা তাঁহারই সহকর্ম্মীর হস্তে নির্য্যাতিত হইতেছেন। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, স্বাধীনতা-বাদীদিগের সুবৃহৎ স্বাধীনতার ধারণা হইতেছে একটা Military Dcita-torship বা সামরিক শাসন—তাহা মূক-জনসাধারণের স্বাধীনতা নহে। শোষণ সব সময়েই শোষণ—তাহা অন্যজাতি দ্বারাই হউক—অথবা ক্ষুদে

War-Lord এই সব Military অশ্বেত বিপ্লবী নেতাদের দ্বারাই হউক! তাহা জনসাধারণের স্বাধীনতা ত নহেই বরং এরূপও হইতে পারে যে, এখন যেরূপ এইসব War-Lords ধনিক-সম্প্রদায়ের তাবেদারী করিতেছে, পরেও সেইরূপই তাহাদের ক্রড়নক হইয়া একটা ধনিক-রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিবে। ইহাই হইল এই বিপ্লববাদীদিগের স্বাধীনতার প্রকট মূর্ত্তি।

আমাদের তৃতীয় প্রশ্ন হইতেছে, এই বিপ্লববাদের মূল্য কি এবং পৃথিবীর সভ্যতা ও সাধনা আজ যাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহার সহিত এই মতবাদের কোন সামঞ্জস্য আছে কি? একথা একরূপ সকলেই জানেন যে, জগতের গতি আজকাল শান্তি-প্রতিষ্ঠার দিকেই চলিতেছে; আমরা যে যখন তখন New youth-movement বলিয়া চীৎকার করিয়া থাকি—ঐ movementগুলির স্বরূপ হইতেছে পৃথিবীতে একটী ঐক্যের ও শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। বহু পাশ্চাত্য মনীষিও আজকাল এই চিন্তায়ই ব্যপৃত আছেন যে, কি করিয়া পৃথিবী হইতে যুদ্ধ, কলহ, বিপ্লব দূর করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জ্জনকারীদিগকে আজ একথা বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, কি উপায়ে পৃথিবীব্যাপী এই pacifist আন্দোলনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া মুক্তিপথে অগ্রসর হওয়া যায়। বাঙ্‌লার সশস্ত্র বিপ্লবপন্থী এ কথাটা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? না তাঁহারা সেই একশত বৎসরের পুরাতন গুপ্ত-সমিতি প্রতিষ্ঠার মনোবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিতেছেন? তারপর ভারতের সাধনা ও সভ্যতার দিক হইতে—এই প্রশ্নের সমাধান করিতে যাইয়া মনে জাগে—'স্বাধীনতা' বাদীদিগের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তির একখানি পুস্তকের কথা, পুস্তকখানির নাম হইতেছে—"কি বিজয়ী প্রাচ্য" শিক্ষিত লেখক

মহাশয় এই বিজয়ী প্রাচ্যের আদর্শ ধরিয়াছেন তৈমুরলঙ্গ, চেঙ্গিস ও নাদীরখাঁ ইত্যাদিকে! মানুষের গোড়ামী মানুষকে কোন পথে লইয়া যায় এই বইখানি তাহারই প্রামাণ করে। আজ অর্দ্ধ শতাব্দীও অতীত হয় নাই—আটলান্টিকের পরপারে দাঁড়াইয়া ভারতের বিজয়ী বীর তরুণ সন্ন্যাসী স্বামিজী এই বলিয়া গর্ব্বোন্নত শীরে ধর্ম্ম-মহাসভায় দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন যে, তাঁহার দেশ কখনও প্রতিবেশীর রক্তে স্বীয় অঙ্গুলী কলঙ্কিত করে নাই! আর তাঁহারই বংশধর এক শিক্ষিত স্বাধীনতাবাদী বিদ্রোহী প্রাচ্যের আদর্শ খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন —চৈনিক দস্যু তৈমুর লঙ্গের ভিতরে! জানি, বিপ্লবপন্থীরা হয়ত বাহাদুরী করিয়া বলিবেন—তোমাদের নিরীহ ভারতবর্ষে আর কাজ নাই; তৈমুর-লঙ্গকে আজ আমরা চাই আমাদের ভিতরে রক্ত-উন্মাদনা জাগাইতে! কিন্তু তাঁহাদের একমাসের নেতা বিপ্লবী উপেনদার ভাষাতেই —(যিনি উত্তর কলিকাতা যুবক-সম্মেলনে এ কথা বলিয়া ছিলেন যে, স্বাধীনতা না লইয়া আপনারা যদি ইংরাজের অধীনে Dominion Status লাভ করেন তবে—আপনাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কি আপনাদিগকে দুইহাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন?) জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, আজ যদি ভারতবর্ষের ভিতরে একজন তৈমুরলঙ্গের আবিভাব হয় যিনি সমগ্র হিন্দুজাতিকে কান ধরিয়া উঠাবসা করাইতে পারেন, তাহাহইলে আপনাদের পূর্ব্বগামী পুরুষরা কি আপনাদিগকে দুইহাতে তুলিয়া অজস্র আশীর্ব্বাদ করিতেন?

এ পর্য্যন্ত আমরা বাঙ্‌লার বিপ্লবপন্থীদিগের আদর্শ বা মতবাদ লইয়া আলোচনা করিয়াছি—কিন্তু ইহাপেক্ষা যে গুরুতর আত্মবঞ্চনা বাঙ্‌লার যুবকদের একদল বিপ্লবী মতবাদের আশ্রয়ে আক্রমণ করিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়াই এই প্রবন্ধের শেষ করিব। বাঙ্‌লা দেশে একথা

অতিশয় নির্ম্মম সত্য হইলেও চলিতেছে—বিপ্লবের নামে ধাপ্পাবাজী। যখন তখন একথা বাঙ্‌লার যুবকদের মুখে শোনা যায় যে, বিনারক্তপাতে স্বাধীনতা অর্জ্জন করা যাইবে না এবং এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা কোন কর্ম্মপদ্ধতি অনুসরণের কথা উঠিলেই সেই কর্ম্মপদ্ধতির প্রতি বিদ্রূপ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন এবং মুক্তিপথে তাঁহাদের কর্ত্তব্যের অবসান হইল বলিয়া মনে করেন। এযে কত বড় আত্মপ্রবঞ্চনা—এযে কত বড় ধাপ্পাবাজী—তাহা ভাবিয়াও দেখেন না! এই ধাপ্পাবাজী ও আত্ম-বঞ্চনার ও মূল উৎস হইতেছে একদল বিপ্লব-ব্যবসায়ী যাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বকৃত স্বদেশসেবাকে পণ্য করিয়া ইঙ্গিতে ও ভঙ্গীতে যুবকদের ভিতরে এইরূপ বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতেছেন যে—বিপ্লব পথে তাঁহারা অনেক অগ্রসর হইয়াছেন; হয় ত বা হিমালয়ের ছায়ায় অথবা বঙ্গোপসাগরের তীরে তাঁহাদের দ্বারা বিপ্লবীদল গঠিত হইতেছে—তাঁহারাই স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়া আনিবেন—যুবকদের আর কোন কর্ত্তব্য নাই, তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইতেছে এই দাদার দলের তাবেদারী করা—তাহা Council electionএর জন্যই হউক কি Corporationএর জন্যই হউক—কি কোন বিরুদ্ধ দলের লোকের নির্য্যাতনের জন্য গুণ্ডামীর দ্বারাই হউক!

বাঙ্‌লার যুবকেরা আজ নিজদিগকে এই প্রশ্নই করুন যে, বাঙ্‌লায় আজ বিপবের নামে যাহা চলিতেছে—তাহা প্রকৃত বিপ্লব না ধাপ্পাবাজী—না অপর চতুর ব্যক্তিদিগের দ্বারা সরল-মতি যুবকদের exploitation?

ঢাকুরিয়া লেকে লবণাগ্নি

রাত্রি সাড়ে এগারোটা; ঢাকুরিয়া লেকের চারি পাশের ইলেক্‌ট্রিক্ আলোগুলি সবে মাত্র নিভাইয়া দিয়াছে। হুস্ হুস্ করিয়া দু'একখানা মোটর তখনো ছুটিতেছে; মোটরের আলোয় পথগুলি থাকিয়া থাকিয়া আলোকিত হইতেছে—লেকের জলে সেই আলো ঝিলিমিলি খেলিতেছে। লেকের উত্তরে হিন্দুস্থান পল্লী যেখানে, সেদিকেরই রাস্তা হইতে একখানি বুইক গাড়ী আসিয়া লেকের পাশে দাঁড়াইল। গাড়ীখানির মাথায় জাতীয়-পতাকা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। বসিবার আসনের সুমুখের দিক পর্দ্দায় ঘেরা; সুতরাং আরোহীর খোঁজ করিতে না গিয়া ড্রাইভারের কাছে গিয়া প্রশ্ন করিলাম, জাতীয়-পতাকাওয়ালা গাড়ী যে এসময়ে?

ড্রাইভার কহিল, আজ কোন্ তারিখ মনে আছে?

আমি বলিলাম, আছে—আজ পয়লা এপ্রিল। কিন্তু পয়লা এপ্রিল তারিখে "এপ্রিল ফুলের" প্রতীকই একটা কিছু রাখা উচিত ছিল গাড়ীতে। তাহা না রাখিয়া জাতীয়-পতাকা কেন?

ড্রাইভার বলিল, বাবু, আপনি দেখিতেছি কোন খবরই রাখেন না। আজ গান্ধী আইন-অমান্য আরম্ভ করিবেন—আরব্য-সাগরের তীরে তিনি লবণ তৈরী করিতেছেন।

আমি কহিলাম, তাই বুঝি তোমাদের বাবু তাঁর সঙ্গীনিদের সহ এখানে আজ সহস্র আরব্য রজনীর একটী নিশি যাপন করিতে আসয়াছেন। ভালো যায়গাই তিনি বসিয়াছেন বটে! আরব্য-রজনীর কল্পলোকের সঙ্গে ঢাকুরিয়া লেকের স্বপ্ন-লোক মিল্‌বে ভালো!

ড্রাইভার কহিল, নাঃ—আজিকার দিনেও আপনারা স্বপ্নলোকে বিচরণ করিতেছেন! গান্ধীজীর অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ যদি না করিতাম, তাহা হইলে আপনার মাথা লইতাম।

কহিলাম, তোমাদের গান্ধীজী মাথা না লইলেও মাথা খাইতে তো ছাড়েন না!

সে প্রশ্ন করিল, তার মানে?

উত্তর করিলাম, তার মানে তোমাদের মতো অনেকের মস্তিস্কই তিনি চর্ব্বন করিয়াছেন। কিন্তু এই রাত দুপুরে লেকের কাছে বসিয়া গান্ধী-মাহাত্ম্য প্রচার করা তো সুবিধা মনে হইতেছে না বাপু! ব্যাপারটা কি খুলিয়াই বল না!

সে বলিল, আজ পয়লা এপ্রিল মহাত্মা গান্ধী আরব্য-সাগরেরর জলে লবণ তৈরী সুরু করিয়াছেন। সমস্ত ভারতবর্ষে এই লবণ তৈরীর হিড়িক লাগিয়া গিয়াছে, আমাদের প্রভুও তাই আসিয়াছেন লেকের তীরে লবণ তৈরী করিতে!

বিস্মিত হইয়া শুধাইলাম, লেকের তীরে লবণ তৈরী! তাজ্জব ব্যাপার বটে! তারপর?

ড্রাইভারের মুখের উত্তর শুনিতে হইল না; ততক্ষণে মোটরের দরজা খুলিয়া ভিতর হইতে একটী পুরুষ ও একটী স্ত্রীলোক বাহির হইল। পুরুষটীকে দেখিবা মাত্র চিনিতে পারিলাম—আমাদের ন'লে, হিন্দুস্থানে হাত পাকাইয়া কমার্সে বিশেষজ্ঞহইয়া উঠিয়াছে, বিশ্বাসকে কলা দেখাইয়া বন্দর ট্রাষ্টে পাল তুলিয়া দিয়াছে; কঙ্গরসের মোড়লী আর রামবাগানের 'বাবু'য়ানী এক সঙ্গে চালাইয়া বাহাদুরীর চরম দেখাইয়াছে! সেই ন'লে আসিয়াছে লেকের তীরে লবণ তৈরী করিতে! সঙ্গিনীটীকে দেখিবার জন্য মুখ বাড়াইলাম, ও হরি! সেদিনও যে ইহাকে সরস্বতী থিয়েটারের

কিন্নর-লোকে নীলোৎপলের কাছে শফরীর ন্যায় হুটোপুটি নাচিতে দেখিয়াছি। নেত্রকোণার নাম-ভাঁড়ানো রোহিনীকান্তের তারা দেখার কথা শুনিয়াছিলাম, সে তারা যে আস্‌মানে নব রূপে ফুটিয়া রহিয়াছে, তেমন একটু আভাসও যেন পাইয়াছিলাম। কিন্তু সে তারাটী যে এই ব্যালটগণের নব তারা, সেকথা তো কেহ বলিয়া দেয় নাই।

আমাকে বিস্মিত হইতে দেখিয়া ড্রাইভার আসিয়া আমার কানে কানে বলিল, এইটীই যে ন'লের হৃদয় গগণের "এক এবং অদ্বিতীয়" এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। বাগবাজার হইতে বৌবাজার পর্য্যন্ত গোটা চীৎপুর রোড ন'লে চষিয়া ফেলিয়াছে,—তবে এইটী অমুকবাবুর ভাগ্নে কিছুদিন আগে ন'লের কাছ হইতে কাড়িয়া লইয়াছিল। সম্প্রতি একটী দিনের ছুটি পাইয়া বেচারী আসিয়া ডবল ভিজিটে ন'লের সহিত জুটিয়াছে।

আমাদের ন'লে চাঁদ লবণ তৈরী করিতে আসিয়া জুটিবে, এরূপ কল্পনাই করিতে পারি নাই, ফিরিয়া ফিরিয়া তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলাম—সেই ফিন্‌ফিনে কোঁচা, ফিনফিনে কামিজ, জড়ির চ্যাপটা পাড় পাৎলা উড়ুনী—নবনটবরের বেশ দেখিয়া আমার মনে হইল, জাতির জয়যাত্রার এই তো বেশ! মোটা চটের মতো খদ্দর পরিয়া আমরা জাতির দৈন্যটাকেই বহির্জগতের কাছে প্রকট করিয়া তুলি—তাহার বদলে এইরূপ অভিসারের বেশ পরিয়া অভিযান করাইতে যুক্ততম। আর এক কথা, সমুদ্রতীরে বালুকার চরে দাঁড়াইয়া খড়কুটারের আগুনে লোহার কড়াইএ যে লবণের পাক, সে এক রকম আর কৃত্রিম লেকের তীরে শ্যামল দুর্ব্বাদলের ওপরে আমগাছের ছায়া তলে রসের চড়্‌কীর রসের পাকে যে লবণ তৈরী, সে আর এক কথা! রসের চড়্‌কীর রসের পাকে রসের ভিয়ান্ দিতে খদ্দরে পারে না।

ন'লে আর তার রঙ্গিনী মোটর হইতে নামিয়া কিছুদূর গিয়াছে;

ড্রাইভার মোটর ঘুরাইয়া ওপাশের নূতন লেক্‌টীর কিনাড়ায় রাখিয়া দিয়াছে। এমন সময় আর একখানি মোটর আসিয়া আগেরটী যেখানটীতে দাঁড়াইয়াছিল, ঠিক সেইখানটীতেই দাঁড়াইল। এ মোটর হইতে নামিল আমার পূর্ব্ব পরিচিত এক ছুঁচো মিত্র আর এক সধবা-গৌরবে ডবল-গৌরবিনী রূপসী। ছুঁচোটীকে যেমন প্রথম দর্শনেই চিনিতে পারিলাম, রূপসীটীকে তেমন পারিলাম না। ছুঁচো মিত্তির বাংলার সকলেরই কাছে পরিচিত—ব্রাহ্মণ দার হরণ করিয়া আনিয়া তাহার সহিত স্বামী-স্ত্রী ভাবে বাস করিতেছে এবং মাঝে মাঝে দেশ সেবার ভড়ং করিয়া আইনের বড় সভায় গিয়া যুবতী-বিবাহের ব্যবস্থা দিয়া সমাজ-সংস্কারের বাহাদুরী লইতেছে। আইন-সভায় কমিটীর মারফতে অনেক টাকা রোজ-গার করিয়া সে সেই টাকায় বালীগঞ্জে বাড়ী তৈয়ারী আরম্ভ করিয়াছে। বাড়ী তৈয়ারী এখনো শেষ হয় নাই বলিয়াই আইন সভা ছাড়িয়া আসিয়া আবার দেশ সেবার ভড়ং লইতে সে পারে নাই। যাহা হউক সম্প্রতি তো সে গিরি-রাজকন্যা উমা সহ লেকের তীরে লবণ তৈয়ারী করিতে আসিয়াছে! গান্ধী তো আজ বাদে কাল গ্রেপ্তার হইবেনই—তাঁহার অনুপস্থিতিতে লবণ তৈয়ারী ভার গ্রহণ ইহারা করিতে পারিবে, ভাবিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল!

আর একখানি মোটরে আসিয়া নামিলেন কুমার ডাগ্‌দার ইহুদী-প্রিয় এবং—এবং—হরি! হরি! নাম করিতে পারিতেছি না—এক-বারে ইঙ্গিত মাত্র করিতে গিয়া আধা লাখী ধাক্কায় প্রায় পড়িতেছিলাম; ভাগ্যিস গজাননচন্দ্রের টুর্ণী ফার্ম্মে কাগজ পত্রের দু'এক টুক্‌রা অবশিষ্ট ছিল, তাই সে যাত্রা রেহাই পাইয়াছি! ঈঙ্গিত করিলে আদালতের ঠেলা পাইব না, এটা বুঝিতেছি; কিন্তু "মাতৃজাতির অবমাননা" বলিয়া মাতৃত্ব-বিরোধী এই সকল সেমি-পাব্‌লিক্ মহিলাদের একদল

অভিভক্তের ধাক্কা কিছু আসিয়া গায়ে লাগিতেও পারে! কলিকাতার খোলা পার্কে কোন্ দেশ হিতৈষিণী কাহার সহিত লবণ তৈরীর সত্যাগ্রহ করিতে গিয়াছিল, তাহারি রিপোর্ট করিতে গিয়া এই সে দিনও এক সাংবাদিককে যে নাকালটা হইতে হইল! কাজেই কুমার ডাগ্‌দারের স্ব-গোত্র পত্নী উচ্চশিক্ষিত রঙ্গিনীর পরিচয়ের আভাস মাত্রও দিয়া লেকের তীরে এই অভিনব সত্যাগ্রহের জন্য প্রশংসার ভাগটী কেবল মাত্র ডাগ্‌দার সাহেবকেই দেওয়া গেল।

ডাগ্‌দার সাহেবের সঙ্গিনীর নয়ন ভুলানো চোখ দু'টী বেশ উৎফুল্ল—পাব্‌লিক পার্কের বক্তৃতাকালে খুদিরাম, কানাই লাল প্রভৃতি নাম উচ্চারণ করিতে গিয়া বক্তৃতাকারিণীর চোখ যেমন উৎফুল্ল হইয়া ওঠে—নারী সেনানিবাসে বসিয়া শত্রুবিজয় সংবাদ পাইয়া প্রধান সেনানায়িকার চোখ যেমন উৎফুল্ল হইয়া ওঠে—স্বামীকে সতীত্বের সার্টিফিকেট রূপে ব্যবহার করিয়া বহু পরিচর্য্যাকারিণীর চোখ যেমন উৎফুল্ল হইয়া উঠে—তেমনি উৎফুল্ল! আর ডাগ্‌দারও সমান উৎফুল্ল কারণ লবণ তৈরী বাহাদুরী লইবার এ সুযোগ উপস্থিত না হইলে তাঁহাকে কঙ্করসের চতুর্ব্বর্গ মধ্যে অবজ্ঞার অতল তলেই নিমজ্জিত থাকিতে হইত।

আরো দু'একখানা করিয়া মোটর আসিতে লাগিল, কুমারী দুর্জ্জয়ময়ী আসিলেন, কুচ্‌বিহারের কুচবরণ কন্যা আসিলেন, কুমারী লীলাময়ী আসিলেন, এবং সর্ব্বশেষে আসিলেন আমাদের রামপুরী গোসাইজী। লেকের এ লবণ-সংগ্রামে গোসাইজী উপস্থিত না থাকিলে সংগ্রাম সম্পূর্ণ হইবে না এইরূপ একটা আশাঙ্কায় বুকটা আমার দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিতেছিল; গোসাইজীর পেছনে অর্দ্ধরাজকন্যা পূনর্ভূ মিস্ রমণকুশলাকে দেখিয়া সে আশঙ্কা দূর হইল। অনেক ডোবা-পুকুর, খাল বিল, নদী-নালা দেখিয়াছি; কিন্তু তুলসী-মন্দার যেখানে মন্থন-দণ্ড রূপে ব্যবহৃত,

ইম্পীরীয়েল ব্যাঙ্কের জগত-প্রসারী চেক-বাসুকী যেখানে মন্থন-রজ্জু সেখানে এরূপ সাগর নহিলে চলে কি ?

অতঃপর লবণ তৈয়েরীর আসল ব্যাপার। কি করিয়া যে কি হইবে, তাহার অনেকটা আঁচ করিয়া লইতে পারিয়াছিলাম ; তাই চুপ করিয়া এক পাশে সরিয়া রহিলাম। দু'এক মিনিটের মধ্যেই ঐক্যতান বাদন সুরু হইল—অনেক ঐক্যতান শুনিয়াছি ; কিন্তু লেক-তীরের মানবী কণ্ঠনিস্থতঃ সেই ঐক্যতান এবং তাহার সাথে সাথে শ্লথোদর পুরুষের ঢক্কানিনাদ এমনি উৎসাহ চলিতেছিল যে, বাংলার গবর্ণর স্যার ষ্ট্যান্‌লী জ্যাকসন যদি ঐ সময়ে লাটবাড়ীর অন্দরে না থাকিয়া কোনগতিকে লেকের তীরে উপস্থিত হইতেন, তাহা হইলে ঐক্যতানের বহর দেখিয়াই আতঙ্কিত হইয়া তিনি দেশ ছাড়িয়া পালাইবার উদ্যোগ করিতেন।

ঐক্যতান থামিল। মন্দার-মন্থনে লবণ-সিন্ধু হইতে লবণরাশি উত্থিত হইল। ভারতের ভাবী স্বরাজ প্রতিষ্ঠার গোড়া পত্তন শেষ করিয়া দিয়া বীরেন্দ্রাণীগণ সহ বীরেন্দ্রবৃন্দ লেকের জল সন্নিকটে উপনীত হইলেন। সহসা বরুণদেব চঞ্চল হইয়া উঠিলেন—বুকে তরঙ্গ উঠিল। বীরেন্দ্র ও বীরেন্দ্রাণীগণ গিয়া আবার মোটরে উঠিলেন ; উঠিয়া হস্তপদ প্রসারণ পূর্ব্বক নিমিলীত নয়ন পড়িয়া রহিলেন! মোটর আবার তাহাদের লইয়' পুরা বেগে ছুটিল ?

অগ্নী সাধনের পট্‌কাবাজীতে যাহা হয় নাই, ননকো-অপারেশনের দেশব্যাপী হৈ চৈর ফলে যাহা সম্ভাবিত হয় নাই, গান্ধীর লবণ-যুদ্ধে পর্য্যন্ত যাহা সূচিত হইতেছে না, দেশ মাতৃকার বীর্য্যবান সুসন্তানগণের এই লবণ-সিন্ধু মন্থনের পরিণামে কি তাহা মিলিবে না ? যদি তাহা না মিলে, তাহা হইলে সত্যকে এবং সত্যাগ্রহকে ধিক্—গান্ধীর লবণের স্কীম্‌কে ধিক্ এবং সর্ব্বোপরি দেশসেবার ঝক্‌মারীকে ধিক্ ! !

সহরবাবাদের জাগরণ

ভোটের সমর আসিছে মস্ত,
এই তো সময় অতি প্রশস্ত,
সহরের ভাবী বাবারা জাগে,
উঠিয়া পড়িয়া সকলে লাগে।
এ মহানগরী কলিকাতা
অ-ফোটা ডিম্ব কে দিবে তা ?
তাইতো হঠাৎ জাগিয়া উঠেছে
সহরের যত ভাবী বাবা!

'Vote for অমুক' দেয়ালের পরে
প্লাকার্ড কতই বিরাজ করে—
কেহ ডাক্তার পেসেণ্ট-মারা
নব-ব্যারীষ্টার কেহ ব্রীফ্-ছাড়া—
কেহ জোচ্চুরীর Advocate
মূর্ত্তিমন্ত যেন সে Threat !
চেম্বারে চলে বুক ফুলাইয়া
কোর্টে ঢুকিতে মাথাটী হেঁট।

দিস্তা দিস্তা কাগজ ভরিয়া
সদিচ্ছা যত উজার করিয়া

Menifesto কত না ছাপে ;
ভোট ক্যান্‌ভাস করে বীরদাপে !
মুন্সীপালেতে আসন দাও—
আকাশের চাঁদ ভূতলে নাও—
চৌরঙ্গী আর চীৎপুরে দেব
সমান করিয়া আর কি চাও ?

কোথা দাড়ি নাড়ি কহে ভেটারাণ—
মশাই, আমারে ভোট দিয়ে যান্ ;
কর্পোর কামধেনুটী দুহিয়া
কত মধু নিছি দু'হাতে লুটিয়া
পয়সা বুকের কলিজা আমার
নাম নে' যে গৃহে হাঁড়ি ফাটে তার
দু'হাজারে স্বরাজীর ছাপ নিছি
দশ হাজার আদায় হবে এবার !

কেহ কহে মোর দাও যদি ভোট
জলেতে ভাসিতে কহি মোটামোট।
টালার ট্যাঙ্কে মাছ জিয়াইয়া
পাইপের সাথে দিব পাঠাইয়া—
ভেজিটেবেলের সস্তা ঘি
কোঅপারেটিভে করি বিক্রী
সুবিধা করিয়া দেব বহুৎ
আমার মহিমা বুঝেছো কি ?

কেহ কহে আমি মুন্সীপালে
গিয়ে কি করিব শুন তা হ'লে—
পার্কে পার্কে করি মস্‌জিদ্
নব্য-ইস্‌লামের গাঁথিব ভিত্
বাজারে বাজারে গোরস্থান
থুব্‌ড়ো swindlerএর বাড়াবো মান ;
গলিতে গলিতে কাঁচা চাম্‌ড়ার
খুলিব নূতন দোকান খান।
কেহ কহে, পেশা—অবলা-বিকানো
তারি জোরে ভোট চাহি তা জানো ?
রাধাবাজারের ফিরিঙ্গী যত
তাদের জোগাব গণ্ডা কত—
আরো চীৎপুর অঞ্চল-বাসিনী
জোগায়ে কয়েক শতেক কামিনী—
তবু চীৎপাৎ হইলাম শেষ
কত দুখ্ ঘটে ছিল না জানি।

কেহ কহে মোর এক ভাই আর
দুইটী ভাইপো রয়েছে বেকার ;
ভাইএর বেনামে কণ্ট্রাক্ট কিছুর
অর্থাগম যায় হয় সুপ্রচুর—
ভাইপো দু'টীর চাকুরী দু'টী
যদি বা বরাতে যায় সে জুটি !
তারি তরে যাব মুন্সীপালেতে
ফাটিলে ভাগ্যে ভোটের ফুটী।

পেয়ে ভোট তারা যায় পালে পাল
মুন্সীপালেতে তাল ও বেতাল !
গৌরী সেনের দেদার টাকা
দু'হাতে লুটিয়া করিছে ফাঁকা ;
হিসাব চাহিতে মার মুখ হয়
যা মুখে আসে তা জোর করে কয়
সহরবাবার জাগরণ দিনে
City-fatherএর গাওরে জয় ! !

বারীণদার পুতুল নাচ

এক

বছর কুড়ি আগের কথা।

ভারতের—তথা নব্য বাংলার পলিটিকাল্-incarnation বারীণ্‌দা তখন মানিকতলার বস্তীতে বসিয়া নারিকেলের মালার মধ্যে ভারতের রাজনৈতিক ব্যাধির নতুন পেটেণ্ট্ বারুদ ঠাসিতেছিলেন আর মাঝে মাঝে লোটা কম্বল লইয়া বাহির হইয়া ভারত-মাতার সূতিকা দূর করিবার জন্য ঝার-ফুঁকে ওস্তাদ একটা ফকীর বা সন্ন্যাসী খুঁজিতে বেড়াইতেছিলেন।

সাধু-টাধু একটা কিছু যোগার করিতে পারিলেন না—অগত্যা ভুঁই-পট্‌কার ফুস্ মন্তরে নিজে কাজটা সারিয়া লইতে গেলেন। ফলে পড়িলেন ধরা ; কারখানা শুদ্ধ সটান তাঁহাদের তুলিয়া লইয়া পুলিশ রাখিয়া দিল প্রেসিডেন্সী জেলের সেল ঘরে !

দুই

বারীণ্‌দা আর তাঁর সঙ্গীরা জেলের উচু দেয়ালের মধ্যে বসিয়া দিন গণিতেছেন ! কেহ বলিতেছে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সাধ্য কি আমাদের আট্‌কাইয়া রাখে ? কেহ বলিতেছে, অরবিন্দবাবু যোগসাধনে জানিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহারা মুক্তি পাইবেন ! কেহ বীরদর্পে মরণের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

আমাদের বারীণ্‌দা ?

বারীণ্‌দার কথা উপেনবাবুর (শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের) লেখা বইএ পাই এই যে, বারীণ্‌দাই নিজেদের সব কথা পুলিশের কাছে বলিয়া দেন। কারণ ? উপেনবাবুই তাঁহার নির্ব্বাসিতের আত্মকথায় বলিয়াছেন—পুলিশের কথায় বারীণ্‌দার বিশ্বাস হইয়াছিল যে, অপরাধ স্বীকার করিলে শাস্তি কম হইবে !

পুলিশের কাছে ঘরের কথা ব্যক্ত করিল দুই'জনে। একজনের বরাতে ঘটিল মৃত্যু—আর একজন যে আদুরে গোপাল, সেই আদুরে গোপাল হইয়া রহিলেন ! এক যাত্রায় এই যে পৃথক ফল, ইহার কৈফিয়ৎ নাকি এই যে, বারীণ্‌দা দলের সর্ব্বনাশ সাধন করিলেও বন্ধু ভাবেই করিয়াছেন ! তা ছাড়া বারীণ্‌দা বারীণ্‌দা—অরবিন্দ বাবুর ছোট ভাই ! বারীণ্‌দার অপরাধের গুরুত্ব কতখানি, তাহার কতক আভাস দিয়াছেন উপেন-দা তাঁহার 'নির্ব্বাসিতের আত্মকথায়' এবং তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন শ্রীযুত হেমচন্দ্র কানুনগুই—স্বয়ং বারীণ্‌দা যাঁহাকে ঝুনো হেম-দা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন—তাঁর 'বাংলার বিপ্লব-প্রচেষ্টা' গ্রন্থে ! দু'খানি বই-এতেই স্পষ্টভাবে লেখা হইয়াছে যে, বারীণের স্বীকারোক্তি মামলা খারাপ করিয়া দিয়াছে। তবু নরেন গোঁসাই আর বারীণ্‌দার তফাৎ কত !

মতো মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে আর কট্ মট্ চোখে অসহযোগের রুদ্র ধ্যানমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া দুর্ব্বাসার দৃষ্টিতে তাহাকে ধ্বংস করিতে চাহিতেছে।

বারীণ-দা তখন আবার সন্নাশী। কালাপানির লোণা জল তাঁহার মধ্যে যা-কিছু সৎ, সকলকেই নাশ করিয়া দিয়া কেবল ক্ষ্যাপামীটুকু রাখিয়া দিয়াছে! কিন্তু পট্কার সার্টিফিকেটে বারীণ-দা বারীণ-দা; এই 'আল্লোপনিষদের' দেশে তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া নূতন Gospel তৈরী করিবার মতো লোকের অভাব হইল না। কিছুদিন বীর-দাপটে গান্ধী-সংহার মন্ত্র চালাইয়া অবশেষে বারীণ্দা আর একবার পটল তুলিলেন।

তিন

বাংলা দেশের অতি-বুদ্ধি স্তাবক দলের স্তবস্তুতিতে যখন একটু ভাঁটি পড়ে, বারীণ্-দা তখন ছোটেন পণ্ডিচারীতে। বাংলাদেশের কবি লিখিয়াছিলেন—

বিকশিত বিশ্ববাসনার
আরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতিলঘুভার!

শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচারীর যে গূঢ় সাধনলোকে পাদপদ্ম রাখিয়াছেন, তাহাই যে বিকশিত-বিশ্ব-বাসনার মধ্যস্থল! বাংলার গীত-মৃণালের যুগল পদ্ম **শ্রীদিলীপ** এবং **শ্রীসাহানা** আপনাদের গূঢ় সাধনার জন্য এই স্থানটীকেই নির্ব্বাচিত করিয়াছেন; **শ্রীঅনলবরণ** এইস্থান-টীকেই আপনার চরকা-নিধন স্বপ্নের বিলাসলীলাভূমি করিয়া তুলিয়াছেন; **শ্রীসুরেশ** এখানে বসিয়াই একশো নারীর বস্ত্রহরণ করিতেছেন এবং বারীণ্-দা—ওরফে **শ্রীবারীণ্** এখান হইতেই মেয়েদের বখাইবার গূঢ় তথ্য শিক্ষা করিয়াছেন!

ইহা পণ্ডিচারীর জল ও মাটীরই গুণ, কি নরনারীর রহস্যময় সাধন-ভূমি অরবিন্দ-আশ্রমেরই গুণ—তাহার সবিশেষ বর্ণনা আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধির প্রেরিত বিস্তৃত-বিবরণী হাতের কাছে আসিয়া পৌঁছিবার আগে দিতে পারিতেছি না! আজ বারীণ্দার পুতুল-নাচটুকু পর্য্যন্তই থাক্।

বারীণ্দা যদি শিষ্য-পর্য্যায়ভুক্তই হইতেন, তাহাহইলে হয়তো পণ্ডী-চারীতে কিছুদিন টিকিয়া থাকিতে পারিতেন! কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের ছোটভাই হইয়াও যে বারীণ-দা বারীণ্দা, পট্কা-যুগের ক্ষুদে গুরু—আজ অরবিন্দ-মার্কা চুল ও অরবিন্দ-মার্কা দাড়ি রাখিয়া পুরাপুরি গুরু বনিয়া গিয়াছেন—বখামির সঙ্গে গুরুগিরিও তাঁর চাই—তাই ভারতে যখন আর একবার গান্ধী-যুগের প্রবর্ত্তন, তখন বাংলার বুকে বসিয়া তাহারি নিন্দা-কুৎসার পুতুল নাচ নাচিতে বারীণ্-দার Incernation!

অবতার মাত্রেরই ভক্তমণ্ডলী আসিয়া জুটে। নবাবতার শ্রীবারীণ্ প্রথমে শ্রীমতী নবশক্তি ও শ্রীমতী বঙ্গবাণীর স্কন্ধে ভর করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন—শীঘ্রই তাঁহার বাহিকা শ্রীমতী বিজলী বখামীর সবটুকু লক্ষণ লইয়া দেখা দিবে। শুনা যাইতেছে, এই বিজলীর পুতুল- বাজীর নৃত্যচক্রে তিনজন পুরুষ এবং তিনজন রমণী যোগদান করিয়াছেন। ভালো কথা!

বিদায়-অভিসার

প্রণয়-দেবতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তুলারাম ব্রহ্মগোত্রগুরু দর্প সিংহের কন্যা রমণকুশলার নিকট হইতে কামকলা শিখিয়া লইয়া দেশে বিদেশে পরিভ্রমণ করিয়া রমণ-নৈপুণ্য দ্বারা দর্পদুহিতা রমণকুশলার মনো-রঞ্জন পূর্ব্বক কুশলার ভর্ত্তা কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া প্রচুর অর্থে তাঁহার সন্তোষ-বিধান করতঃ স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রমণকুশলার নিকট হইতে বিদায়কালীন ব্যাপার পরে বিবৃত হইল।

তুল। দেহ আজ্ঞা হে রমণী, নিজগৃহে দাস
করিবে প্রয়াণ। আজি পরদারবাস
আয়ত্ত আমার। আশীর্ব্বাদ কর মোরে
যে বিদ্যা করিনু চর্চ্চা এতদিন ধরে,
তাহার প্রয়োগ তরে যখন তখন
পাই নব নাগরিকা তোমারি মতন
রমণ-নিপুণা।

রম। মনোরথ পূরিয়াছে,
পেয়েছ বছর দুই মোরে তব কাছে—
যার তরে নগেন্দ্রের দুঃসাধ্য সাধনা
ব্যর্থ আজো। আর কিছু নাহি কি কামনা
ভেবে দেখ মনে মনে!

তুল। আর কিছু নাহি।

রম। কিছু নাই? তবু আরবার দেখ চাহি

বিমন্থিয়া পরস্ত্রীর যৌবন-জলধি
এতটুকু অতৃপ্তিও থাক কোথা যদি।

তুল। আজি পূর্ণ কৃতার্থ জীবন। কোন ঠাঁই
ভোগাকাঙ্ক্ষা মাঝে কোন অতৃপ্তিই নাই
মনোরমে।

রম। তুমি সুখী জগতের মাঝে।
যাও তবে তব ঘরে আপনার কাজে
দেশ-সেবা গৌরব বহিয়া। দেশ জুড়ে
উঠিবে ধিক্কার-ধ্বনি? অতি উচ্চ সুরে
তব অর্থে পুষ্ট দুই স্বরাজ্যোরঢাক
তুলিয়া তোমার ছবি কী বিপুল জাঁক
করিবে তোমারে লয়ে! পুনঃ নেতা হবে
অর্থ-পণ্যে কিনি লবে নেতৃত্ব-গৌরবে।
যাও বন্ধু, কি হইবে মিথ্যা কাল নাশি
উৎকণ্ঠিত তব লাগি অর্থ অভিলাষী
বঙ্গের স্বরাজ্য-গোষ্ঠী।
যেতেছ চলিয়া?
সকলি সমাপ্ত হ'ল দু'কথা বলিয়া?
দীর্ঘ দুই বর্ষ পরে এই কি বিদায়?

তুল। বল প্রিয়ে, কি আমার অপরাধ?

রম। হায়!
সুন্দরী প্যারীর স্মৃতি একটী বছর
দিয়েছে স্বামীরে মোর মরণ-কামড়—
নির্জ্জন হোটেল কক্ষে শুধু তুমি আমি

কত স্বপ্নে, কত গানে দিবস-যামিনী
কাম কলা-বিলাসের ললিত-লীলায়
কাটাইয়া দিছি কত সৌন্দর্য্য-চর্চ্চায়
মাস মাস ধরে হায় ! আজি তাহা স্মরি
ব্যথিয়া ওঠে না হিয়া ?

তুল। কহি সত্য করি
জীবনের সেই শ্রেষ্ঠ বর্ষ বলি জানি
সেথা মোর নবজন্মলাভ। হে কামিনী !
তারপরে নাহি অনাদর।

রম। দেখ ভেবে
হোটেল-ডি-প্যারীসেতে কী মহাগৌরবে
রয়েছি দু'জনে। রাত্রি আসিতে ঘনায়ে
অত্যধিক মদ্যপানে ক্লান্ত তব কায়ে
রহিতে পড়িয়া তুমি যেথানে সেথানে,
আমি সখা বাহিরিয়া অন্য কারু সনে
বহুরাত্রি বেড়াইয়া গভীর নিশীথ
আসি মিলিতাম পুনঃ তোমার সহিত।
প্যারীশের থিয়েটার, সিনেমা চষিয়া
নৈশ ক্লাব একে একে তাও পরীক্ষিয়া
দেখিয়াছি। হায় আজি স্মৃতিটুকু তার
হৃদয়ের এক কোণ করে অধিকার।
দণ্ড যা দিয়েছো সখা দুই দণ্ড থাক
স্বরাজ্যের কোন ক্ষতি তায় হবে নাক' ॥

তুল। জানি তাহা। কিন্তু বন্ধু, বিদায়ের ক্ষণে

বাঁধিবারে চায় যারা পূর্ব্ব বন্ধুগণে
পলাতক নাগরেরে আকড়িয়া ধরে
ব্যগ্র বাহু প্রসারিয়া আগ্রহের ভরে
নূতন বন্ধনজাল, নূতন মিনতি
সৌন্দর্য্যের প্রদর্শনী রূপের বেশাতী
তায় নাহি আকর্ষণ ! করি নমস্কার।
কত পান্থ যৌবনের ছায়ায় তোমার
বসিবে আসিয়া দেবী আমারি মতন
প্রেমে ও লালসা ভোগে তুষি অনুক্ষণ !

রম। মনে রেখো আমাদের সুইজারল্যাণ্ডের
সেই মধু রাত্রিগুলি মহা আনন্দের ;
ভুলো না তাহায় !

তুল। রবে গাঁথা মনে
সুইজারল্যাণ্ডের গিরি-শৃঙ্গে তব সনে
ফিরিয়াছি দীর্ঘদিন ! পরিতৃপ্তি ভরে
স্বেচ্ছামত করি ভোগ—দেহতট পরে
শরীরের সব দৃপ্তি সবটুকু বল
দিনে দিনে উপহার দিয়াছি সকল !
ভাবি নাই কভু মনে তার শেষ গিয়ে
হবে এত বিষময়—দু'হাতে ছড়ায়ে
দিয়েছি যে সুবিপুল অর্থ তব পায়ে,
বুঝি নাই দিতে হবে আক্কেল সেলামী
স্বামীরে তোমার আরো ।

রম। আর তিরস্কার
কোরো না আমায় প্রিয়।

তুলসী সেঁক ভুলিবার ?
যে চঞ্চলমতি তার যৌবনে ভুলায়ে ?
কাংস্য কণ্ঠে, শ্লথ বক্ষে ছলা কলা দিয়ে
আসিলা সম্মুখে মম মায়াবিনী সম
সদা ক্ষিপ্র গতি, প্রবাস-সঙ্গিনী মম
মূর্ত্তিমতী কামকলা !

রম। হায় ! সে প্রবাসে
আরো কোন মূর্ত্তি তার দেখ নাই পাশে ?
একেবারে অন্ধ ?

তুল। চিরজীবনের সনে
তার মূর্ত্তি গাঁথা হয়ে গেছে।

রম। আছে মনে
যেদিন প্রথম মোরা গিয়া শিম্‌লায়
পৌঁছিলাম স্বামী-স্ত্রী তোমার বাসায়—
চঞ্চল আঁখিটী মোর খুঁজি চারিদিক
তব আঁখিতলে গিয়া মিশে গেল ঠিক
মনে মনে আত্মদান তোমা করিলাম
উৎসর্জ্জিনু এই দেহ বঙ্কিম সুঠাম
সেই রাত্রে, কয়েক ঘণ্টার অতিথিরে
অসঙ্কোচে আমি !

তুলসী ! নিশি দ্বিপ্রহরে
ফিতা-বাঁধা বব্‌ড্‌ কেশে পরি রাত্রিবাস

অর্দ্ধনগ্ন মূর্ত্তিখানি মনে পড়ে আজ
আপনি ধরিয়াছিলে অর্ঘ্য যৌবনের
পরিতৃপ্তি সাধিবারে আমার ভোগের।
উৎকণ্ঠিত আমি কহিনু করি মিনতি
বৃথায় যৌবন নহে, দেহ অনুমতি
ধরিব হৃদয়ে তোমা।

রম। আমি সবিস্ময়
একরাত্রে পাইলাম তব পরিচয়।
সুরসিক তুমি ; বুঝিলাম অযোগ্যেরে
আত্মদান করি নাই অদৃষ্টের ফেরে ;
রতনে রতন চিনে—

তুল। শঙ্কা ছিল মনে
পাছে তব স্বামী সব জানিয়া গোপনে
লয়ে যায় দূরে।

রম। দূর ! সে হতভাগার
এতখানি বুদ্ধি যদি, পত্নী কেন তার
ঘাটে ঘাটে ভাসাইবে যৌবনের তরী ?
পরদিন কহিলাম তার হাতে ধরি,
তোমার বন্ধুর সনে যাব আগ্রায়
তাজমহলে কাটাইব পূর্ণ চন্দ্রিমায়।
তারপর আগ্রায় তোমার সহিতে
যাপিলাম দুই নিশি।

তুল। অয়ি সুচয়িতে !
মনে আছে সব। তুমি স্বামীরে তোমার

পৌঁছাইয়া দিয়া তার আফিসের দ্বার
আমার ভবনে চলি আসিতে হে প্রিয়া
নিত্য সে মোটর লয়ে তারে ফাঁকী দিয়া ॥
ঈর্ষাভরে তিনবার দেখায়েছে ভয়—
'উহারে ভজিলে আর মোর গৃহে নয়!'
মনে আছে সে সকল। আরো অর্থ চাই?
নিতে পারো।

রম। অর্থ? হায়! অর্থে স্পৃহা নাই।
আনন্দ যদ্যপি কিছু কোনো শুভক্ষণে
দিয়ে থাকি, আজি শুধু তাই কর মনে।
যদি কোন সন্ধ্যাবেলা প্যারীর হোটেলে
আনন্দের লেশ মাত্র তুমি কোনো কালে
পেয়ে থাক, তাই আজি করহ স্মরণ
অভিনব স্বপ্নলোক করিয়া সৃজন
দিয়ে যদি থাকি আমি, বন্ধু, তাই স্মর—
আমি চির-সঙ্গিনী তোমার।

তুল। ক্ষমা কর
মিটিয়াছে সব সাধ।

রম। মিটিয়াছে? সোক?
এত শীঘ্র কেমনে মিটিল বল দেখি?
তব প্রেম তৃষা জানি অসীম—অপার
কত নদ-নদী মধ্যে দিয়াছ সাঁতার,
ঢলকে ঢলকে কত করিয়াছ পান
নারীর যৌবন-সুরা। তোমা আত্মদান

করিয়াছে কত নারী অর্থে তব বশ,
প্রচারিত লোকে লোকে—বরষ বরষ
যুগল-ফরাসী কন্যা সহিত কাশ্মীরে
যাও তুমি বিচরিতে ঝিলামের তীরে!
সেই তব তৃষা মিটে গেল!

তুল। শুচিস্মিতে,
নিত্য নব আস্বাদন-তৃষা মিটাইতে
একা তুমি পারিবে কেমনে?

রম। কেন নহে?
আমার লাগিয়া স্বামী কত দুঃখ সহে!
সিংহের নন্দিনী আমি অন্য কেহ নই
প্রেমেরে যাচিনি কভু—ভিক্ষা দেওয়া বই—
বিলাতে জনক সহ ছিলাম যখন
আমার যৌবন তরে প্রলুব্ধ তখন
খাটি শ্বেতাঙ্গের দল জুটিত আসিয়ে
জোটে যথা মাতালেরা ভাটিখানা পেয়ে।
আমার গতর-তরী করিয়া সহায়
কতজনে সুখ-নদী পাড়ি দেছে হায়!
তুমি কি বুঝিবে তার? কি দুর্ব্বুদ্ধি হ'ল
ভ্রান্ত মম মন তোমা পাশে বাঁধা প'ল—
মানিল না স্বামী-স্নেহ, পিতার গৌরব,
আপত্য স্নেহের স্নিগ্ধ মাধুরী-সৌরভ!
এখনও ফিরাও মন। সরল সাহসে
বল, নাহি চাহি সখি ধন, মান, যশে—

মনোরমে, তুমি শুধু সিদ্ধি মূর্ত্তিমতী
দশ পুরুষেরে ভজি একাদশে সতী—
তোমারেই বরিলাম। রমণীর মন
এমনি মহার্ঘ সখা, সাধনার ধন!

তুল। অর্থ দ্বারা কিনেছিনু, করিয়াছি ভোগ
আজি অর্থ নিঃশেষিত। কেন এই শোক
তব নারী? যাও, নব-নাগর সংগ্রহ
করি তারে লয়ে তুমি আনন্দেতে রহ
তোমারে না চাহি আজি।

রম। ধিক্ মিথ্যাভাষী!
শুধু অর্থে কিনেছিলে? কোনদিন আসি
প্রেম-সম্ভাষণ মোরে করনি নির্জ্জনে?
দূরে রাখি পলিটিক্স নেতৃত্ব-সাধনে
একান্তে আসিয়া কাছে কভু কি বলনি
তোমারে এ বসুধার শ্রেষ্ঠ ধন জানি—
রাজ্য রাজা, ঐশ্বর্য্যের বিপুল ভাণ্ডার
সমুদ্রের রত্ন নহে উপমা তোমার,
তুমি ইষ্ট দেবী মোর? দেহ নিয়েছিলে
নিতে শুধু তাই—কেন মন মজাইলে?
আমারে করিয়া বশ পিতার সম্মান
লুটাতে ধূলার পরে এই অভিযান
তব বন্ধু? আজি তাহে কৃতকার্য্য হয়ে
স্বগৃহে ফিরিবে শুধু অর্থ কিছু দিয়ে
আমার স্বামীরে—মোর সতীত্বের দাম!

তুমি তো চলিয়া যাবে, মোর কিবা হবে
মুহূর্ত্তের তরে তাহা দেখেছো কি ভেবে
একবার?

তুল। বিপথগামিনী অয়ি নারী!
তব ভবিষ্যৎ ভাবি যাই তোমা ছাড়ি।
একজন গেলে পুনঃ দশজন পাবে;
নিত্য নব নাগরেরে কটাক্ষে ভুলাবে।
কি বলিছ? তোমা ভালবাসি কিনা আজ
সে তর্কে কি ফল? তব ছিল যাহা কাজ
তুমি তা সেধেছ। এবে বিদায় আমারে
দাও অয়ি প্রীতিময়ী আজি একেবারে।
ক্ষম অপরাধ।

রম। ক্ষমা কোথা মনে মোর
হয়েছে এ নারী-চিত্ত কুলিশ-কঠোর
হে গোস্বামী! তুমি যাবে স্বরাজ্যের লোকে
সগৌরবে, আপনার বিজয় পুলকে
জীবনের সর্ব্বলজ্জা করি পরাহত;
আমার কি আছে কাজ, কি আমার ব্রত?
আমার এ কলঙ্কিত নিষ্ফল জীবন
কি রহিল, কিসের গৌরব? এ যৌবন—
কেমনে যাপিব জনে জনে অন্বেষিয়া
স্বামী-ত্যক্তা গৃহহীনা! দিলে প্রবঞ্চিয়া
মাতৃত্ব-গৌরবে মোর। ভ্রাতারা বিরূপ;
মাতা—সেও মোর পরে রাগান্বিতা খুব;

সন্তান আমারে দেখি ফিরাইবে আঁখি—
বসে রব নতশিরে নিঃসঙ্গ একাকী
সহস্র স্মৃতির কাঁটা বিঁধিবে নিষ্ঠুর
লুকায়ে বক্ষের তলে লজ্জা অতিক্রুর
বারম্বার করিবে দংশন। ধিক্ ধিক্ !
কোথা হ'তে এলে তুমি নির্ম্মম পথিক !
বসি মোর যৌবনের মধুচ্ছায়া তলে
কামকলা বিদ্যা শুধু শিখিবার ছলে
এসেছিলে মোর পাশে ! আজিকে তোমায়
এই মোর অভিশাপ—ভুলায়ে আমায়
যেই বিদ্যা শিখে গেলে ব্যাধির প্রকোপে
প্রয়োগ করিতে তায় না পারিয়া ক্ষোভে
মরিবে বক্ষেতে লয়ে উদ্দাম বাসনা
যৌবনেতে জরাগ্রস্ত—অতৃপ্ত কামনা !
তুল। আমি বর দিনু নারী, তুমি সুখী হবে
ভুলে যাবে সর্ব্বগ্লানি নূতন-সৌরভে।

সাহিত্য ও অসাহিত্য

পোড়াবাজারের সাহিত্য-সম্মিলনীতে রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতির ব্যাপারটা কবি নিজেই মিটিতে দিতে চাহিতেছেন না! বরোদা হইতে ফিরিয়া আসিয়া কবিবর বঙ্গবাণীর মারফতে বাহির করিলেন এক বিবৃতি সম্মিলনীর কর্ত্তাদের উপরে বিলক্ষণ আক্রোশ দেখাইয়া। তারপর সম্মিলনীতে অ-পঠিত অভিভাষণ বিচিত্রা-সম্পাদকের কাছে পাঠাইবার সময়ে আপনার মনের ভাব হুবহু ব্যক্ত করিয়া সম্পাদকের কাছে যে চিঠি লিখিলেন, সম্পাদক-মহাশয় রবীন্দ্রনাথ দ্বারা সম্ভাষিত হইবার গৌরবটুকু জাহির করিবার জন্য ভালোমন্দ বিবেচনা না করিয়া চিঠিটা আগাগোড়া ছাপাইয়া দিয়া রবীন্দ্রনাথকে বাংলার সুধী-সমাজের কাছে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিলেন। আমরা ঐ চিঠির কতকাংশ এখানে তুলিয়া দিতেছি—

"কল্যাণীয়েষু—

সম্ভাষণটা অনেক দুঃখের লেখা।...যমদূতকে উপেক্ষা করে কোনো-মতে লিখেচি.....যমদূত দয়া করে ক্ষমা করলে কিন্তু বাংলা দেশের সভা-পাষাণী ভ্রুকুটী করেই রইলো।

তারপর লেখাটা নিয়ে সভায় যা খুসী তাই হ'ল,—প্রায় দুঃশাসন-দ্রৌপদীর ব্যাপার।

আজকাল বলপূর্ব্বক ধর্ষিতা নারীও সমাজে ফেরে, আমার লেখার বেলাই কি সেই সম্ভাবনা নেই ?.....

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

আমরা এ সম্বন্ধে আমাদের মতামত কিছু প্রকাশ করিব না। আমাদের শিল্পী-বন্ধু "দ্রৌপদী-দুঃশাসন সংবাদ" নামে পত্রানুরূপ ভাবের

একখানি আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন। পাঠকগণের সকাশে তাহাই উপহার দিয়া আমরা ক্ষান্ত রহিলাম।

চৈত্রমাসের প্রবাসীতে রাজা রামমোহন রায়ের মুসলমান উপপত্নী সম্বন্ধে আর এক দফা আলোচনা হইয়া গিয়াছে। আলোচনায় এবারে প্রবাসী-সম্পাদকে নিজেও যোগদান করিয়াছেন এবং ঐ আলোচনায় সম্পাদক মহাশয় 'যদি ইহা সত্য হয় যে, রামমোহনের এক মুসলমান নারীর সহিত সম্বন্ধ ছিল' 'যদি তিনি মুসলমানীর সংসর্গ করিয়া থাকেন' প্রভৃতি উক্তিতে রামমোহনের সহিত মুসলমানীর সম্পর্ক স্বীকার করিয়াছেন!

প্রবাসী-সম্পাদকের ইংরাজী বা অন্যান্য ভাষার শব্দের বাংলা বানান-প্রণালী চিরদিন বেশ একটু বিশেষত্বপূর্ণ। আর-সকলে যাহা লিখে, তিনি তাহার অতিরিক্ত কিছু করিবেনই! জহরলালকে জবাহরলাল লিখিয়া তিনি প্রায় হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিয়াছেন। Civil disobedienceকে সিবিল ডিসোবীডিয়েন্স, পাতিওয়ালাকে পাটিওয়ালা, সম্বর হ্রদকে সম্ভর, মিষ্টারকে মিস্‌টার, ইম্পীরিয়্যাল.....আর কত বলিব? ইনি যখন মহাত্মা গান্ধীকে শ্রীযুত মোহনদাস করমচাঁদ বা মোহনদাস করমচাঁদ মহাশয় বলিয়া লিখিতেন, তখন গান্ধী না লিখিয়া গন্ধী লিখিতেন। আজকাল মহাত্মা পদবীটার সঙ্গে সঙ্গে আকারটীও স্বীকার করিয়া লইয়াছেন!

চৈত্রের প্রবাসীতে শ্রীযুক্তা সীতা দেবীর উপন্যাস মহামায়ার একটী পরিচ্ছেদ। গ্রাম্য হিন্দু বালিকা মায়া ব্রাহ্ম-পরিবারে ঢুকিয়া 'মহামায়া' হইয়াছে—চালচলনের সঙ্গে চেহারায়ও কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, আগেকার চেয়ে রোগা এবং লম্বা হইয়াছে! রোগা হইবার কৈফিয়ৎ লেখিকা কিছু দেন নাই; কেবল জানাইয়াছেন, জ্যেঠামশায়ের ছেলে অজয় আসিয়া জোটাতে তাহার সঙ্গীর অভাব দূর হইয়া গেল। এই অজয় বয়সে মায়ার চেয়ে কয়েকমাসের ছোট, সেই কয় মাসের খাতিরেই সে মায়াকে 'মেজদি' বলিয়া ডাকে। লেখিকা গোড়া-পত্তনটা করিয়া রাখিলেন ভালো!

মায়ার ব্রাহ্মিকা বন্ধু বাণী—অনূঢ়া। তার ভাবী বরটী বিলাতে। এবারের মেলে চিঠির কত বড় প্যাকেট গেল, মায়া বাণীকে এই প্রশ্ন করিতে বাণী উত্তর করিল—

তোমাদের মত অত আমরা সাহেব নই বাপু যে বিয়ের আগেই দিস্তা দিস্তা চিঠি লিখ্‌ব। নেহাৎ কালেভদ্রে কখনও লিখি।

বিবাহের আগে ভাবী পতিকে দিস্তা দিস্তা চিঠি না লিখিয়া কালেভদ্রে লেখাটা সাহেবিয়ানা না হইলেও ব্রহ্মীয়ানা তো বটে!

চৈত্র মাসের ভারতবর্ষের ছোট একটী গল্প—'নাম'। গল্পের গোড়ায় 'চা'-পান রত তিন বন্ধুর বর্ণনা দিতে গিয়া লেখক আধুনিক সাহিত্যিক-দের একটী সুন্দর ছবি দিয়াছেন—

সুনীল গদী-আঁটা চেয়ারটাতে বসিয়া ছবি ভরা এক বিলাতী ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাইতেছে। টিপয়ের ওপাশে প্রতুল "শেষের কবিতা"

লইয়া এতই ব্যস্ত যে, এই বিরল গল্প-গুজবেও যোগ দিতে পারিতেছে না। মণীন্দ্র রঙীন বেড্-কভার-ঢাকা বিছানার একপাশে বসিয়া ব্রাউনিনিঙের কাব্য পড়িতে পড়িতে বিরল কথাবার্ত্তার জোগান দিতেছে!

লেখক একটী কথার উল্লেখ করিতে ভুল করিয়াছেন। চতুর্থ ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিল এবং সেই চতুর্থটী রাইটিং প্যাডের পাতার একপিঠে 'পার্কার' কলমে বাংলা মাসিকের জন্য প্লটহীন একটী গল্প লিখিতেছিল!

চৈত্রের ভারতবর্ষেরই সুলিখিত একটী গল্প শ্রীযুত প্রবোধ-কুমার সান্ন্যালের লেখা—আমরণ! যতীন আর পদ্মা বিবাহ না করিয়াও পরস্পরের সহিত স্বামী-স্ত্রী ভাবে বাস করিতেছে এবং প্রেমকে বিবাহের দৈন্যের কাছে আনমিত করিবে না, এই সঙ্কল্প করিয়া দুঃখ-দুর্দ্দশার আঘাত ক্রমাগত বরণ করিতেছে। এই আদর্শ প্রেমিক-প্রেমিকা জীবনে সকল দুঃখকেই বরণ করিয়াছেন, পারেন নাই কেবল বিবাহের ক্লেশটাকে স্বীকার করিতে। তাঁহাদের একজন ব্রাহ্মণ আর একজন কায়স্থ। কিন্তু সিভিল ম্যারেজ্ এ্যাক্ট এবং ব্রাহ্ম-সমাজ তো ছিল। তবে হাঁ—পদ্মা যদি যতীনের সঙ্গে মিলনের আগেই হস্তান্তরিতা হইয়া থাকে এবং সেই হস্তান্তর ব্যাপারটা যদি হিন্দু-বিবাহ মতে সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহাহইলে অন্য কথা। গল্পটী পড়িয়া আমাদের এক মিত্রজাকে মনে পড়িল!

বিচিত্রার বিচিত্র কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষ ওমর্ খৈয়ামের রুবাইয়াৎ অনুদিত করিয়া মহাকবি পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছিলেন, এবারে রুৎবাইয়াৎ-ই হাফেজিয়ানার পদ্যানুবাদ করিয়া মহাকবির উপরে উঠিলেন নিশ্চয়।

বিচিত্রার পৃষ্ঠায় তাঁহার হাফেজিয়ানা যে ভঙ্গীতে ছাপা হইতেছে, মাসিকের পৃষ্ঠায় ততটুকু সম্মান একমাত্র বিচিত্রাই একবার রবীন্দ্রনাথের রচনাকে দিয়াছিলেন। তুল্য সম্মান পাইতেছেন কান্তিচন্দ্র। বিচিত্রার বিচিত্র গগণে মুড়ী-মিছড়ীর এক দর দেখিতেছি। এবারে কান্তিচন্দ্রের মুন্সীয়ানায় হাফেজিয়ানা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে দেখুন—

অলকছায়ে ফুটছে তোমার গুল্‌বদনের জ্যোতি
অধর তোমার লুকিয়ে রাখে সাগর ছ্যাঁচা ম্যোতি;

হাফেজের মূল কাব্যে কি লেখা রহিয়াছে জানি না, সুতরাং গুল্‌বদনের জ্যোতি বিকীরণ জন্য কান্তিচন্দ্রকে দোষী করিতে পারি না; কিন্তু সাগরকে হামাল দিস্তায় ছেঁচিয়া যে 'সাগর-ছ্যাঁচা মোতি' তৈয়েরী হয়, এ নূতন বার্ত্তাটী নিশ্চয় কান্তিচন্দ্রের—হাফেজের নয়। হাফেজ বাংলায় লিখিলে অবশ্যই 'সাগর-সেচা মোতি' লিখিতেন।

শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় ফাল্গুনের বিচিত্রায় রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীর বর্ণনা দিতে গিয়া সেখানকার ছাত্র-ছাত্রার সহযোগিতা সম্বন্ধে যে গুটী কয়েক লাইন লিখিয়াছেন, আমরা পাঠকদের সেই লাইন কয়েকটী উপহার দিতেছি—

সেকালের নালন্দা ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয় শুধু পুরুষদের ছিল, তাই ভারতবর্ষের চিত্তকে তাঁরা অধিকার কর্‌তে পারেন নি! শান্তিনিকেতনের গুরুপত্নী ও গুরুকন্যাদেরকে প্রথম থেকেই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অঙ্গ জ্ঞান করা হ'য়েছে। ক্রমশঃ তাঁদের নিয়ে গুরুপল্লী গড়ে ওঠ। তারপর শিষ্যানীদের দ্বার খুলে দেওয়া হয় (সত্যি না কি ?)। স্ত্রীশক্তির আনুকূল্য না পেলে কোনো বড় জিনিষ বাড়্‌তে পারে না (অবশ্যই জন-সংখ্যাও নয়)।

স্ত্রীরা কিছু করুন না করুন, কেবলমাত্র নেপথ্যে উপস্থিত থাকলেও পুরুষ কাজ কর্‌বার দম পায় (বটে ?)! **স্ত্রীপুরুষের মিলিত কীর্ত্তি হ'য়ে শান্তিনিকেতন সরস হয়ে উঠেছে!**

সত্য কথা।

অন্নদাশঙ্করের ঐ প্রবন্ধেই এমনি ধারা সরস কথা আরো আছে। 'শান্তি-নিকেতনের ছেলে-মেয়েদের গায়ে গাছের পাতা খসে পড়ে ও হাতের কাছে প্রজাপতি ওড়ে।' তবু ভালো প্রজাপতি হইয়া তারা উড়িতে যায় না! অন্নদাশঙ্কর সেখানকায় ছেলেদের সব চেয়ে বড় সার্টিফিকেট যাহা দিয়াছেন তাহা হইতেছে এই যে—'শান্তি-নিকেতনের ছেলেরা একেবারে বর্ব্বর নয়'। একেবারে বর্ব্বর নয়, কিছু তো! এ হেন সার্টিফিকেট পেয়ে সেখানকার ছেলেরা অবশ্যই একবার তরুণ হাকিমটীকে নিমন্ত্রণ করে সেখানে নিয়ে গিয়ে গেষ্ট হাউসের দোতলায় রেখে ইউরোপীয় রসুই-এ রান্না-করা শ্রীনিকেতন পোল্‌ট্রির মুর্গীর কোর্ম্মা খাওয়াবে।

বাংলার যুগান্তকারী ঔপন্যাসিক শ্রীযুত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' প্রবাসীর বুকে 'অপরাজিত' রূপে দেখা দিয়াছে। একই পাত্রপাত্রী লইয়া ক্রমাগত প্রতিদিনের নাওয়া, খাওয়া, খেলা, উৎসব, পড়াশুনা প্রভৃতির একঘেয়ে বর্ণনা দ্বারা মাসিকের পাতা বাড়াইয়া কি লাভ হয় বুঝিতে পারি না। বিচিত্রার পৃষ্ঠায় 'পথের পাঁচালী' আমরা যতটা পড়িয়াছি এবং প্রবাসীর অঙ্কে 'অপরাজিত' যতটা পড়িতেছি, ভাবহীন বৈচিত্র্যহীন ছবির পর ছবিই মাত্র দেখিতেছি। এইরূপ

জীবন-কাহিনী শ্রীকান্তে ভালো ফুটিয়াছে, তাহার কারণ শ্রীকান্তের এক এক খণ্ডে কয়েকটী করিয়া নূতন নূতন চরিত্রের মধ্য দিয়া শরৎবাবুর প্রতিভা বিকশিত হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের এক ক্ষুদ্র অংশে যাহা আছে, বিভূতিভূষণের সমস্ত একত্র করিলেও তাহা হয় কি?

একটী ষোলো সতেরো বৎসর বয়সী অনূঢ়া কন্যা আর তার সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কীয় একটী যুবক। দু'জনে অদৃষ্ট কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া পাড়াগাঁয়ে একই গৃহে এক সঙ্গে বাস করিতেছে। ঠিক এমনি ঘটনা লইয়া শ্রীযুত বিশ্বপতি চৌধুরী তাঁহার ঘূর্ণির ঘূর্ণিপাকে আমাদের ঘুরাইয়া লইয়াছেন। মনে করিয়াছিলাম, বিশ্বপতিবাবুকেও বুঝি তারুণ্যের ঘূর্ণিপাকে পাইয়াছে। কিন্তু হরি হরি! দু'পাতা উল্টাইতেই দেখি, লেখক সংযমের বাতিক আমদানী করিয়া আধুনিক আর্টকে রাম-বনবাস পাঠাইয়াছেন! ষোড়শী পাতানো বোন্‌টীর চোখে-মুখে কামনার আগুন জ্বলিতে দেখিয়া এবং স্পষ্ট প্রেম-নিবেদন শুনিয়াও এই cousin-শিকারের দিনে বাংলার কোনো তরুণ সামলাইয়া থাকে!. বিশ্বপতিবাবু ভালো নভেলিষ্ট হইলে ঐ দাদাটীর সঙ্গে সঙ্গে বাংলার অনেক তরুণ দাদার চিত্তে আগুন ধরাইয়া দিয়া তবে ছাড়িতেন!

ময়মনসিংহের গীতি-কথা "মহুয়া"র ল্যাজামুড়া বাদ দিয়া খোল-নৈচে দুই-ই বদ্‌লাইয়া একাঙ্ক-কথানাট্য-লেখক শ্রীহীন মন্মথ রায় এম্‌-এ একখানি নাটক রচনা করিয়াছেন—কলিকাতার কোনো থিয়েটারে 'মহাসমারোহে' উহার অভিনয়ও হইতেছে। এই বইখানির ভূমিকায় লেখক মূল গল্পের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রায়-বাহাদুর ডি-লিট্‌ দীনেশবাবুকে অজস্র ধন্যবাদ দিয়া আপনাকে কৃত-কৃতার্থ করিয়াছেন!

অথচ ময়মনসিংহ-গাথার সংগ্রহকর্ত্তা শ্রীযুত চন্দ্রকুমার দের নামটী পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। মন্মথবাবু নিজকে টাঙ্গাইলের অধিবাসীর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। লোকে তাহা বিশ্বাস করিবে কি ?

———

অশ্লীল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া "জীবনের আলো" সম্পাদক অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন; কিন্তু Sex Psy-cholgy লইয়া সাহিত্য-সৃষ্টির বিরাম নাই। পুষ্পপাত্র-সম্পাদক শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী কিছু দিন আগে "দাম্পত্য রহস্য" লিখিয়া 'কলেজের ছাত্রগণকে' উপহার দিয়াছিলেন। এবারে "রমণী-রহস্যের" মারফতে "নারী-জীবনের সমুদয় রহস্য পাঠকদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া" দিয়া তিনি Sex-বিশেষজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছেন! আমরা বাংলা দেশের আর একজন Sex-Psy-cholgy লেখককে জানি, যাঁহার পুত্র-সন্তান জন্মাইবার উপায় সম্বন্ধীয় ভূরি ভূরি প্রবন্ধ ব্যর্থ করিয়া দিয়া তাঁহার পত্নী বৎসর বৎসর কন্যা-সন্তান প্রসব করিতেছেন!

———

Printed and Published by Keshab Sen at the Vidyodoy Press.
16/1/A Beadon Street, Calcutta.

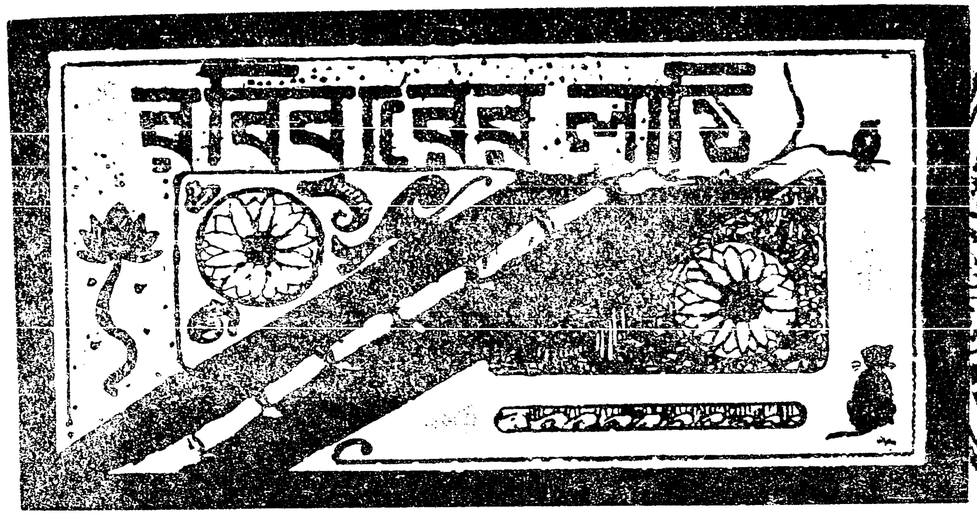

প্রথম বর্ষ] ১৩৩৬ [তৃতীয় সংখ্যা

সাহিত্যে যৌনবাদ

লজ্জা মানবতার একটা সম্পদ; পরন্তু সৌন্দর্য্যও বটে। লজ্জা নীতি নহে। মানুষকে পশু হইতে প্রভেদ করিয়াছে এই লজ্জায়। উলঙ্গতা এবং পশুত্ব সম পদবীর। ধর্ম্মের দিক হইতে নীতির প্রয়োজনীয়তা যতখানি, লজ্জার দিক দিয়াও ঠিক ততখানি। সেই জন্যই যৌনবাদের কথা আলোচনা করিতে লজ্জিত হইতেছি।

কিন্তু গত্যন্তর নাই, পশুধর্ম্মী যৌনজীবী একান্ত কামাতুর হইয়া বাণীমন্দিরকে বেশ্যালয় করিয়া তুলিয়াছে। কথায় বলে "খোঁড়ার পা খালে পড়ে"; আমাদের হইয়াছে তাহাই। বাহিরে পররাষ্ট্রের শাসন-পীড়া, ঘরে কামমোহিত অজাযুথের উপদ্রব। জাতি মরণোন্মুখ; ধন-দৌলত গিয়াছে, শক্তি-সামর্থ্য গিয়াছে, যশঃমহিমাও অস্তায়মান,—বাকী ছিল চরিত্রের মাধুর্য্য, কামনা ও চিন্তার সৌষ্ঠব। তথাকথিত সাহিত্যিকদের দুর্বুদ্ধি ও দুরাচারে তাহাও যায়। জাতীয় মহিমার শেষ রশ্মিরেখা একদল কামাতুর পিশাচের ফুৎকারে বুঝিবা নিভিয়া যায়!

সৌন্দর্য্য কথাটার বড়ই প্রচলন হইয়ছে, কথায় কথায় শুনি আর্ট। কিন্তু এ আর্টের পরিমাপক যন্ত্র (Standard) নাই। যাহার যাহা ভাল লাগে, তাহাই আর্ট। এ আর্ট বা সৌন্দর্য্য-বোধ শূকরীবৃত্তি (Pig-satisfaction)—শূকরী যেমন পঙ্ক লইয়া মজিয়া থাকে, অতি-আধুনিক আর্ট-পন্থীরাও তেমনি জঘন্য যৌন-ব্যভিচারের চিন্তায় মজিয়া থাকেন।

সাহিত্যে যৌনবাদের প্রয়োজন আছে কিনা এমন প্রশ্নও কোথাও উঠিয়াছে। আসঙ্গ-লিপ্সা জীবধর্ম্ম। প্রাণের স্পন্দন যেখানে আছে, সেইখানেই আছে নরনারীর মিলন প্রচেষ্টা। কোথায়ও ইহা অধিক মাত্রায় আছে, আবার কোথায় আছে অল্প। আবার প্রাণীতে প্রাণীতেও প্রভেদ আছে। সিংহ শার্দ্দুল অন্য ইতর পশুর অপেক্ষা অল্প কামাতুর। অপর লক্ষ লক্ষ জীব-জগতের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি মানুষ, তাহার মধ্যে যৌন-ক্ষুধা দুর্ব্বার হইয়া থাকিলেও উহা আছে গোপন হইয়া—একটা নিকৃষ্ট বৃত্তির পর্য্যায়ভুক্ত এবং সংযমিত হইয়া।

আরও অগ্রসর হইয়া চলি। জাতির রাষ্ট্রীয় মুক্তি-কামনায় তুমি চলিয়াছ; অন্যত্র একজন সেই জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের মাহেন্দ্রক্ষণে বেশ্যার ঝাঁটা লাথি খাইয়া দিন কাটাইতেছে। একের কাছে জাতির স্বাধীনতা শ্রেয়ঃ, অন্যের কাছে বেশ্যার পদাঘাতই শ্রেয়ঃ। সৌন্দর্য্য কোনটা? কোন্ চিত্তবৃত্তি আর্টের শ্রেণী-ভুক্ত হইবার উপযুক্ত? মানব-মনের চিরন্তন সম্পদ করিতে আঁকিয়া রাখিবে কোন্ চিত্রটী?

মানুষ স্ত্রী-পরিবার লইয়া সংসার করে। যৌন আকর্ষণ তাহার আছে এবং থাকিবেও! পশুরও উহা আছে। কিন্তু পশু যেমন ঐ নিম্নবৃত্তির তাড়নায় উন্মাদবৎ আকৃষ্ট হয়, মনুষ্যকেও কি সেই স্তরে নামাইয়া ফেলিতে হইবে?

যৌন-তাড়না কি করিয়া বর্ত্তমান সাহিত্যে প্রবেশ করিল, তাহারও একটা ইতিহাস দিতে হইবে। তথাকথিত তারুণ্যের উপদ্রব এই যৌনবাদ মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক। পাশ্চাত্য দেশে বিগত বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্রের পর যখন একটা প্রতিক্রিয়ামূলক মনোবৃত্তির উৎপত্তি হইল, ঠিক তাহার পর হইতেই পাশ্চাত্য জাতির ভিতর এই যৌন আকর্ষণের গতি বেগ বাড়িয়া উঠিল। এখানে পাশ্চত্য-সাহিত্যের বিচার করিতেছি না, দাস-বুদ্ধি (Slave-mentality) প্রণোদিত হইয়াই যৌন-কদর্য্যতা আমদানী করিয়াছি।

এই দাস-বুদ্ধি বহুদিনের। বাঙ্গালী কবি বাঙ্গালী সাহিত্যিকের পরিচয়ে বলিয়াছি বাংলার স্কট, বাংলার শেলী, কাহাকেও বলিয়াছি বাঙ্গালার সেক্সপীয়র। এ তুলনা কেন করিয়াছি জানিনা, অপ্রবুদ্ধ মনোবৃত্তির কৈফিয়ৎ জানিতে চাহিও না।

এখন কথায় কথায় গোর্কির আলোচনা করি, হ্যাভ্‌লকের মতবাদ লইয়া মাতিয়া উঠি। কেন করি, কেন মাতি, তাহা বুঝিবার ও বুঝাইবার শক্তি নাই। যেহেতু পাশ্চাত্যের মতবাদ, সেই হেতুই উহা লইয়া মাতামাতি করি। ইহা দাস-মনোবৃত্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে।

যৌনবাদ সাহিত্যে থাকা উচিত কিনা, অথবা কতটুকু থাকা উচিত, তাহা বিচারের এখনো সময় হয় নাই। কেননা আমাদের চিত্তবৃত্তি অত্যন্ত অসুস্থ; পরন্তু অধোগতি-প্রবণ। "পোঁটা চন্নণীর ব্যাটা চন্দন-বিলাসা" বলিয়া একটা বাঙলা প্রবাদ আছে; যৌনপন্থী সাহিত্যিকদেরও হইয়াছে সেই অবস্থা। যে জাতি বা যাহাদের বিশ্বের রাজসভায় নিত্য অবমানিত হইতে হইতেছে, যাহাদের পর-উচ্ছিষ্ট 'এটো কাঁটা' ছাড়া দুইবেলা দুই মুঠা শাক ভাতও জোটে না, যাহাদের মা, বোন বিধর্ম্মীর দ্বারা অপহৃতা ও নিত্য ধর্ষিতা হইতেছে, যাহাদের ললাটে

দাসত্বের কলঙ্ক-ললাটীকা, তাহারা কোন্ লজ্জায় নীলাম্বরী আঁচলের দোদুল দোলনে দুলিয়া থাকে? রতিরাগের প্রমত্ততায় মাতিয়া থাকিতে তাহাদের হারা হয় না? অপমান-নির্য্যাতনের কলঙ্ক-তিলক আঁকিয়া তরুণীর গোলাপী গণ্ডের লালিমায় মুগ্ধ হইতে লজ্জা হয় না?

সাহিত্য সৌন্দর্য্য, আর্ট, কলা, কাব্যরস এ সবের আলোচনা পরে করিব। আগে অজাবৃত্তি তারুণ্যের সহিত একটা বোঝাপাড়া করি। তারুণ্য, তারুণ্য, তারুণ্য!—কিসের তারুণ্য? বিশ্বের এই রাজসূয় যজ্ঞে কোন্ মন্ত্র পাঠ করিয়াছ? ঋত্বিক, হোতা, উদ্‌গাতা—কাহার ব্রত গ্রহণ করিয়াছ? কয়টা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিয়াছ? কয়খানা ডেষ্ট্রয়ার ড্রেড্‌সট গঠনের প্রচেষ্টা করিয়াছ? জাতির ধনভাণ্ডার বৃদ্ধি করিতে কি সাধনা আরম্ভ করিয়াছ এবং সিদ্ধ হইয়াছ? বিশ্বের বন্দরে বন্দরে হে তরুণ! হে অজাবুদ্ধি অপোগণ্ড তোমার কয়খানি বাণিজ্যপোত পাল তুলিয়া লক্ষ্মীআহরণে যাত্রা করিবার আয়োজন করিয়াছে?

অবমানিত, উৎপীড়িত ক্ষুধাতুর,—ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া লাখ টাকার স্বপ্ন দেখিতেছ। আজ যদি বাংলায় তেমন তেজস্বিণী মেয়ে থাকিত, তবে বাঁ' পার লাথিতে তোমার তারুণ্যের মোহ মুছাইয়া দিত। ঘরে লাথি ঝাঁটা খাইয়া নির্লজ্জ, নির্ব্বুদ্ধি তুমি, তাই তারুণ্যের লাম্য, রঙ্গের মত, যৌন আকর্ষণে বিভোর হও! বাঁচিতে পার, বাঁচার মত বাঁচিতে পার, বিজয়ী হইয়া বাঁচিতে পার, তবে সৌন্দর্য্যের কথা কহিও, তখন তোমার সুখ- সৌন্দর্য্য ভোগের অধিকার জন্মিবে! তাহার আগে দাসত্বের শৃঙ্খল কণ্ঠে জড়াইয়া যাহা করিবে, করিতে চাহিবে, তোমার পক্ষে অসীম লজ্জাজনক হইবে।

"চোরের মন পুঁই পাঁদারে" বলিয়া একটা কথা আছে জান কি? জাননা; জানিলে মল্লিকা, চম্পক, যুঁথির বদলে 'চোর কাঁটা' ছড়াইতে

না। শ্বেত-চন্দনের পরিবর্ত্তে 'পঙ্ক-তিলক' আঁকিয়া ধেই ধেই নৃত্য করিতে না। "গৃহদাহ করিতে করিতে অধীর হইত না। নিত্য নব-নারী-চিত্ত জয়ের 'অজয়' উল্লাসে অধীর হইতে না!

তারুণ্যই চাই বটে! কিন্তু তাহা তরুণীর অঞ্চল-তলে নহে! বিলাস-শয্যার উপভোগে নহে। তারুণ্যের প্রদীপ্ত প্রাণই চাহিতেছি দারিদ্রের দূরীকরণে, পরাধীনতার বন্ধনপাশ মোচনে। নব-শিল্প সংরচনে নব-ভাস্কর্য্য পরিকল্পনে। আর চাহিতেছি—নবীন মহাভারত সৃষ্টির মহাব্রত সাধনায়! পারিবে কি? পারিলে তা'র অভিনন্দন জানাইতেছি!

সাহিত্যে যৌনবাদের প্রয়োজন আছে কিনা, ইহার উত্তরে বলিতেছি, শূকরের যেমন বিষ্ঠার প্রয়োজন হয়, শৃগাল কুক্কুরের যেমন গলিত মাংসের প্রয়োজন হয়, কৃমিকুলের যেমন দুর্গন্ধ পয়ঃপানীতে প্রয়োজন হয়,—এক শ্রেণীর মানব-পশুরও তেমনি শুধু দৈহিক ভোগে হয় না, মন দিয়াও আসঙ্গ-লিপ্সা মিটাইতে চায়। স্বামী বিবেকানন্দ ইহাদের 'যোনিকীট' বলিয়াছেন।

সাহিত্যে যৌনবাদ মনুষ্যত্বের পরিবাদ। ইহা আলোচনার অযোগ্য। ভ্রমচিত্ত সভ্য মানুষ যেমন পশুর মত উলঙ্গ হইয়া থাকিতে পারে না, তেমনি যৌন-ভাবনাও তাহাদের পরিত্যাজ্য। সংসারে বহু চিন্তা, বহু কল্পনা, বহু আদর্শের অবকাশ রহিয়াছে, মানুষ সেই সব দিকেই তাহার সাহিত্য-চেষ্টাকে নিয়োজিত করিবে। ভদ্র-সমাজে যেমন লাম্পট্যের স্থান নাই, সাহিত্যেও তেমনি মিথুনাশক্তির প্রবেশ নিষেধ।

পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। সাহিত্যে যে যৌনি-মত্ততা আসিয়াছে, তাহার মূলে যে শুধুই সৌন্দর্য্য-পিপাসা আছে, তাহা নহে; উহার গোড়ায় আছে 'পোড়া পেটের জ্বালা'। এ পোড়া দেশে, এ দাসরাজ্যে ক্লীব চিন্তাই বিকার! এখানে দুর্গাবতী, জিজাবাঈ, লক্ষ্মীবাঈর ঠাঁই নাই,

আছে কামান্ধা নায়িকার আদর! ইহারা আরাবল্লীর শিখরে শিখরে "তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছ দর্প" উন্নত শিরে বেড়াইতে পারে না, পারিবার মত মনুষ্যত্ব হারাইয়াছে। পারে চোরকাঁটার বনে পুত গতিতে করিত। সেই সুযোগে লইয়া অন্নমুষ্টির কাঙ্গাল কতগুলি জাতিদ্রোহী সাহিত্যে ব্যভিচারের বিষ ছড়াইয়া উদরান্ন সংস্থান করিতেছে। এই কদর্য্য প্রকৃতির সাহিত্যিকগণও পোড়া পেটের জন্য জাতিকে ক্লীবভাবে ভাবিত করে।

ইহাদের আর সমালোচনা করিব কি? যদি জাতির স্বাধীনতা থাকিত, তবে ঝাঁটাইয়া ইহাদের দেশ হইতে দূর করিতাম।

হিন্দুত্ব ও মানবধর্ম্ম

মানুষ যাহা ধারণ করিয়া থাকে, তাহাই তাহার ধর্ম্ম। এই হিসাবে মানুষের শারীরীক ও মানসিক উৎকর্ষ লাভের যাহা পথ, মানুষের মানবত্ব যাহা লইয়া গঠিত, তাহাই তাহার ধর্ম্ম। ধর্ম্মের কষ্টিপাথরও এখানেই —ধর্ম্মের হিসাবে মানুষের অস্তিত্ব যতই তাহার মানবধর্ম্মের ঘনিষ্ঠ হইবে, তাহার ধর্ম্মের ভিত্তিও ততই সুদৃঢ় বলিয়া বুঝা যাইবে।

মনীষি সক্রেটিশের বাণী ছিল—"Know thyself." হিন্দুধর্ম্মও হিন্দুকে এই উপদেশই দিয়াছে এবং এই উপদেশ তাহার ঋষির মুখে "আত্মানং বিদ্ধি" রূপে প্রচারিত হইয়াছে। এই "আত্মানং বিদ্ধি"র চেয়ে বড় উপদেশ কোন সত্যকার ধর্ম্মই কোন দিন দিতে পারে নাই—দিতে পারেও না। ঈশ্বর নয়, স্বর্গ নয়, ত্রেত্রিশ কোটী দেবতাও নয়—জানিতে হইবে আপনাকে—আপনার আত্মাকে—সৃষ্টির আদিম কাল হইতে মানবাত্মা যে মহাপরিণতির মধ্য দিয়া আসিয়াছে,—যুগে যুগে লোকে লোকে নব নব জন্ম ধারণ করিয়া নব নব রূপে প্রকট হইয়া, নব নব চিন্তাধারার আশ্রয় লইয়া, নব নব বার্ত্তা প্রচার করিয়া—তাহারই পরিচয় লইতে হইবে—বুঝিতে হইবে, ঈশ্বর তাহারই স্বরূপ, স্বর্গ তাহারই বাসস্থান, ধর্ম্ম তাহারই ক্রমবিকাশ, দেবতাবাদ তাহারই পরিণতি-পথের মূর্ত্তি এবং দর্শন-উপনিষদ বেদ-বেদান্ত তাহারই বিভূতি বর্ণনা। মানবাত্মার প্রতি এতখানি শ্রদ্ধা দেখাইতে পারিয়াছে বলিয়াই হিন্দুধর্ম্ম মহিমান্বিত।

কিন্তু প্রচলিত মত ইহার বিপরীত। হিন্দুর ধর্ম্মানুশাসন তাহার মানবত্বকে চাপিয়া রাখিয়াছে, মায়াবাদের বিষে জর্জ্জরিত করিয়া দিয়া তাহাকে "যা আছে তা নাই আর যা নাই তা আছে" ভাবিতে শিখাইয়াছে —এই কথা যেখানে সেখানে শুনিতে পাওয়া যায়। অনেকে এমন অনুযোগও করেন যে, হিন্দুধর্ম্মের মতো মানবাত্মার অবমাননাকারী ধর্ম্ম আর নাই! যাহাদের চিন্তাস্রোত গড্ডালিকা-প্রবাহের মধ্যে আত্মবিলোপ করিয়া বসিয়াছে, তাহাদের মুখে এরূপ উক্তি অসম্ভবও কিছু নয়, অপ্রত্যাশিতও নয়। কিন্তু যাঁহারা আপনাদিগকে চিন্তাশীল বলিয়া বড়াই করেন, তাঁহারাও যখন এরূপ উক্তি করিতে দ্বিধা করেন না, তখন তাহাই হয় বিস্ময়ের বিষয়!

হিন্দুর ধর্ম্মানুশাসনের মূলবস্তু যাহা, তাহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়; এক—ঈশ্বর ও অধ্যাত্মচিন্তা এবং দুই—মানুষের জীবনের বা মৃত্যুর পরের সংস্কারসমূহ। শেষেরটী যে পুরাপুরি মানবাত্মার অস্তিত্বে বা মানবধর্ম্মের উপরে ভিত্তি করিয়া গঠিত, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। প্রথমাংশও যে মানবধর্ম্মের অতিরিক্ত কিছুই নহে, আমরা তাহাই দেখাইব।

সীমাবদ্ধ, স্বল্পায়ু মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির অতীত—হিন্দুর উপনিষদকারের ভাষায় "অবাঙ্‌মানসগোচর" যে অপরিমেয় অদর্শনীয় অচিন্ত্যনীয় অসীম, হিন্দুদর্শন মতে তাহা শাশ্বত কালের মানবাত্মার তরঙ্গাভিঘাত-বিক্ষুব্ধ

এবং মানবাত্মার চরম পরিণতি উহাতেই। হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র হিন্দুকে ঐ মহাবস্তুর বিকাশরূপে আপনার কল্পনা করিতে শিখাইয়াছে এবং এই আত্মচিন্তার সোপানরূপে ঈশ্বর ও পারলৌকিক জগতের পরিকল্পনা করিয়াছে। হিন্দুর ধর্ম্মাচরণের মধ্যে দেবতাবাদ ও মূর্ত্তি পূজার ছড়াছড়ি দেখিয়া কাহারও কাহারও ঈশ্বর সম্বন্ধে হিন্দুর ধারণাকে সংকীর্ণ মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের মূলবস্তু যাঁহাদের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে তাঁহারা অবশ্যই একথা স্বীকার করিবেন যে, ঈশ্বর সম্বন্ধে হিন্দুর ধারণা ও বোধ সংকীর্ণ তো নয়ই, বরং এত উদার যে জগতের অন্যান্য ধর্ম্মের মতো হিন্দুধর্ম্ম Personisation of God বা ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা না করিয়া তৎস্থলে Personisation of man বা মানবত্বের প্রতিষ্ঠা করিবার ব্যবস্থা দিয়াছে এবং একাধিকস্থলে একথা বলিয়াছে যে, সকল রকম অধ্যাত্মচিন্তার মূলে কেবল মানুষের আত্মচিন্তা—তাহার চেয়ে বড় আর কিছু নাই, হইতে পারে না।

মানবত্বের এই যে মহাপ্রতিষ্ঠা, ইহা যে কেবল মানুষের আত্মারই, তাহা নহে। প্রতিদিবসের কর্ম্মের ও চিন্তার—স্বপ্নের ও বাস্তবের মানুষ যে, রক্তমাংসে গঠিত যাহার দেহ, আশা-নিরাশা সুখ-দুঃখে উচ্ছ্বসিত যাহার অন্তর, হিন্দুর ধর্ম্মানুশাসন তাহারও মহিমা কীর্ত্তনে পরাঙ্মুখ হয় নাই হিন্দুর পুরাণবর্ণিত কাহিনীর প্রত্যেকটীতে মানুষের মহিমা মুক্তকণ্ঠে কীর্ত্তিত হইয়াছে। সাধনার বলে মানুষ যে দেবত্বে বা ঈশ্বরত্বে পৌঁছিতে পারে, সত্যকার মানুষের সম্মুখে যে স্বয়ং ভগবানকেও অবনমিত হইতে হয়, মনুষ্যত্বের মহিমা এত উজ্জ্বল ভাবে আর কোন ধর্ম্মের অনুশাসনে কোন দিন লিপিবদ্ধ হইয়াছে কিনা জানি না।

যে সাধনার বলে মানুষ দেবতার চেয়েও শক্তিমান্ হইয়া উঠিতে পারে, তাহা যে কেবল যাগ যজ্ঞ ও তপস্যারই সাধনা নয়, পার্থিব ও

অপার্থিব সমুদয় শক্তিরই সাধনা—তাহারও দৃষ্টান্ত হিন্দুশাস্ত্রে রহিয়াছে। জগদ্বিখ্যাত বীরগণের প্রতি দেবতুল্য সম্মান প্রদর্শন করিয়া এবং বীর-পূজার প্রবর্ত্তন করিয়া হিন্দু মানবধর্ম্মের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

মনুষ্যজীবনের স্থূল অংশগুলি উপেক্ষা করিয়া কেবল মানবাত্মার সূক্ষ্ম তত্ত্বালোচনাই হিন্দুর প্রকৃতিগত অভ্যাস, এরূপ যাঁহারা বলেন, তাঁহারাও ভুল করিয়া থাকেন। ধর্ম্মকার্য্যের মধ্য দিয়া জীবনকে বড় করিয়া দেখিবার উপদেশ হিন্দুর স্বর্ম্মানুশাসনের সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। "শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্" "নাস্তি সেবাং পরো ধর্ম্মঃ" প্রভৃতি শাস্ত্র-বাক্য মানুষকে ধর্ম্মের চেয়ে বড় করিয়া দেখিতে শিক্ষা দেয়। তারপর ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারকালে বা পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান কালে মানুষের সহজ প্রবৃত্তিগুলির সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ স্থলে ছাড়-বাদও হিন্দুর ধর্ম্মই শিক্ষা দিয়াছে। কাম প্রভৃতি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রীত করিবার উপদেশও হিন্দুর ধর্ম্মানুশাসনেই রহিয়াছে।

তারপর সমাজতন্ত্র। সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা ব্যষ্টির জাগতিক কল্যাণের জন্য। এই সকল ব্যবস্থাকে ধর্ম্মানুশাসনের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত করিয়া হিন্দু মানব-ধর্ম্মের মহিমাই ঘোষণা করিয়াছে। বাংলার বৈষ্ণব কবি যে গাহিয়াছেন—

"শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।"

মানবত্বের এ মহিমা-গীতি হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়, পথভ্রষ্ট হিন্দুর অন্তরে পূর্ব্ব মহিমা জাগরণের স্মারকবাণী মাত্র।

মানবধর্ম্ম অর্থে কেবল মানবের ব্যক্তিত্বেরই ধর্ম্ম নয়, সমষ্টিগত ভাবে

মনুষ্যজাতির যাহা ধর্ম্ম, তাহাকেও আমরা মানবধর্ম্ম নামে অভিহিত করিয়া থাকি। হিন্দু এ হিসাবেও মানবধর্ম্মকে উপেক্ষা করে নাই—মনুষ্যজাতিকে সমষ্টিগত ভাবে দেখিয়া তাহারও কল্যাণ-সাধনে মানবকে নিয়োজিত করিয়াছে। প্রজাকে তাহার প্রজাধর্ম্ম, রাজাকে তাহার রাজধর্ম্ম, সামরিক শাসনকে আপদ্ধর্ম্ম পালন করিবার উপদেশ যেমন হিন্দুশাস্ত্রের সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়, সমগ্র মনুষ্যজাতির প্রতি মানবধর্ম্ম পালনের উপদেশও তেমনি সেখানে দুর্লভ নয়। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ভীষ্ম কর্ত্তৃক বিভিন্ন ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যার ব্যাপদেশে সমগ্র মনুষ্যজাতিকে মানবধর্ম্মের মহিমাও হিন্দু শাস্ত্রকার শুনাইয়াছেন; স্পষ্ট বলিয়াছেন—ব্যক্তিবিশেষের জীবনে যাহা অকল্যাণকর সমগ্র মনুষ্যজাতির স্বার্থরক্ষায় তাহা যদি অপরিহার্য্য হয়, তবে তদবলম্বনে পশ্চাৎপদ হওয়া অকর্ত্তব্য এবং ব্যক্তিগত জীবনে যাহা তোমাকে চরম শান্তি প্রদান করিবে, সমগ্র মানবজাতির শান্তি যদি তাহাতে ব্যহত হয়, তবে হাসিতে হাসিতে তাহা ত্যাগ করিবে।

আধুনিক সাহিত্য

সাহিত্য সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গেলে আজকাল লণ্ডভাঘাতের আশঙ্কা আছে। কারণ সাহিত্য-সমালোচনার জন্য প্রাণখোলা মেশামিশি, আজকালের যুবকগণের মধ্যে, ঘুষাঘুষিতে পরিণত হইয়াছে, এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। সাহিত্য সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গেলে প্রথমেই মনে হয়, এই পরমত-অসহিষ্ণুতা সাহিত্যের যতটা ক্ষতি করে এমন আর কিছুতেই করিতে পারে না। আমাদের শাস্ত্রকারগণের 'অধিকারীভেদ' কথাটা অতিশয় মূল্যবান। সাহিত্যের আলোচনাতেও এই কথাটার

সার্থকতা আমরা খুব দেখিতে পাই। তোমার ভাল লাগা বা না লাগা আমার ভাল লাগা বা না লাগার উপর নির্ভর করিবে, ইহা অপেক্ষা অসম্ভব আব্দার আর কিছু হইতে পারে বলিয়া আমার মনে হয় না। প্রত্যেক মানুষের রসবোধের ক্ষমতা এক প্রকার নহে, প্রত্যেক মানুষ একই রসে তৃপ্তি লাভ করে না, কাজেই অধিকাংশ সময়ে কবির বিশেষ কোন রসপুষ্টি একজনের প্রাণে ভাবের স্পন্দন তুলিতে পারে, আর একজনের প্রাণে তেমন পারে না। ইহা লইয়া বিরোধ করা চলে না। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা যখন যার যার প্রিয় লোকের লেখা লইয়া আলোচনা করিতে বসি, তখনই এই কথাটা আমাদের একেবারেই মনে থাকে না।

অবশ্য প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, এই হিসাবে বিচার করিতে গেলে কোন লেখাকেই খারাপ বলা চলিতে পারে না। কারণ কোন না কোন ব্যক্তির নিকট (অন্য কাহারও নাই হউক—অন্ততঃ যিনি লেখক তাঁহার এবং তাঁহার রসোবোধবিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট) সেই লেখা ভাল লাগিবেই লাগিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং সাহিত্য-সমালোচনা কথাটার কোন মূল্যই থাকে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, অতিবড় আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের নগ্ন চিত্র পর্য্যন্ত সর্ব্ব- প্রকারের লেখাই কোন শ্রেণীর লোকের প্রিয়। আধুনিক নব্য সাহিত্য নামে যাহা বাজারে চলিতেছে এবং যাহা বিদ্যাসুন্দরের নগ্ন চিত্রের উপরে অনেক স্থানে টেক্কা দিয়াছে—তাহারও নিন্দা করা চলে না, কারণ তাহাও অনেকেরই প্রিয়।

এই প্রশ্ন অবশ্যই সঙ্গত এবং এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলেই আমাদের ভাল লাগা না লাগার গণ্ডী হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া,

অন্য কোন অধিষ্ঠান ভূমি হইতে বিষয়টী দেখিতে হইবে। এই স্থলে একদল বলিবেন যে, সাহিত্য কথাটীর ধাতুগত অর্থ লইয়া বিচার করিলেই প্রকৃত সাহিত্যের স্বরূপ কি হওয়া উচিত তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। "সহিত" শব্দের উত্তর ভাবে "ষ" প্রত্যয় করিয়া "সাহিত্য" শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে। ব্যাপকার্থে সাহিত্য শব্দের অর্থ—"যাহাতে সাহিত্যের ভাব বর্ত্তমান।" সহিত কথাটী দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমতঃ সহ (সঙ্গে) ইত অর্থাৎ যাহা একত্রিত ভাবে গমন করে অর্থাৎ যাহাতে সঙ্গ বা সম্মিলনের ভাব বর্ত্তমান, তাহাই সাহিত্য এবং দ্বিতীয়তঃ সম্-হিত—যাহা হিতসংযুক্ত, হিতজনক, হিতসাধক তাহাই সাহিত্য। প্রথমতঃ কাব্যশাস্ত্র, কাব্য কবিতাদি রচনা, সাহিত্য বলিয়া কথিত হইত। কারণ অলঙ্কার, ব্যাকরণ, ছন্দাদির, "সহিত" তাহা পাঠনীয় ছিল। তারপর "সাহিত্য-মঙ্গল" গ্রন্থে আমরা ইহার ব্যাপক অর্থ দেখিতে পাই। কর্ম্মশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, বিয়োগশাস্ত্র, কাব্য, গণিত, জ্যোতিষ এই সাহিত্যগুলিও সাহিত্য -মঙ্গলাকার—সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে, যে সকল শাস্ত্র মানবজাতির কোন না কোন একার হিতসাধক, কেবল তাহাই "সাহিত্য-মঙ্গলাকারের" মতে "সাহিত্য" সংজ্ঞা পাইবার অধিকারী। ইংরাজী ভাষায় Literature কথাটীও এই প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হয়। সেখানেও Literature শব্দটীকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিয়া তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অথবা শ্রেণী হিসাবে Pure literature (বিশুদ্ধ সাহিত্য), Scientific literature (বৈজ্ঞানিক সাহিত্য), Historical literature (ঐতিহাসিক সাহিত্য), Religious literature (ধর্ম্ম সাহিত্য) ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সাহিত্য শব্দটির উপরোক্ত অর্থ স্বীকার করিয়া লইলে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে অবশ্যই কোন অসুবিধা হয় না। উপরোক্ত সংজ্ঞার—

"কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া যাহা খাঁটী মনে করিব, তাহার বাহিরে যাহা হইবে, তাহা ভাল লাগুক আর না লাগুক তাহাকে আমরা সাহিত্য সংজ্ঞা দিতে প্রস্তুত নই।" ইহাই একদল সাহিত্যিকের অভিমত।

আমি জানি যে, সাহিত্যের এই অর্থ অনেকে মানিতে চাহিবেন না। তাঁহারা ইহার উত্তরে বলিবেন যে, "তোমরা যাহাকে সাহিত্যের ব্যাপক অর্থ বলিতেছ, আমরা বলি সেই অর্থ করিলে সাহিত্যের সংজ্ঞাকে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ করা হয়, বিভিন্ন প্রকারের পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য দিয়া, মানুষের জীবনস্রোত প্রবাহিত হইতে হইতে যে সকল বিভিন্ন আকার ধারণ করে, এবং তাহার ফলে যে সকল বিভিন্ন প্রকারের চিন্তা ও বিভিন্ন প্রকারের অনুভূতি মানুষের প্রাণে জাগরিত হয়, তাহার রূপ যখন কবির লেখনী-সম্পাতে, ভাষায় প্রকাশিত হয় তখনি তাহার নাম হয় সাহিত্য। হিত অহিত আমরা বুঝিব না—জগতে কুৎসিৎ সুন্দর, হিতকর অহিতকর, ভালমন্দ সকল প্রকার জিনিষই আছে। সুতরাং বাস্তব সাহিত্যেও সর্ব্বপ্রকার চিত্রই থাকিবে। আমরা শুধু দেখিব কবি যে চিত্রই ফুটাইতে চাহিয়াছেন, তাহা ঠিকভাবে ফুটাইতে পরিয়াছেন কি না। যদি পারিয়া থাকেন তাহাই সাহিত্য, তাহাই আর্ট। শুধু যাহা হিতজনক সুন্দর শোভন তাহাই সাহিত্য থাকিবে—একথা বলিলে সাহিত্যের আসরকে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় পরিণত করা হয়—আমরা তাহাতে রাজী নই।" ইহাই অপর দলের অভিমত।

নানাপ্রকার ভাষার আড়ম্বরে এবং দেশী ও বিদেশী সাহিত্যের বহু মনস্বী লেখকের লেখা নজীর স্বরূপে উপস্থিত করিয়া যে সকল চোখা চোখা উত্তর-প্রত্যুত্তরে সাহিত্যের আসর আজকাল সরগরম করিয়া তোলা হইতেছে, তাহাতে মোটামুটি কথাটাই আমি আপনাদের নিকট সংক্ষেপে উপস্থিত করিলাম। এই দুই প্রকার বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে কোনটীর

সমর্থন করিয়া সেই দলপুষ্টি করা আমার অভিপ্রেত নয়। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতির মত মনস্বী লেখকগণ যে সম্বন্ধে খুব একটা সুচিন্তিত সুনির্দ্দিষ্ট মত প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয় না, সে সম্বন্ধে আমার মতন একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তির কোন প্রকার মত প্রকাশ করার স্পর্দ্ধা রাখাও সঙ্গত হইবে বলিয়া আমি মনে করি না। কিন্তু যখন আলোচনা করিতে দাঁড়াইয়াছি তখন একটা কিছু বলিতে হইবে। যাঁহারা আমার সঙ্গে একমত হইবেন না, তাঁহারা হয়ত বলিবেন "Fools rush in, where angles fear to tread." কিন্তু বলিলে উপায় কি ?

আমার মনে হয় এই উভয় দলই চরমপন্থী। প্রথম দলকে আমরা সাহিত্য-জগতের Conservative, দ্বিতীয় দলকে সাহিত্য-জগতের Liberal আখ্যা দিতে পারি। আমার নিজের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র বক্তব্য এই যে, আমি এই উভয় দলের কোন দলের সঙ্গেই সম্পূর্ণভাবে একমত হইতে পারি না। কিন্তু উভয় দলের বক্তব্যেরই কোন কোন অংশের সহিত আমি একমত। যেমন আলো ও ছায়ার সম্পাৎ ভিন্ন চিত্র অঙ্কিত হয় না, তেমনি ভাষায় চিত্র আঁকিতে হইলেও সৎ অসৎ উভয় দিকই ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। ইহা ধ্রুব সত্য এবং একথা কোন পক্ষই অস্বীকার করিবেন না। আমার বিশ্বাস, বাস্তব চরিত্র অঙ্কিত করিতে বসিয়া বাল্য-কালে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় যে চিত্র আমরা পড়িয়াছি, অর্থাৎ "রাম অতি সুবোধ বালক, সে ভাল ছাড়া মন্দ করিতেই জানে না—আর যদু অতিশয় খারাপ ছেলে ; সে খারাপ কাজ ভিন্ন ভাল কাজ করিতেই জানে না"—এই প্রকার চরিত্র অঙ্কিত করিলে তাহা আর যাই হউক, বাস্তব চরিত্র হইবে না—ইহা অবিসম্বাদিত সত্য। মানব চরিত্র সাধারণতঃ বৈষম্যের সমষ্টি। একমাত্র মানবদেহধারী ভগবান ভিন্ন সর্ব্বপ্রকার মহান

আদর্শের সমাবেশ মানুষে কখনো হইতে পারে না। একই মানবের চরিত্রের একাধিক দিক আছে, কোন দিক তেজস্বিতায় উজ্জ্বল, কোন দিক দুর্ব্বলতায় ম্লান, কোন দিক সুন্দর, কোন দিক কুৎসিত, কোন দিক কোমল কোন দিক কঠিন। সুতরাং যিনি সঙ্গতি রক্ষা করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন প্রকারের রেখাপাতে চরিত্র সৃষ্টি করিতে সক্ষম, তিনিই প্রকৃত সাহিত্যিক অথবা আর্টিষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই।

সঙ্গতি রক্ষা করিয়া কথাটা আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়াই ব্যবহার করিয়াছি। পূর্ব্বকথিত মূলসূত্র অবলম্বন করিয়া সাহিত্য রচনা করিতে গিয়া আজকালকার অনেক লেখক সঙ্গতি রক্ষা মোটেই করিতে পারেন না, একথা আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলিতে হইতেছে। পারেন না —কথাটা বোধ হয় ঠিক হইল না। ইচ্ছা করিয়া করেন না বলিলেই—ঠিক কথা বলা হয়। ইঁহারা ঠিক উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন কলুষিত প্রবৃত্তির নায়ক ও নায়িকার চরিত্রের কোন একটা দিগকে উজ্জ্বল করিয়া অঙ্কিত করিতে। ইংরাজী ভাষায় বলিতে গেলে "Idealisation of the villain in the play" ইহাই যেন হইতেছে তাঁহাদের সাহিত্য-সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রতিভাবান লেখকের হাতে পড়িয়া এই সকল চিত্র এমন ভাবে চিত্রিত হইতেছে যে, নিজের অজ্ঞাতসারে ঐ প্রকার নায়ক ও নায়িকার প্রতি পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষিত হইতেছে। পাপের প্রতি সহানুভূতি পরিণামে পাপের প্রতি আশক্তিতে পরিণত হইতে খুব বেশী সময় লাগে না। সুতরাং আমি বলিব, এই সকল লেখা সমাজ-শৃঙ্খলার পরিপন্থী।

এই প্রকার প্রতিভাবান লেখকের লেখা সমাজ-শৃঙ্খলার পরিপন্থীই হউক আর যাহাই হউক, তাহা পাঠ করার সময় তৎকালিক একটা আত্মবিস্মৃতি, একটা মোহ, মদের নেশার মত অনেককেই অভিভূত করে ; অত্যন্ত সংযতচিত্ত ব্যক্তিকেও একথা স্বীকার করিতে শুনিয়াছি।

কিন্তু যেখানে ঐ প্রকার প্রতিভার অভাব, অথচ ঐ প্রকার চিত্র আঁকিবার প্রচেষ্টা বর্ত্তমান, সেখানে এমন একটা বীভৎস রসের সৃষ্টি হয়—তাহা যে কোন সুস্থ চিত্তের পক্ষেই অহিতজনক।

প্রাচীনকালের একটী গল্প শুনিয়াছিলাম। এক গ্রামে একটী কৃপণ অর্থশালী ব্যক্তি একটী পুষ্করিণী খনন করিয়া দিয়া সেই পুকুর হইতে এক কলসী জল লইলে চারিটী কড়িয়া পয়সা দিতে হইবে, ইহাই নিয়ম করিয়াছিলেন। ঐ প্রদেশে অত্যন্ত জলকষ্ট থাকায় তথাকার লোক ঐ ভাবে পয়সা দিয়াই জল লইতে বাধ্য হইত, কিন্তু কৃপণের অসাক্ষাতে তাহাকে বাপান্ত করিতে ছাড়িত না। কৃপণের অবশ্য সেই সকল গালাগালি অবিদিত থাকিত না। ক্রমে তাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে সে অনুতপ্ত হইয়া পুত্রকে ডাকিয়া বলিল—"বাপু আমি তো লোকের গালাগালি, শাপ-মন্যি লইয়াই চলিলাম—তুমি এমন কাজ করিবে যাহাতে লোকে আমাকে প্রশংসা করে।' বুদ্ধিমান পুত্র পিতার অন্তিম আদেশ পালন করিবার জন্য একটি অভিনব উপায় নির্দ্ধারণ করিলেন। তিনি পিতার মৃত্যুর পর নিয়ম করিলেন যে, পুকুর হইতে যে ব্যক্তি জল লইবে, তাহাকে চারিটী করিয়া পয়সা তো দিতেই হইবে, অধিকন্তু একটী করিয়া চড় খাইয়া যাইতে হইবে। দেশে জলকষ্ট, অন্য কোথায়ও জল পাইবার উপায় নাই—সুতরাং দেশের লোক এই আদেশ পালন করিয়া জল লইতে লাগিল এবং বলাবলি করিতে লাগিল—"বুড়ো বাপ তো ভালই ছিল—এ ব্যাটা আরও পাজী!" বুদ্ধিমান পুত্র এই প্রকারে পিতাকে ভাল বলাইলেন।

আধুনিক নব্য সাহিত্য—যাহা আজকালকার কতিপয় মাসিকে, প্রকাশিত হইতেছে এবং কতকগুলি উপন্যাসে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহাও গ্রাম্য ভাষায় বলিতে গেলে তাহাদের "বাবাকে" ভাল বলাইয়াছে

অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকারের লেখাকেও তুলনায় ভাল বলিতে বাধ্য করিয়াছে! ইহাদের লেখনীতে ভ্রাতার প্রতি ভগ্নীর, বিমাতার প্রতি পুত্রের, জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃবধূর প্রতি দেবরের যৌন-আশক্তি চিত্রিত হইয়াছে। শুধু চিত্রিত হইয়াছে বলিলে সব বলা হয় না—নগ্ন বীভৎস ন্যক্কার জনক ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। এই সমুদয় লেখকগণ নিজেদের পক্ষ সমর্থন করিতে কথায় কথায় realism অথবা বাস্তবতার দোহাই দেন। কিন্তু একটু বিচার করিলেই দেখা যাইবে যে, ইহা বস্তুতঃ realismনহে, লেখকের বিকৃত রুচি এবং মানসিক বিকারের ফল। তর্কস্থলে যদি স্বীকারই করিয়া লওয়া যায় যে ঐ প্রকার অস্বাভাবিক যৌন-বুভুক্ষার দৃষ্টান্ত সমাজে মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলেও এই প্রকার চিত্র অঙ্কণের সার্থকতা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমরা বুঝিতে অক্ষম। ইহা হিতজনক তো নহেই; যে আর্টের মার্কা লইয়া অনেক বাজে মাল বাজারে বিকাইতেছে তাহারও কোন অস্পষ্ট ছাপ এই সব লেখার অধিকাংশের মধ্যে দৃষ্ট হয় না।

এ প্রসঙ্গে কিন্তু একটা কথা না বলিয়া পারি না। ক্ষুদ্র বীজ হইতে মহামহারুহের উৎপত্তি হয়। আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের অমল ও তাঁহার বধূ-ঠাকুরাণীর গল্পে সূক্ষ্মভাবে যে বীজ বর্ত্তমান ছিল, শরৎচন্দ্রের সরস প্রতিভার সিঞ্চনে তাহা পল্লবিত তরুতে পরিণত এবং আধুনিক নব্য সাহিত্যকারের যত্নে তাহা বিষফল প্রসব করিতেছে এবং সেই বিষফল বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ আশা-ভরসাস্থল যুবকগণ অমৃতজ্ঞানে আহার করিয়া মনুষ্যত্ব হারাইতে বসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের অমানুষিক প্রতিভার প্রতি সম্মান-প্রদর্শনে আমি অন্য কাহারও অপেক্ষা নিজকে নিম্ন আসন দিতে প্রস্তুত নই। কিন্তু তথাপি আমার মনে হয়, যাহা বলিলাম, তাহা সত্য এবং কঠোর ও নির্ম্মম সত্য।

গদ্য সাহিত্যের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে পদ্য সাহিত্যের অধঃপতনের

বিষয়ও চিন্তনীয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আমরা ভাব ও ছন্দের যেমন সমান উৎকর্ষ দেখিতে পাইয়াছি, বিশ্ব-সাহিত্যে তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। সত্যেন্দ্রনাথ তাহার পর আমাদিগকে ছন্দের ঝঙ্কারে ও অভিনবত্বে চমৎকৃত করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারও কতকগুলি কবিতাতে ছন্দের উৎকর্ষতার সঙ্গে ভাব সমান তালে পা রাখিয়া চলিতে পারে নাই আর আজকাল সত্যেন্দ্রনাথের অনুকরণে কতকগুলি আধুনিক কবি কবিতা লিখিতে প্রয়াসী হইতেছেন এবং ছন্দ-অনুপ্রাস-ঝঙ্কারের অনুরোধে, বিনা বাক্যব্যয়ে ভাবকে জবাই করিয়া চলিয়াছেন। আমার একটী বন্ধু বলেন যে :—

পেলিটী হইতে "চা" পিয়া—
পাঞ্জাব মেলে চাপিয়া
পরাণ উঠিল কাঁপিয়া
ডাকিনু হা পিয়া, হা পিয়া!

এই প্রকার মিল এবং অনুপ্রাস থাকিলে তাহাই আজকালকার বাজারে বেশী বিকায়। অবশ্য এই কবিতাটী আমার বন্ধুর ঊর্ব্বর মস্তিষ্কপ্রসূত সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার কথা একেবারে ফেলিয়া দিতে পারি না। আজকালকার মাসিকের কলেবরে যে সকল কবিতা দেখিতে পাই —তাহা অনেকটা এই প্রকারেরই বটে।*

---

*তারকেশ্বর সাহিত্য-সম্মিলনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুত প্রমথনাথ সান্ন্যাল শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিভাষণ।

প্রগতি

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

(অতি-আধুনিক প্রথায় রচিত সবুজ উপন্যাস)

কিছু নয়।

কিছু। অন্ধকারের মধ্যে আলো। আলোয় জগতের প্রকাশ। জগত আলোময়। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ সবই আলোর খেলা।

ভূমিষ্ঠ হইয়াই ভাবে জননী-গর্ভের কথা। গর্ভের গন্ধ তাহাকে পাগল করে। জীবন ভরিয়াই কি করিবে?

মায়ের স্তন্য পান করিতে চায়—স্তন্যদুগ্ধে রুচি নাই—জননীর বুক ক্ষত-বিক্ষত করে। অকারণ। মাঝে মাঝে মুখ তুলিয়া কি ভাবে। কি ভাবে, কে জানে? রাঙা হইয়া ওঠে যেন। আবার সবলে জননীকে আঁকড়িয়া ধরে। দস্যি ছেলে!

পাঠশালায় যায়। 'ক' লিখিতে কিসের ভাবে উন্মত্ত হইয়া ওঠে। সহপাঠিনী বীণার হাত ধরিয়া টানাটানি করে।

বীণা ওঠে না। সে কি পাষাণ?

আবার পড়ে। লেখেও।

অনন্ত। অসীম। শাশ্বত।

'র' লিখিতে কাঁদিয়া আকুল।

পণ্ডিত শুধায়, কি? পেট-কাম্‌ড়ি—সকালে বাড়ী যাইতে হইবে।

একা যাইতে পারে না—পাশের বাড়ীর সুধারও ছুটী হয়।

পরদিনও ঠিক তাই। এবারে সুধা সঙ্গে যাইতে চায় না। ছুটীর লোভেও না। সুধা কি বোকা? একটী সুগন্ধ নীপকেশর। আপনার মহিমা বোঝে না। আকাশের নীলিমা—হিমালয়ের ওপারের মানস-সরোবর।

ছেলে বাড়িয়া ওঠে। আভুল ফুলে কলা গাছ।

ইস্কুলে যায়। মেয়ে-স্কুলে যাওয়ার পথেও যাওয়া চলে। সে পথে একটু ঘুরিতে হয়। তবু সেই পথেই যায়।

এ জন্মের নয়, জন্ম-জন্মান্তরের। শুধু জল নয়, জোয়ার-ভাঁটার জল।

মেয়েরা যায় দলে দলে। একটী, দু'টী, তিনটি, চারিটী—আঙুলে কুড়িটীর বেশী গণা যায় না। অথচ সব ক'টীর উপরেই তার চোখ! পঞ্চাশজনের প্রতিদিনকার খবর সে নেয়। কোন্ দিন কে কোন রঙের শাড়ী পড়ে, ব্লাউসের রং ফিকা কি ঘোর—দেখে। পাৎলা শাড়ীর তলের সায়ার লেসগুলি পর্য্যন্ত বাদ যায় না।

জ্যোতিষীর অণুবীক্ষণ—ডাক্তারের টেথিস্কোপ। বুকের তলা পর্য্যন্ত দেখে।

মেয়েরা স্কুলে যায়—ঝাঁকে ঝাঁকে লম্বা চুল পিঠের উপরে ঝুলিয়া পড়ে। কাহারও চুল কোঁকড়া, মুখের উপরে আসিয়া পড়ে। ভোম্‌রার জ্বালায় পদ্মফুল অস্থির! কারু চোখ ভাসা, কারু চঞ্চল ছোট্ট চোখ দু'টী। চোখাচোখী অনেকের সঙ্গেই হয়, বিশ-পঁচিশ জোড়া চোখ মনেও রাখে।

সূর্য্য সপ্তবর্ণের। দ্বাদশ সূর্য্য এককালে যেন।

নিভার রং কালো, মুখ কুৎসিৎ—তবু তাকে ভালো লাগে। নিটোল দেহখানি। সুষমা অহঙ্কারী, দৃষ্টি ফেলিয়া অনুগৃহীত করে—তবু তাকে সহিতে পারে। রূপে উছলিয়া পড়ে যে! কমলা বাড়ন্ত গঠন; সুন্দরীও। শান্তিও মন্দ কি? পারুল, চম্পকলতা, মালতী, জুঁই, আশা, প্রভা, রেনু, সুলতা, লতিকা—এম্‌নি আরো কত মেয়ে তার মনের কোঠায় বাসা বাঁধিয়াছে।

কাহাকে বেশী কম দেখিতে পায় না। একটিকেও বাদ দিতে হইলে বুকে আঘাত লাগে। বহুতেই আনন্দ—পিপাসা অসীম।

পিপাসা? চোখের পিপাসা শুধু।

সাগরের তীরে দাঁড়াইয়া ঢেউ গণিয়াছ? কূল পাইয়াছ কি? পাইবে না। শৈবলিনী পায় নাই। ডেস্‌ডিমোনাও না। বিয়াট্রিস্ জীবনমরণের ওপারে গিয়া কি নিশ্চিন্ত ছিল?

চোখে যখন কূলায় না, তখন অসীম ছাড়িয়া সীমায় আসিতে হয়।

মালতী রূপের গরবে গরবিনী নয়—রং কালো, চোখ দু'টী ছোট, নাকটাও খাঁদা গোছের। তবু মালতীই সই—

মালতীর হাতের মুঠায় জলপাণির পয়সাটা গুজিয়া দেয়; মালতীর মাথার খোপায় চাঁপার কলি গুজিয়া দেয়। মালতীর অন্ধ বাপের হাত ধরিয়া বাঁশের শাকো পার করিয়া দেয়। মালতীর মা যখন সব্‌জীর পসরা লইয়া হাটে যায়, তিনগুণ দরে তার পশরা শুদ্ধ কিনিয়া রাখে।

মালতীর বাবা ডাকে, আমার রাজা বাবা! আমার দয়াল বাবা!

মালতীর মা বলে, ও জন্মে আমার বাপ্ ছিলে তুমি।

আর মালতী?

ওজন্মে সে তাদের কি ছিল, তা লইয়া সে মাথা ঘামায় না—এ জন্মে কি হইতে পারে, মালতীর গবেষণা তাই।

একটী তারা। একটী ফুল। নারদের হাতের মালায় ইন্দুমতী মরে, অজও। কালিদাসের রিয়ালিষ্টিক আর্ট জানা ছিল না। রঘুবংশ তাই ব্যর্থ।

মালতীকে ইস্কুলে পৌঁছাইয়া সেই দেয়, ফিরাইয়াও আনে সে-ই। মেয়েরা বলাবলি করে, ও মালতী, বিয়ের ফুল ফুট্‌লো?

মালতী মুচ্‌কী হাসে। মুখে তাদের গাল দেয়—দূর্ পোড়ারমুখী! মনে মনে বলে—ওদের মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।

চুপি চুপি তাকে বলে, শুন্‌ছো? আমি আর ইস্কুলে যাব না।

সে প্রশ্ন করে, কেন?

মালতী বলে, সবাই বলে ধিঙ্গি মেয়ে, বিয়ের বয়স পেরিয়ে গেল।

সে বলে, তা হ'লে বিয়েই কর না!

মালতী উৎসুক চোখ দু'টী তার চোখের উপরে। শুধায়, কাকে?

মালতীর বাঁ-হাতখানি খপ্ করিয়া ধরিয়া ফেলে। বলে, একটা রাঙা বর—

তার হাতের ওপিঠ নিজের হাতের ওপিঠের সাথে মিলাইয়া মালতী বলে, ঈস্ রাঙা না আরো কিছু? আমার চেয়ে বড়-জোর একটু ফর্সা হবে।

বলিতে বলিতে মালতী নিজেই রাঙা হইয়া ওঠে। হাত ছাড়াইয়া চলিয়া যাইতে চায়। পারে না। চার ঠোঁট এক হয়। বলে—মালতী, একটা কথা! মালতী কাঁপিয়া ওঠে। বলে, আজ থাক্।

সত্যই কিন্তু থাকে না।

শেষে পস্তায়—মালতীর কতই না আপত্তি হইবে, এই ছিল শঙ্কা!

কুঁড়ির মধ্যকার ফুল—টানিয়া বাহির করে। ফুলের ভাষা কে জানে?

রক্তের আস্বাদে উন্মত্ত ব্যাঘ্র। যত পায়, তত চায়। মালতীও কি কম? যতক্ষণ বাঁধ, ততক্ষণ। বাঁধ টুটিলে জল উদ্দাম হইয়াই ছোটে কে তলে পড়িয়া থাকে আর কে ওঠে—কে জানে?

এমনি কয়েক মাস। ক্যালেণ্ডারের কয়েকখানি পাতা ছেঁড়া যায়, বাংলা পাঁজী পুরাণো হইয়া আসে।

মরুভূমির বালি। আকাশের তারা। অয়েল-ইউক্লিপ্‌টাসের পাতা। ছোট একটী ফর্‌গেট্-মি-নট্।

মালতীর মা বিরূপ হইয়া ওঠে—কেন, সেই জানে। পয়সা দিলে লয় না।

মালতীর অন্ধ বাপ মরিয়া গেছে। তাই কি মালতীর মায়ের এই রুক্ষ মেজাজ?

রাস্তায় একদিন গালাগালি দেয়। বলে আমার বাড়ী-মুখো আর হোয়ো না—হ'লে.....অভিধানের বাইরেকার কতগুলি অসংস্কৃত শব্দ।

প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগ।

মালতী ঘরেই থাকে। একবার দেখা হয় না। মালতীর মা মালতীকে আগ্‌লাইয়া রাখে।

লোকের মুখে শোনে—মালতীর ছেলে হইবে। গাঁয়ের লোকে মালতীর মুখে দিনে দশবার নুড়া জ্বালাইয়া দেয়।

ঘেন্না ও বিতৃষ্ণার মধ্যেও একটা জয়ের পুলক তাহার সারাটা শরীরে সাড়া জাগায়। নিজের কৃতিত্বে নিজে উল্লসিত হইয়া ওঠে।

থার্ম্মোপলি। ওয়েলিংটনের ডিউক। ভাস্করাচার্য্যের ভাস্কর্য্য। অনেক ভাবে। শেষে স্থির করে, ভীরুর মতো পিছাইয়া থাকিবে না—সুমুখে আগাইয়া যাইবে। দশজনের সুমুখে বলিবে, এ আমার—মালতীকে আমি বিবাহ করিব; তার গর্ভের শিশুকে পিতৃ-পরিচয়ে বঞ্চিত করিব না।

ভীষ্মদেব। রামচন্দ্র। সত্যের একনিষ্ঠ সাধক সত্যসুন্দরের জয় হোক।

বিধবা মাকে স্পষ্টই বলে, মালতীর ছেলে আমার। আমি মালতীকে বিবাহ করিব।

মা শিহরিয়া ওঠেন। বাধা দিতে যান—ছেলে হুঙ্কার দিয়া ওঠে। মা চুপ করেন। লোক-জানাজানি হয়। সমাজপতিরা বলেন, হুকা বন্ধ করিব।

মুচ্‌কি হাসিয়া উত্তর করে—ঘরের হুকায় তামাক খাইব। কেহ বা রসিকতা করে, গোড়া হইতে তাই করিলেই ভালো হইত—পরের হুকায় টান দিতে গিয়াই না এই বিভ্রাট!

মালতীর বাড়ী ছোটে। লোকে ঢি ঢি করে। গিয়া দেখে, মালতীদের উঠানে সভা বসিয়াছে—বামুন-পণ্ডিতেরা একত্র হইয়া প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিতেছেন।

হন্ হন্ করিয়া বারান্দায় গিয়া ঢোকে। দেখিয়া পণ্ডিতদের প্রায়শ্চিত্তের তর্ক বন্ধ হয়। শিরোমণি টিকি নাড়িয়া বলেন, বোস বাবা।

শিরোমণির দিকে অগ্নি-দৃষ্টি হানে। দাঁড়াইয়াই বলে, বলুন!

শিরোমণি বলেন, কুমারীর ক্ষেত্রে ভ্রূণ-হত্যায় দোষ নেই বাবাজী, ঘেরণ্ড-সংহিতায় স্পষ্টই লিখেছে.....

ঘেরণ্ড-সংহিতার মহাবাক্য শ্রবণের মতো ধৈর্য্য থাকে না। রূঢ়কণ্ঠে বলিয়া ওঠে, সে হবে না—ও ছেলে আমার, আমি মালতীকে বিয়ে করে ছেলেকে তার পিতৃ-পরিচয়ের গৌরব দেব।

ঘর শুদ্ধ সকলে মুখে কাপড় গোঁজে। শিরোমণি হাতের হুকায় কষিয়া একটান লাগাইয়া বলেন, বলি বাবাজী, ও ছেলের পিতৃত্ব-গৌরব কি একা তোমার?

প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। উত্তর কর, হাঁ, আমারই।

শিরোমণি বলেন, তা হ'লে তো গোলই থাকতো না। ছেলের গর্ভধারিণী কিন্তু তোমায় নিয়ে এ গাঁয়ের ছ'জনের নাম করেছে—এই ছ'জনের মধ্যে সত্যিকার গৌরবটা যে কার, তা খড়িমাটী নিয়ে গণেও ঠিক করে উঠ্‌তে পার্‌ছে না।

বিশ্বাস হয় না। মালতীর মায়ের মুখের জবাব চায়।

মালতীর মায়ের সেই ঝাঁঝালো কাংস্য কণ্ঠখানি—কানেস্তারার ওপর লাঠির আঘাত যেন। বলে, ওরা দশজনে মিলে একরত্তি মেয়ের আমার যে দশাটা করেছেন—তা সবাই দেখেছে। এখন আবার কাটা ঘায়ে নূনের ছিটা দিতে হবে না। আমার বরাত নিয়ে আমি থাকবো—ওরা আমার রেহাই দিন।

চোখ দু'টী রক্তজবারই মত রাঙা। অন্দরে গিয়া মালতীকে খুঁজিয়া বাহির করে। রান্না থামাইয়া কাঠ হইয়া মালতী উঠিয়া দাঁড়ায়।

বলে—তোমায় আমি বিয়ে করে ক'ল্‌কাতায় নিয়ে যেতে চাই মালতী, চলো।

মালতী বলে, অমন কথা বিশে আর তারিণী চাটুয্যেও বলেছিল। যা হবার হয়েছে—এবার আমায় রেহাই দাও। দু'-জনে দু'দিক দিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া কর্‌লে আমি আর বাঁচ্‌বো না।

দুই

গাঁয়ে টিকিতে পারে না—শহরে আসে।

কলিকাতায় নয়, জিলার সদরে। ছোট সহরটী, কিন্তু লোকজনে ভরা। আদালত, কলেজ, ষ্টীমার ঘাট, পার্ক, ক্রিকেট খেলার হিড়িক, কাঁচি-মার্কা সিগারেট, রাস্তায় কলের জল।

গোটা তিনেক মেয়ে ইস্কুল। পথে ঘাটে মেয়েদের মেলা। সকালে বাজারে মেছুনীর মেয়ে, দুপুরে ইস্কুলের পথে ইস্কুলের মেয়েরা-মাষ্টারণীরা। সন্ধ্যায় রাস্তার মোড়ে মোড়ে অপেক্ষমানা সোনাপোকার টিপ্ পরা আর এক ধরণের মেয়ে।

দূর সম্পর্কের এক মেসো, পূরাপূরি সহুরে—গাঁয়ের সঙ্গে কোন সম্পর্কই নাই। তাঁরই বাসার কাছে অফিসারদের মেসে থাকে।

লংফেলোর কবিতা। মেকলের লেজ্। আর্ভিংএর স্কেচ্ বুক্। তিন হাজার বছর আগের পিরামিড্। মিসিসিপির উৎপত্তি উৎস। ভাল লাগে না।

কলেজ ভর্ত্তি হইবার দিন উৎরাইয়া যায়। যাক্। দুপুর বেলাটা মাসীর বাসায় কাটে।

মাসী পাড়াগাঁয়ের মেয়ে। বাপের বাড়ীর কেউ নাই, বিয়ের পরে এ বাড়ীতে যে ঢুকিয়াছে, আর নড়ে নাই। তাই ওর কাছে

গ্রামের গল্প শুনিতে ভালবাসে। ওকে মায়ের মতো আদর করে।

মাসীর আদর, তাই কি বেশী ?

মাসীর মেয়ে দু'টী—শোভা আর নীহার। শোভা বিবাহিতা—মেয়েও দু'টী কোলে। স্বামী শোভাকে দেখিতে পারে না, আবার বিবাহ করিয়াছে। মেয়ে দু'টী লইয়া শোভা বাপের ঘরে। বয়স তার কুড়ি-একুশ, ওর চেয়ে দু'তিন বছরের বড়। শোভা নাম স্বার্থক। অনাদর-সঞ্চিত রূপ।

রুদ্ধ আবেগ। কৃষ্ণ সাগরের জল। এঁদোপুকুর বাঁশপাতা—পাখীধরা ফাঁদ।

নীহার।

চৌদ্দর বেশী বয়স নয়—চঞ্চলা, রং খুব ফর্সা নইলেও সুন্দরীই।

যাদববাবুর পাটীগণিত, চারুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ—ইংরাজী হইতে বাংলা, বাংলা হইতে ইংরাজী। মোগল-বাদ্‌সাহের আমদরবার। মিসিসিপি নদীতে জল কত গ্যালন ?

শোভা আর নীহার—পালা করিয়া একের পর আর। নীহার—আধ-ফোঁটা কলি। কুঁড়ির মধ্য হইতে ফুলকে লুফিয়া লইয়া কি সুখ আছে ?

বেলা পড়িতে নীহারকে লইয়া বেড়াইতে যায়; নদীর পাড় ঘুরিয়া আসে। যাইতে যাইতে নীহারের কাছে ঘনায়। তার হাতটা চাপিয়া ধরে। নীহার রাঙা হইয়া ওঠে।

আরো কাছে।

নীহারের থোকা থোকা চুল গায়ে লাগে। হাতে নাড়া-চাড়া করিতে করিতে বলে, কী সুন্দর !

নীহার চোখ তুলিয়া বলে, নিজে সুন্দর কিনা !

নদীর তীরে লতার ঝোপে। বলে, কুমীর !

নীহার দুই হাতে জড়াইয়া ধরে। ভয় পায় যেন। নীহারের বুক পিঠে ঠেকে ; সুমুখে আনে—বলে, জলে নয়, ড্যাঙায়।

নীহার বলে, লাগ্‌চে।

ছাড়িয়া দেয়। মনে অনুতাপ হয়, মালতীকে মনে পড়িয়া যায়। নীহারকেও বিশ্বাস হয় না। শুধায়, তোমর ক'জন পুরুষ বন্ধু আছে নীহার ?

বালিকা তার বুকে মুখ লুকাইয়া বলে, তিনজন।

তাহারা ?

নীহার চপল হাসি হাসিয়া বলে, তুমি আর তুমি আর তুমি।

দু'জনায় খিল খিল করিয়া হাসে। আবার সে চুপ্ করিয়া যায়। ভাবে, এরা অগাধ জলের মাছ।

বারোয়ারী দেবতা আর পচা এদো পুকুর। চিংড়ীমাছ, গল্‌দা চিংড়ী।

মেস্ ছাড়িয়া ওদের বাসায় আসিয়াছে। দো-তলায় একখানি ঘর—পড়াশুনা করে। নীহারকে পড়া বুঝাইয়া দেয়। ছোট্ট বালিকা লুসী লণ্ঠন লইয়া শহর হইতে মাকে আনিতে যায়। নীলবর্ণ শৃগাল ফাঁকতালে রাজা হইয়া বসে। নীহার বলে ছাই পড়া! গল্প কর একটা।

নাঃ—গল্পও ভালো লাগে না।

শুধায়, তবে ?

নীহার বলে, কি জানি, তুমিই জানো।

শিহরিয়া ওঠে। মুহূর্ত্তের জন্য। মালতী বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া দিয়াছে। নীহার বলে, কী গরম দেখেছো ?

উত্তর করে শুধু, বড্ড।

নীহারের চোখ জ্বলিয়া ওঠে—বলে, ব্লাউজটা গায়ে রাখা যায় না ছাই !

খুলে ফেলি।

চমকিয়া ফিরিয়া চায়। নীহার মুখ নীচু করিয়া বলে, ছাই বোতাম! খুল্‌তেই পার্‌চিনে।

মহাকাল কি ধ্যানে বসিয়াছে?

গায়ে টোকা দিয়া নীহার বলে, বোতামটা খুলে দেবে? নিজেই শেষে খুলিয়া লয়। খুলিয়া আবার দুই হাতে বুক ঢাকিতে যায় একটু আদরে এলাইয়া পড়ে।

তবু পারে না।

মালতী কী বিতৃষ্ণাই জন্মাইয়া দিয়াছে! সমুদ্রের জল লোনা বলিয়া কি নদী-সরোবরও মিথ্যা?

পলাইবার চেষ্টা করে।

নূতন বন্ধন। শোভা।

শোভা আসিয়া বলে, তুমি যেন পরপর হ'য়ে থাক।

বলে, না শোভা-দি।

শোভা শোনে না, অনুযোগ করে। গাড়ী করিয়া শোভাকে লইয়াও বেড়াইতে যাইতে হয়।

নীহার অভিমান করে, তার একচ্ছত্র আধিপত্যে বাধা—সে সহিবে কেন?

দোটানার মাঝ্‌খানে। পালিমাটী ছড়াইয়া দো-আঁসলা মাটীতে।

বিতৃষ্ণা ধীরে ধীরে ঘুচিয়া যায়। আবার কণ্ঠতালু পিপাসায় শুকাইয়া ওঠে। কাছেই নীহার-গলানো জল—অঞ্জলি পূরিয়া পান করিতে হয় বৈকি! শোভাও যেন পাগল হইয়া উঠিয়াছে। অসুখ করিয়াছে, ওকে কাছে ডাকিল। কি অসুখ, কেউ বুঝে না।

শুধায়, কি শোভা-দি?

শোভা শুধু বলে, ব্যথা।

কোথায়?

বুকে। একবার হাত দিয়াই দেখনা! বলিয়া ওর হাত ধরিয়া টানিয়া বুকে ছোঁয়ায়।

বাসনার আগুনের কথা শুনিয়াছি। বুকের রক্ত কি টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফোটে? হাত তুলিয়া আনিতে চায়, শোভা আরো জোরে চাপিয়া ধরে।

বুক্ কি আবেগে ফুলিয়া ওঠে?

সেই রাত্রেই।

নীহার আসে। সব দিয়াছে, অরো দেয়। গভীর রাত্রি—কাজল-ঘন-কালো। বাহিরে বিদ্যুতের চমক। ঝুপ্‌-ঝাপ বর্ষা। প্রলয় রাত্রি যেন।

নীহার কি প্রলয়ের সহচরী?

উত্তাল তরঙ্গ উথলিয়া উঠিয়া আবার সাগরের বুকে ঘুমাইয়া পড়ে। ফণিনী ফণা নামাইয়া এলাইয়া পড়ে। নীহার পাশ ফিরিয়া শোয়।

বুকে কাহার উত্তাপ? এ জগদ্দল পাথর কিসের?

শোভা-দি?

নীহারও জাগিয়া ওঠে।

ইলেক্‌ট্রিক সুইচ্‌ ও টীপিয়া দিয়াছে।

দু'বোনে চোখাচোখী হয়। আর একজন যায় একবস্ত্রে বাহির হইয়া।

তিন

কিছুদিন আবার বাড়ীতে।

মালতীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ভিন্‌ গাঁয়ের বৌ সে। লোকে বলে, মালতীর মতো বৌ মেলা ভার।

মায়ের শেষ অবস্থা। মা বলে, তুই বে' থা করে সংসারী হ' বাছা!

ম্লান হাসি হাসে।

মার মৃত্যু হয়।

ডাক্তার, ওষুধ, পথ্য, গঙ্গাজল, খাটলী, আমকাট, মেটে কলসী লোকজন, সংকীর্ণ, হবিষ্যের ফ্যাসাদ, ঘি-ভাত অম্বল অজীর্ণ, বৃষকাঠ, ব্রাহ্মণ-ভজোন—সব শেষ! অবশেষে বিষয় সম্পত্তি বিক্রি করিয়া হাজার কয়েক টাকা লইয়া কলিকাতায় যাত্রা।

মাট, বাট, স্টেশন, গাড়ী, হুইসেল, গার্ড সাহেব, ক্রু কলের চিম্‌নি, কলিকাতার প্লাট্‌ফর্ম্ম।

এবারে মেসেও নয়, কারু বাসায়ও নয়। আলাদা বাড়ী। এক বুড়ো উড়ে ঠাকুর, যুবতী ঝি।

চেহারা খাপ্‌ছুরৎ, নাম তাই সুন্দরী।

বলে, তোমার নাম রাখলুম—সাবিত্রী।

চরিত্রহীন পড়িয়াছিল ছেলে-বেলায়। সে থিওরেটিক্যাল এ প্রাক্‌টিকাল্।

সাবিত্রীকে কালো ফিতা পাড় কাপড় কিনিয়া দেয়, পান আর দোক্তাও দেয় খুব। সাবিত্রী খুসী। সারা দিন খাটে, সারারাত বাবুর শয়ন-ঘর পাড় দেয়।

হোমিওপ্যাথী ইস্কুলে ভর্ত্তি হয়—সেই সতীশ।

তবু ঠিক খাপ্ খায় না। সরোজিনী একটা চাই!

পাইতে দেরীও লাগেনা, বড়লোক বলিয়া ক্লাশ-মেট বিমল বাসায় লইয়া যায়।

বিমলের বোন সুনয়না। দেখিতে দোহারা গান গায় বেশ। ইণ্টার-মিডিয়েট্ পড়িতেছে।

প্রথম দর্শন এবং প্রেম। নিত্য নিমন্ত্রণ, সুনয়না গোড়ায় বাহির

হইত না, এখন বাহির হয়, খাতিরও করে। বিমল বলে, তুমি দুঃসাধ্য-সাধন করিয়াছ অমন গম্ভীর মেয়ে আজ চলনসই হ'য়েছে।

হাসে। জয়ের আনন্দেই কি? ডবল জয়েও মালতীর কাছে যে পরাজয়, তার গ্লানি ঘুচে নাই।

সুনয়নার বাবা খাতির করেন। মা-ও।

সুন্দরী বলে, ঘন ঘন নিমন্ত্রণ যে? ক'লকাতায় এসে ফাদে পড়নি তো?

হাসিয়া বলে, আমরা ফাদ পতিই সাবিত্রী—ফাদে পড়ি না।

সুন্দরী হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। তাদের জাত জানে, পুরুষ ফাদে পড়েই, ফাদ পাতে নারী।

সুনয়নার বাবা তাহাকে ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে উপদেশ দেন। সুনয়নার মা বলেন বে'থা করিয়া সংসারী হইতে।

বলে, আমার কাছে মেয়ে দেবে কে?

সুনয়না আড় চোখে চায়। অ-বিনয় অবার অবিনয়ের লক্ষণ। সুনয়নার দিকেই মন ঢলিয়া পড়ে। বিমল হঠাৎ একদিন বলে, বাবা তোমার হাতে সুনয়নাকে দিতে চ

মনটা আনন্দে ভরিয়া ওঠে—তবু শুধায়, তার মানে?

বিমল বলে, তার মানে তোমায় বিয়ে কর্‌তে হবে।

উচ্চ হাসির স্রোত। ধ্বনি আছে, প্রাণ নাই। শরতের মেঘ-গর্জ্জন—গড়ের মাঠের হঠাৎ তোপ—সোদা ফুল—পাখী আর পাকা ফল। হাসি থামিয়া যায়। বলে, বিয়ে কর্‌বো আমি এ সম্ভাবনা কিসে জাগলো?

বিমল বলে, নাই বা জাগ্‌বে কেন?

বিয়ের বিরুদ্ধে তার সেই অজস্র যুক্তির জাল! বদ্ধ প্রেম ও মুক্ত প্রেমের সেই ব্যাখ্যা!

তর্কে জয়ী ও হয়; কিন্তু বিয়েতে রাজী হয়। বলে, এ বিয়ে কিন্তু এক্স্‌পরিমেণ্টাল্।

বিমল বলে, সব বিয়েই এক্স্‌পেরিমেণ্টাল। তবে এ এক্স্‌পেরিমেণ্টের শেষ নাই কোথাও।

শুধায়, দেখো—আমার মোহ কেটে গেলে শেষে তোমার বোন্‌টীকে নিয়ে চোখের জলে ভাস্‌তে হবে কিন্তু!

বিমল উত্তর করে, সুনি হাল্‌কা মেয়ে নয়। দড়ি ছাড়া ও দড়ি গুটানো বাঙালী বধূর এ দু'টী কর্ত্তব্যই সে ঠিক মতো কর্‌তে পার্‌বে।

সুনয়নার সঙ্গে আরো কিছু মেশামিশি নয়। সরোজিনীরই টান বেশী—সাবিত্রী বাসায় চুলের টিকিটী দেখিতে পায় না।

সুনয়নার কাছে বিয়ের কথাটা পাড়ে। সুনয়না বলে, দুষ্টু ছেলে! সবই তো নিয়েছো, তবু সাধ মেটে না কেন?

হা করিরা চাহিয়া থাকে।

সে বলিয়া যায়, স্বাধীন মিলনে যতটা আনন্দ বিয়েতে তা নেই। তুমিই আমায় এ শিক্ষা দিয়েছো, তবে বিয়ে কর্‌তে চাও কেন?

মিনতির সুরে বলে, লক্ষ্মীটী! আমায় কোথাও নিয়ে চল—এমন যায়গায়, যেখানে তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ নেই—কেউ থাক্‌বেও না কোনো দিন। আদাম আ-ঈভের গল্প শুনিছি, আমার তাঁদের আদর্শ সংসারে আবার ফিরিয়ে আন্‌বো।

সুনয়নার আলিঙ্গন ছাড়াইয়া প্রশ্ন করে, এই নিয়ে ক'বার?

অর্থাৎ?

অর্থাৎ—কতজন ভাগ্যবান্‌কে এই একটী কথা শুনায়েছো সুনয়না?

সুনয়না কাঁদিয়া ফেলে। বলে, আমায় অবিশ্বাস কর্‌ছো তুমি?

তার জলসিক্ত দু'টী চোখের উপরে দু'টী চুম্বন দাগিয়া দিয়া বলে কি, জান সুনয়না, তোমায় ঘরের বৌ কর্‌তে পারি; কিন্তু একা তোমায় নিয়েই থাক্‌বো, এমন প্রতিশ্রুতি দিতে পারি নে। আমি যতদূর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, তাতে আমার এই শিক্ষা হ'য়েছে যে একজন পুরুষেরও একটী মাত্র নারী দিয়ে চলে না আর একজন নারীও একটী মাত্র পুরুষকে দিয়ে তার প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারে না—তা প্রেম-চর্চ্চার সৌখীনতাও শরীরের দাবীও না। (ক্রমশঃ)

বারীণদার "বিজ্‌লী।"

বারীণদার "বিজলী" দেখা দিয়াছে কলেজ ষ্ট্রীট বাজারের ছোট্ট কুঠুরীটার বাল্‌বের মধ্যে। এই আলোকধারাই বিচ্ছুরিত হয়ে চা'রিদিক আলোকিত কর্‌বে, বারীণ্‌দার এই আশা।

বারীণদার বিজলীকে যাঁরা আশীর্ব্বাদ করেছেন, তাঁদের মধ্যে "বীরবলের" আর লীলাময় রায়ের আশীর্ব্বচন দু'টী একটু অভিনবত্ব পূর্ণ। বীরবল বলেছেন—

"আমার বিশ্বাস মৃত-সঞ্জীবনীমন্ত্র আমাদের কারও জানা নেই, সুতরাং মরা কাগজ আবার বাঁচাতে পার্‌বে কিনা, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। যুগে যুগে মানব সমাজের মনের ধাত বদলে যায়, যে কথা এক সময়ে পাঠকের কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে, সেই কথাই আর এক সময়ে পাঠকের এক কাণ দিয়ে ঢুকে আর এক কাণ দিয়ে বেরিয়ে যায়।"

বীরবলের মুখের এই অকপট সত্য কথাটি শুনেও বারীণদা বিজলী-বাতি হাতে নিয়েছেন। বারীণ্‌দার সাহস আছে।

লীলাময় রায় বলেছেন—

"বিজলীকে এ যাত্রা বাঁচানো শক্ত হবে। দেশের লোক পলিটিক্স ছাড়া কিছু চাইবে না, এবং বেচারারা নিষ্ক্রিয়ভাবে এতদিন কাটিয়েছে, পলিটিক্সে গা ঢেলে দিয়েও লাভ আছে। কোন রকম একটা কর্ম্ম তাঁদের চাই, তা না হ'লে তাদের প্যারালিসিস্ ঘট্‌বে, দিন্ দিন্, একটু সাঁতার কাট্‌তে দিন, দোহাই আপনার, আপনি তাদের নিরুৎসাহ কর্‌বেন না।"

খোকা-হাকিম এর সবটুকু risk ঘাড়ের ওপরে নিয়েও যেটুকু বলে ফেলেছেন, তাকে বারীণ্‌দা বিবেচনা-যোগ্য বলেও গ্রহণ কর্‌বেন না, তা জানি, তিনি এক নূতন যুগের সৃষ্টি কর্‌বেন, এই তাঁর আশা। ঘন-ঘটা করেই এ বিজলী চম্‌কাচ্ছে—যদিও এটা বিজলী চম্‌কাবার সময় আদৌ নয়। মুক্তির আলো গুর্জ্জর-কেশরীর হাতে, তারি রশ্মিতে গোটা ভারতবর্ষ আলোময়। বিজলী এ আলোর রাজ্যে ফুট্‌তে পারে না; জোর করে ফুট্‌তে চাইলেও এর মধ্যে হবে সে সম্পূর্ণ নিরর্থক। লীলাময় এ অশীর্ব্বচনেও একটু লীলার ভাব প্রকট করিয়াছেন।

বিজলী কি চায়?

চায় সে "শ্রদ্ধা-হারাণো দেশকে নূতন শ্রদ্ধা ও জ্বলন্ত বিশ্বাসের আগুনে দীপ্ত কর্‌তে। যে দেশ পুতুল-পূজা ছেড়ে মানুষ-পূজা কর্‌তে সুরু করেছে, তার হারাণো শ্রদ্ধাকে ফিরে পাওয়ার আগে যারা তাকে কানা-কড়ির দায়ে হাটে বিকিয়ে এসেছে, তারা একবার ভালো করে জবাবদিহি করুক। কেবল মুখে মুখেই শূদ্র, চাষী, মজুর, নারীর ওপরে 'দরদ' দেখালে হয় না"। পট্‌কার বারীণের কথা ছেড়ে দেই, সে যেন

আর-একজন, ইদানীং কুলী-মজুর-চাষীর ওপর কাজের দরদ বারীণ্‌দা কতটা দেখিয়েছেন? অবশ্য নারীর ওপর তাঁর দরদ অসীম একথা আমরা একাধিকবার শুনেছি।

বারীণ্‌দার মতে "নারীর মুক্ত সচ্ছন্দ জীবনের সুবিধাটুকুর দুয়ারে অবধি আজও কড়া পাহারা রয়েছে"। এই পাহারা যে নারীর সাচ্ছন্দ্য ক্ষুণ্ণ কর্‌ছে, আমাদের কিন্তু তেমন মনে হয় না। বরং মনে হয়, সাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতায় ফিরিয়ে নারীকে বসিয়ে দেওয়ার জন্যে বারীণ্‌দারই মতো যারা উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠেছে, তাদের আক্রমণ হ'তে রক্ষা কর্‌বার জন্য পাহারার দরকার এখনো রয়েছে। বেত্রের ভীষণা স্মরণ করে বকাটে ছেলের দলই শিউরে ওঠে, কারণ বেত্রাঘাতের যোগ্য কাজ তাহারাই করে বেশী।

বারীণ্‌দার "বিজলীর নব ভাবে, নব মন্ত্রে, নূতন দীক্ষায় দীক্ষিত হবে যারা, তারা দল বেঁধে একদিন যত সমাজ ধর্ম্ম আচার বিধি—সব কিছুই ভেঙে মাঠসই করে নূতন দেশ, নূতন জাতি, নূতন সমাজ, নূতন ধর্ম্ম, নূতন আচার বিধি গড়ে তুল্‌বে।" জিজ্ঞাসা করি, এই নবদীক্ষিত দল হবে কা'রা? বারীণ্‌দার গুরুগিরির ভেল্‌কী-বাজীতে ভুল্‌বে কা'রা? কা'দের অপক্ক মস্তিস্ক চর্ব্বনের সুব্যবস্থা বারীণ্‌দা কর্‌ছেন? উত্তুঙ্গ হিমাচল-শৃঙ্গে নখরাঘাত ও দংষ্ট্রাঘাত কর্‌তে গিয়ে এরা ভগ্ন নখদন্ত জরোদ্‌গব হয়ে ফিবে আস্‌বেন না তো?

ব্রাহ্মণকে শায়েস্তা করার আর শাস্ত্রের-গড়া আচার-বিধির হাজার বাঁধন ছিন্ন কর্‌বার আস্ফালন করা আজকাল একটা ফ্যাসান হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। মুরব্বিয়ানা-বিলাসী বারীণ্‌দা না হয় আর খানিক কর্‌বেন। এসব ক্ষণস্থায়ী বুদ্বুদ্ তল পাওয়ার পরেও অনন্তকাল পর্য্যন্ত সাগরের অস্তিত্ব থাক্‌বে—এ সান্ত্বনা আছে।

"ভারতবাসী আর বাঙালী হচ্ছে ছদ্মবেশী সাহেব—সাহেবী ধরণে হাসে, সাহেবী ধরণে কাশে।" এ সব কথা বিশ বছর আগে ডি এল্ রায়ের বৈঠকখানায় মানাতো ভালো—আজ যে শুভক্ষণে বেশ-ভূষায়, শিল্প, সৌন্দর্য্য চর্চ্চায়, শিক্ষা দিক্ষায় প্রাচীন ভাব ধারা ফিরিয়ে আনবার দিকেই দেশের লোক ঝুঁকে পড়েছে, সে সময়ে নয়। "সাহেবী মন নিয়ে মিছক রাজনৈতিক মুক্তির কথা ভাবা" আর "ফ্রেঞ্চ ধরায় রাজনীতিক এজিটেশন করা" পট্‌কা যুগ অবধি চলেছে, গান্ধি-যুগে সে একেবারেই অচল।

"নিছক রাজনৈতিক মুক্তির কথা ভাবা" বারীণ্‌দার কাছে আজ সাহেবিয়ানা ছাড়া কিছু নয়। পরাধীন ভারতের রাজনৈতিক মুক্তি আজ বারীণ্‌দার কাছে এতই তুচ্ছ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ বারীণ্‌দার মুখে একথা শুনে কে বিশ্বাস করবে, এ সেই বারীণ্‌দা, যে এক সময় ঐ রাজনৈতিক মুক্তিকেই একান্ত লক্ষ্য করে তরঙ্গোদ্বেলিত সাগরের বুকে জীবন তরী ভাসিয়ে দিয়েছিলেন? বারীণ্‌দার এ পরিবর্ত্তন কিসে হ'ল জান্‌তে পার্‌লে মস্ত বড় সন্দেহের নিরসন হ'ত। নন্‌কোপারেশনের সময়ে গবর্ণমেণ্টের তরফ থেকে এণ্টি-প্রোপগণ্ডার আয়োজন হয়েছিল খুবই। তখনকার 'হক্ কথা'র ছেঁড়া কাগজগুলির সাথে বারীণ্‌দার আজকার কথার মার-প্যাচগুলোর মিল আছে অনেকটাই। সেকালের 'স্বরাজ' কাগজের নলিনী গুহকে একালে 'বাংলার বাণী' প্রচার করতে দেখি বলেই একালের বারীণ্‌দার হাব্‌ভাবে সন্দেহ হয় আরো বেশী।

বারীণ্‌দার ভাষায়—"বিজলী শুধু কাগজ নয়, বিজলী হচ্ছে অভিযান, বিজলী হচ্ছে বিদ্রোহ, বিজলী হচ্ছে ঝড়ের ভাঙনের সিঁদুরে মেঘ। বুঝি সে নূতন সৃষ্টির পূর্ব্বাহ্নের প্রলয়-সূর্য্য, তার অগ্নিপুচ্ছ ধূমকেতু, অগ্নির

অক্ষরে ভাবী ভারতের ভাগ্যলিপি। কালের থৈ থৈ নীল জলে যেন এক নবীন ব্রহ্মার ঢল ঢল সৃষ্টি-শতদল এই বিজলী!"

এর সাথে সুর মিলিয়ে বল্‌তে ইচ্ছা হয়—বারীণ্‌দা শুধু বারীণ্‌দা নয়, বারীণ্‌দা হচ্ছে চলার পথের মার্চ্চ, বারীণ্‌দা হচ্ছে বাক্যের বোমা, বারীণ্‌দা হচ্ছে বয়ে যাওয়া কুমারীর কপালে সিঁদুরের আভা। বুঝি সে প্রলয়-সূর্য্যের সপ্তাশ্বের একটী, রোমশ তার পুচ্ছ, মস্তকে বিলম্বিত দীর্ঘ কেশ—ললাটে অগ্নিযুগের সার্টিফিকেট। মুক্তিকামী বাংলার সে একটী পুচ্ছ-নাচনেওয়ালা ধুমকেতু।

বারীণদার বিজলী দেখা দিয়েচে, নতুন আকারে, নতুন প্রকারে। মলাটের ওপর বারীণ্‌দার আঁকা হিজিবিজি হেড্‌পিস্—তারই নীচে সম্পাদকের কোঠায় বারীণ্‌দার নামটী আবার নীচে চার জন পরিচিত ও পরিচিতা সহ-সম্পাদকের নাম—শ্রীলতিকা বসু, নলিনীকান্ত সরকার, প্রবোধসান্ন্যাল প্রভৃতি! বঙ্গীয় স্বেচ্ছাসৈনিকা-বাহিনীর শ্রীমতি লতিকা বসু লবণ-আইন অমান্যের হিড়িক থেকে গা-ঢাকা দিয়ে বিজ্‌লী-চমকে আত্মপ্রকাশ করেছেন। চমক দেওয়া হিসাবে বিজলীর কারখানার নামগুলির মধ্যে ভাইঝির নামটী বেশী কাজে আস্‌বে—খোদ কাকার নামটীর চেয়েও। এক কাগজের পাঁচটী সম্পাদক বাংলায় এই প্রথম দেখাগেল।

বিজলীর এই নতুন চমকের জন্য কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে বারীণ্‌দা লিখেছেন—"বিজলীর বাণী শ্রীঅরবিন্দের বাণী নয়, আমারই সাধ আকাঙ্খার বাণী।" বিজলীর মহৎ উদ্দেশ্যগুলির একটা লম্বা ফিরিস্তি, বারীণ দা দিয়েছেন, কেবল সেগুলো তাঁর জীবনের কোন্ কোন্ কাজের মধ্য দিয়ে কি করে তাঁর বাণীতে রূপান্তরিত হযেছে, তার কোন উল্লেখ করেননি। একনিষ্ঠ ভক্তেরা এতে ক্ষুণ্ণ হবে, কারণ তারা উদ্দেশ্যের মহত্বের চেয়ে বাণীর গুরুত্বটাই বোঝে বেশী।

আতুরেই এই দুরন্ত ছেলেটী ক্রম আস্ফালন সুরু করেনি। গান্ধীর লবণ-অভিযানকে নিয়ে মুরুব্বিয়ানা দেখাচ্ছে খুব। একবার বল্‌ছে—"দেশের এমন দুর্দ্দিন যে, যে-কোন নিঃস্বার্থ দেশপ্রাণ পুরুষ কাজে নাম্‌বেন তাঁকে এবং তাঁর পন্থাকে অবসর ও সুবিধা দিতে হবে।" এই টুকু উদারতার জন্য দেশ বারীণ্‌দার কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাক্‌বে। আর গান্ধীজীর মতো "যে-কোনো" পুরুষ ব্যর্থকাম হ'লে উপায়-নির্দ্ধারণের জন্য বারীণ্‌দার দ্বারে ধন্না দেবে।

তারপর বারীণ্‌দা বলেছেন—"মহাত্মাজী বহুকাল ধরে ছিলেন পূর্ণ মুক্তির বিরোধী, বাংলার তরুণ নেতা সুভাষ তাঁর আগে সে স্বপ্নের বাণী বলেছিল। আজ আইন-ভঙ্গ জন্য যা সবচেয়ে বেশী দরকার—সেই দেশ ব্যাপী ভলাণ্টিয়ার বাহিনীর স্বপ্নও মহাত্মাজীর আগে দেখেছিল সুভাষচন্দ্র।" এম্‌নিধারা আবোল-তাবোল বকুনী লেগে আছে বলেই অরবিন্দ-প্যাটার্ণ চুল আর অরবিন্দ-প্যাটার্ণ দাড়ি রেখেও বারীণ্‌দা অরবিন্দ হ'তে পার্‌লেন না। যে পূর্ণ স্বরাজের জন্য গান্ধীজী অমন দেশব্যপী অসহযোগ আন্দোলনের সৃষ্টি কর্‌লেন এবং একাধিকবার বড়লাটের সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য কর্‌লেন, সে কি মুক্তির বিরোধি ছিল? আর ভলাণ্টিয়ার-বাহিনীর কথা! "ফিলিপের সার্কাসের" বিরোধী মহাত্মাজী এখনো তাঁর আইন-অমান্যের জন্যে বিষদন্তহীন সর্পের ন্যায় নিরস্ত্র মিলিটারীর দরকার নেই, তাহা একাধিকবার তিনি বলেছিলেন, দরকার সাহসী ও দেশপ্রাণ জনসাধারণের। তা তিনি পেয়েছেন এবং পাচ্ছেন।

সতীত্বের গঙ্গাযাত্রা

একাঙ্ক কথানাট্য

সতীত্ব পীড়িত। তাহার জনক ধর্ম্ম কাছে বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছেন ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া যাইতেছেন।

ধর্ম্ম। এই আপনার ব্যবস্থা ডাক্তার বাবু?

ডাক্তার। হাঁ, এই আমার ব্যবস্থা, আপনার মেয়ের ব্যাধি উৎকট, তার চিকিৎসাও একটু উৎকট রকমেরই কর্‌তে হবে। রোগিনী সব সময়ে থাক্‌বে একা—আপনি বা আপনার সহধর্ম্মিণী পবিত্রতা কাছে থাক্‌তে পার্‌বেন, সেও মাঝে মাঝে। অনেক আব্‌দার কর্‌বে, মায়া করে মন গলাবার অনেক চেষ্টা কর্‌বে। সে সকল থেকে মেয়েকে রক্ষা কর্‌বার প্রধান উপায় হচ্ছে কঠোর হওয়া। আপনাকে.....

ধর্ম্ম। বুঝেছি ডাক্তার বাবু, আমাকে কঠোর হ'তে হবে। হ'ব—আমি কঠোর হব। মেয়ের মন রাখ্‌বার জন্যে মেয়ের হত্যার কারণ হব না। কিন্তু ঔষধ?

ডাক্তার। এ রোগ আরোগ্যের জন্য স্থূল ঔষধ ব্যবহারের বিধান নেই। আপনার মেয়েকে তা দিতেও পার্‌বো না। তবে হাঁ, বাড়াবাড়ি যদি বেশী করে, তাহ'লে দু'এক ডোজ কুইনিন্ মিক্‌চার, দু'এক চামচ ক্যাষ্টর অয়েল, কি এক-আধটা ব্যাটারী লাগিয়ে দেখ্‌তে পারেন।

ধর্ম্ম। ইন্‌জেক্‌সন?

ডাক্তার। ইন্‌জেক্‌সন এর এখনো আবিষ্কৃত হয় নি। তবে হাঁ, সম্প্রতি ডাক্তার রথ্‌ ইন্‌জেক্‌সন আবিষ্কারের চেষ্টা কর্‌ছেন। তাঁর মতানুযায়ী একটা ব্যবস্থা আপনি কর্‌তে পারেন। রাত্‌ এগারোটার পরে

খানিকটা দুধ-বার্লি ওকে খাইয়ে দিতে পারেন। তা হ'লে বাকী রাতটা একটু ঠাণ্ডা থাক্‌লেও থাক্‌তে পারে।

ধর্ম্ম। এ ছাড়া আর কোনো ব্যবস্থা নেই?

ডাক্তার। খুব বেশী ইমার্জেন্সী মনে করলে কল্ দেবেন আমায়। অবস্থা বুঝে যা হয় ব্যবস্থা দেব। তবে এইটুকু ঠিক রাখ্‌বেন—যেন আপ্‌নি বা আপনার সহধর্ম্মিণী ছাড়া কারু সঙ্গে সাক্ষাৎ না হয় ওর।

ধর্ম্ম। সে ব্যবস্থা আমি ভালো করেই কর্‌ছি।

(ডাক্তার চলিয়া গেলেই শ্রীমতী সতীত্বরাণী উঠিয়া বসিলেন)

শ্রীমতী। বাবা!

ধর্ম্ম। কি মা?

শ্রীমতী। আমার অসুখ অসুখ করে তোমরা মিছামিছিই জ্বালাতন কর্‌ছো বাবা, সত্যিকার অসুখ আমার কিছুই নয়। তোমরা আমায় ছেড়ে দাও, একবার আমি হাওয়ায় বেরোই।

ধর্ম্ম। সর্ব্বনাশ! টেথিস্কোপে পরীক্ষা করে ডাক্তার কি বলেছেন জানিস্? বলেছেন তোর হার্ট্ বড্ড খারাপ—সামান্য উত্তেজনাতেই ফেল্ কর্‌বার আশঙ্কা।

শ্রীমতী। ওসব মিথ্যা বাবা—ভুয়া। মিথ্যা রোগের আশঙ্কা জন্মিয়ে দিয়ে যে ডাক্তারের পশার! তুমি একবারটী আমায় বাইরে যেতে দাও—

ধর্ম্ম। না, না—বাইরে যাওয়ার পথ খুঁজতে হবে। এতটুকুও অনাচার আর হ'তে দেবো না।

(শ্রীমতী কাঁদিতে লাগিল)

কাঁদ্‌ছিস্? তা কাঁদ—যতখানি গ্লানি জমিয়েছিস্, চোখের জলে তার সবটুকু ধুয়ে নে'।

শ্রীমতী। আর বাবা গ্লানি ধুতে হবে না—আমি মর্‌বো এবারে।

ধর্ম্ম। বালাই!

শ্রীমতী। সত্যই আমি মর্‌বো বাবা—ঠিক বুঝেছি আমি। (উদাস সুরে) মর্‌বো—তায় দুঃখ নেই, মরবার আগে মনের শেষ বাসনাটা শুনিয়ে দিতে পার্‌তুম!

ধর্ম্ম। কি সে বাসনা মা?

শ্রীমতী। কাব্য-রস আস্বাদনের। তুমি জানো বাবা, কবিতা আমি কত ভালবাসি। তরুণ কবি এসে রোজ আমায় তার কবিতা শুনিয়ে যেত, কেমন সুখে থাক্‌তুম। আমায় বাইরে যেতে দেবে না, ঐ তরুণ কবিকে এখানে আস্‌তে দেবে তো?

ধর্ম্ম। (মনে মনে) এই সেরেছে! (মুখে) তরুণ কবিকে কেন মা, তোর বাবাই কি কবিতা কম জানে মা? আমার মুখে দু'চারটা কবিতা শোন্ না——

"বালস্তাবৎ ক্রীড়াশ্যং
স্তরুণ স্তাবৎ তরুণ্যনুরক্তঃ।"

শ্রীমতী। থামো বাবা, তোমার মুদ্গরের আঘাতে হাড়গোড় শুদ্ধ চূর্ণ কোরো না। ও কবিতার চেয়ে.....

ধর্ম্ম। কেন? শঙ্করাচার্য্যের মতো কবি—

শ্রীমতী। ভারতে আর জন্মায় নি! তা তোমার ভারতের এই অজন্মার কবি মাথায় থাকুন, আমার তরুণ কবিকে একবার ডেকে দাও—

ধর্ম্ম। কথ্‌খনো না!

শ্রীমতী। তা হ'লে তুমি যা-খুসী কোরো, আমায় রেহাই দাও। আমি একটু চুপ্ করে থাকি। ঠিক্ বুঝেছি আমি, সংসারে আমার কেউ নেই—বাপ্, মা, ভাই, বোন্.....

ধর্ম্ম। তরুণ-তরুণীর জীবনে এমন একটা মুহূর্ত্ত আসে, যখন বাপ্,

মা, ভাই, বোন—কারু অস্তিত্বের কথা তার মনে থাকে না। কিন্তু তোর সঙ্গে এমন ধারা বক্‌বক্ করবার মতো বাজে সময়ও আমার নেই।

শ্রীমতী। তা হ'লে তুমি শোওগে বাবা।

ধর্ম্ম। আমি যেন শুতেই চাইছি! একটা কথা রাখ মা, একটু চুপ করে থাক।

(দূরে গীর্জ্জার ঘড়ীতে টং টং করিয়া দশটা বাজিল)

শ্রীমতী। শুন্‌ছো বাবা?

ধর্ম্ম। কি?

শ্রীমতী। রাত দশটা হ'ল। এবারে তুমি শুতে যাও। আর আমায় আগ্‌লে থাক্‌তে হবে না।

ধর্ম্ম। পোটের ব্যথাটা যদি একটু বাড়ে?

শ্রীমতী। হাতবাড়িয়ে এক-ডোজ ক্যাষ্টর অয়েল্ খাবো।

ধর্ম্ম। বুকের ব্যথাটা বাড়্‌লে?

শ্রীমতী। বেলোডেনার শিশিটা আপনি এগিয়ে নেবো।

ধর্ম্ম। ব্যাটারী লাগাবার দরকার হ'লে তো আর নিজে লাগাতে পারবি নে?

শ্রীমতী। তখন তোমায় ডাক্‌বো বাবা, পাশের ঘরেই তো তুমি থাকবে? হাঁ তা হ'লে তুমি ঘুমোও গে বাবা, চোকের পাতা তোমার জড়িয়ে আসছে।

(ধর্ম্ম চলিয়া গেল ; শ্রীমতী উঠিয়া শয্যার উপর বসিল)

শ্রীমতী। ও ঘরে বাবার নাসিকা গর্জ্জন এরি মধ্যে শোনা যাচ্ছে। বাবা এ সব বিষয়ে খুবই prompt.

(দুয়ারে মৃদু করাঘাত শোনা গেল)

কে? কবি? এস প্রিয়তম—দুর্গাধ্যক্ষ গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন, দুর্গবিজয়ের যথার্থ সময় এই।

কবি। মাটী কর্‌লে প্রিয়তম—আমার ঘনায়িত কবিত্ব-রসটা তোমার দুর্গ-বিজয়ের কাব্য-বিরোধী ভাষায় মাটী করে দিলে।

শ্রীমতী। তা হ'লে কি বল্‌বো—

কবি। বল্‌বে—

আমার কুঞ্জের দ্বারে করাঘাতে ব্যঞ্জনা হানিয়া
মন্‌জরী এস মৃত্যুঞ্জয়ী
বজ্রের নির্ঘোষে এস খর্জ্জুরের শ্যামচ্ছায়ে
ঝঞ্জনিয়া এস ঝঞ্ঝাময়ী।
অন্তর-কন্দরে এস দুরান্তর হ'তে প্রিয়
বসন্তের সীমান্ত রেখায়
অলক্তক-রক্তরাগে ভক্তজনে মুক্তি দিতে
চুক্তিমত শক্তির দেখায়।
তাম্বুল-রঞ্জিতাধর কম্বুকণ্ঠে প্রিয় বলি
সম্বোধনে করি সম্ভাষণ
এ মানস-সরসীতে বস এসে রসময়ী
নব হাস্য করি বিকীরণ।

শ্রীমতী। কী সুন্দর! কী সুন্দর তোমার ঐ কবিতা! আবার পড় রসময়, শুন্‌তে শুন্‌তে আমি মরি।

কবি। এবারে অবাস্তব ছেড়ে বাস্তব—ছন্দটা ও তাই—

কবিতা কি ভালোবাস? শুন তবে কিছু
হে মোর মানস-রাণী এ কবিতাখানি

গেঁথেছি তোমারই তরে যদি পিছু পিছু
কবিতার আশে গলে বরমাল্যখানি ?
আমার কবিতা পড় ? পাঁচ আনা দিয়ে
কাগজ একখানি কেন ? খুব ভালো কথা !
সংগোপনে জানাও যদি লিপি পাঠাইয়ে
বিনা মুল্যে পাঠাইব তুমি আছ যথা।
আমার কবিতা গিয়ে পৌঁছে কর্ণে তব
লজ্জার রক্তিমা রূপে ? অধরে তোমার
চুম্বনের রেখা দেয় বসাইয়া যবে
কাব্যের মারফতে হের মানস আমার ?
হে কুমারী ! নিরাশ হোয়ো না, আশা রেখো
মিলন হ'লে হতে পারে তাহা দেখে।।

(পাঠ শেষ করিয়া)

ওকি ? চোখ ওল্টালে যে ?

আর্ট। কে চোখ উল্টিয়েছে ? শ্রীমতী সতীত্বরাণী ? ও চোখ ওল্টান নয়, আমাদের প্রতি অনুরাগ।

কবি। আমাদের !

আর্ট ! হাঁ, আমাদের। সতীধর্ম্মের কাছে তোমার প্রেম-কাব্যও যেমন, আমার রিয়ালিষ্টিক্ আর্ট ও তেমনি। তোমার প্রতি ওর অনুরাগ যথেষ্ট, আমার প্রতি ও কি তাই নয় ? জিজ্ঞেস্ করে ওকে দেখ—ওগো—ওগো—

শ্রীমতী। কে ?

আর্ট। আমি আর্ট।

শ্রীমতী। রিয়ালিষ্টিক্ আর্ট ? আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

আর্ট। প্রণামের চেয়ে ও রমণীর যে জিনিষটী আমার কাছে বেশী প্রিয়, তোমার অপাঙ্গের সেই দৃষ্টিমধুই আমি গ্রহণ করলুম।

শ্রীমতী। হে আর্ট দেবতা ! আজ আমি রিক্ত। আপনার পূজা—

আর্ট। জানি কল্যাণী, আমার পূজা করেই আজ তুমি রিক্ত। তোমার অস্তিত্বের অনেকখানিই আমার সাধনায় দিয়ে বসেছো, বাকীটুকু—

শ্রীমতী। বাকীটুকুও নেবে দেবতা !

আর্ট। তোমার পূজা অসম্পূর্ণ থাকবে, এতো আমি দেখতে পাব না। শোন—সমস্ত আর্ট আজকাল স্থূল থেকে সুক্ষ্মে, অধ্যাত্ম থেকে দেহতত্ত্বে প্রবেশ করেছে। এই রিয়ালিষ্টিক আর্টই পাশ্চাত্যে নারীর হাঁটুর উপরকার গাউনে আর প্রাচ্যে অনাবৃত বক্ষার্দ্ধে এসে পৌঁচেছে। আমি চাই আরো এগিয়ে যেতে। আর্টের সেবা সে দিনই সম্পূর্ণ হবে, যে দিন প্রেমলীলা cousin ছেড়ে সোদরে পরিব্যাপ্ত হবে—পরিচ্ছদ বিষয়ে নর নারী তাদের আদি জনক জননীর অনুসরণ করবে।

শ্রীমতী। তাই হবে দেব, দধিচী অস্থি দিয়ে দেবতাদের বাঁচিয়েছিল, আমি আত্মবিলোপ করে আপনার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত কর্‌বো।

আর্ট। তুমি পার্‌বে—তোমার চোখে সেই জ্যোতি……ক্রমশঃ মলিন হয়ে পড়ছে দেখ্‌ছি। তোমার সাধনা স্বার্থক হোক।

সাইকোলজী। শ্রীমতীর শয্যাপার্শ্বে কারা ?

কবি। আমরা কাব্যরস ও আর্ট। তুমি স্বয়ং মনের চেনা বুঝি ?

সাইকোলজী। না—আমি সাইকোলজী। দেবি ! দেবি !

শ্রীমতী। কে ?

সাইকোলজী। আমি সাইকোলজী।

শ্রীমতী। আপনি আমার শেষ জীবনের সাধনা। জানেন প্রভু, আপনারই সাধনায় এত শীঘ্র আমার আত্মবিলোপ !

সাইকোলজী। জানি দেবী। আমার সাধনায় 'কিরণময়ী' দেবরকে নিয়ে প্রেমের এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করেছিল—আমার সাধনায় অচলা সুরেশকে সরিয়ে নিয়েছিল, আবার আমারি সাধনায় "অজয়" আলোক-প্রাপ্ত সমাজের প্রায় সব ক'টা হাঁড়ি অপবিত্র করে দিয়েছে। কিন্তু তবু—

শ্রীমতী। তবু এ পোড়া সতীধর্ম্মের মহিমা দেশ থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়নি। আর যাবত না হয়—

সাইকোলজী। তাবত সাইকোলজীর গৌরব এ দেশে প্রতিষ্টিত হবার নয়।

শ্রীমতী। আপনার গৌরব রক্ষা সম্বন্ধে আমি যে একেবারে নিশ্চেষ্ট নই, এ তো আপনি জানেন প্রভু। আপনার নির্দ্দেশ মত বারো রকম মতের মর্য্যাদা রাখ্‌তে গিয়েই তো বহু জনের উচ্ছিষ্ট আমার এই জীবন আজ নিঃশেষিত প্রায়। আমার সবটুকু তেল ফুরিয়ে এসেছে প্রভু, আর আপনাকে অপেক্ষা কর্‌তে হবে না।

সংস্কারক। বল হরি! হরি বোল!

সকলে। কে?

সংস্কারক। আমি সংস্কারক। শিশু-বিবাহ বন্ধ কর্‌বার উপায় বাতেলে দিয়ে এসেছি, এইবারে সতীত্বকে গঙ্গাযাত্রা করিয়ে দিতে পার্‌লেই হবে ভালো। কেমন আছে ও?

আর্ট। প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

সংস্কারক। প্রায় হ'লে চল্‌বে না, একেবারে শেষ কর্‌তে হবে। বাকীটুকু পথে-পথেই হবে। ধরহে কবি, ধর রিয়ালিষ্টিক আর্ট, আর ধর সাইকোলজী—আমরা চারজনে মিলে ধরে সতীত্বের গঙ্গাযাত্রাটা সেরে নেই—

সকলে। বল হরি, হরি বোল!

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

কলিকাতায় যুগান্তর

রোজ সকালে উঠিয়াই বাসার বাহির হই—প্রাতঃভ্রমণ ঠিক বলা যায় না, মোড়ের মাথা হইতে একখানি খবরের কাগজ কিনিয়া আনিতে। হাঁটিতে হাঁটিতে গিয়া একখানি কাগজ কিনিয়া আনি, ফিরিবার পথেই বড় বড় হেডিংগুলি পড়িয়া ফেলি—প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি জানিয়া লই। তারপর বাসায় আসিয়া প্রাতঃকৃত্য, প্রাতরাশ—সবগুলি ব্যাপারের মধ্যেই জড়িত ঐ সংবাদ পত্র পাঠ। ডাণ্ডিতে গান্ধী কোন নূতন ফন্দী বাহির করিলেন, চট্টগ্রামে নিদারুণ-নিশীথের কোন রোমান্স্-বিহীন রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটিয়া গেল, মহিষবাথানের বাথানে কয়টা মহিষ আসিয়া শৃঙ্গাঘাতে কি বিপর্য্যয় ঘটাইয়া দিয়া গেল, কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায় কোথায় কোন্ মহিলা-সভায় কি বক্তৃতা করিলেন, দাদা বসন্ত কুমার বৌদি সহ কুমিল্লার কোন্ সভামঞ্চে কি কস্‌রৎ দেখাইলেন, শ্রীযুত পেটেল প্রেসিডেণ্ট্-গিরিতে ইস্তফা দিয়া কোথায় কোথায় টুর করিয়া কি রকম অভ্যর্থনা পাইলেন, বড়বাজার লাঠির আঘাতে কি রকম গুল্‌জার হইয়া উঠিল, আর পার্লামেণ্টের হাউস্ অব কমন্সে ভারত সম্বন্ধে কি কি আলোচনা হইয়া গেল, ডিউক্ অব ইয়র্ক কোন কোন পার্টিতে জয়েন করিলেন, মনোমোহন সিংএর বিমানের পাখা কয়বার ভাঙ্গিয়া গেল, পেগুর ভূমিকম্পে কোন্ কোন্ প্যাগোডার চূড়া ভাঙিল, পেশোয়ারের কয়জন কর্ম্মী মরিল ও ধৃত হইল এবং প্রেসিডেণ্ট্ মিষ্টার ঘোষ কি কয়িলেন, শোলাপুরে কয়টা পুলিশকে রাস্তায় লোড়াইয়া ফেলিল, বোম্বাইএ ক'খানা ডার্বী টিকিট বিক্রয় হইল—ময়মনসিংহে কচুরী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ দত্তের সঙ্গে কোন্ কোন্ 'ধামাধর' নাচিলেন ও কোন্ বীরেন্দ্রাণী জঙ্গল পরিষ্কারের

জন্য কয়টা গাছ কাটিলেন, মিঃ দত্তের মত ম্যাজিষ্ট্রেট থাকা সত্ত্বেও ৮৬ জন সত্যাগ্রহী কেমন করিয়া ঘায়েল হইল—তাহার বিবরণী সকাল-বেলার চায়ের সঙ্গে সঙ্গে না পাইলে চা-টাই বিস্বাদ লাগিয়া উঠে! তাই আর বাড়ীতে কাগজ দিয়া যাওয়ার তর না সহিয়া ভোর হইলেই ছুটিয়া যাই নিজেই একখানা কাগজ আনিতে।

কিন্তু হরি! হরি! সেদিন গিয়া আর কাগজ পাইলাম না। না পাইবার সম্ভাবনাটা আগেই কতকটা অনুভব করিতে পারিয়াছিলাম; তাই বিস্মিত হইলাম না—বরং প্রেস্ আইনের বিরুদ্ধে প্রোটেষ্টের গরম গরম উৎসাহে সগর্ব্বে বুক ফুলাইয়া হৃষ্ট মনে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

হৃষ্ট মনে ফিরিয়া আসিলাম বটে, কিন্তু প্রোটেষ্টের উত্তাপ ধীরে ধীরে কমিয়া আসিতে লাগিল। ঘরে পৌঁছিয়া উৎসাহের বেগ আর ও কমিয়া আসিল। মনের ভিতরটায় একটু খুঁৎ খুঁৎ ও করিতে লাগিল—তাইতে খবরগুলিই যে জানিতে পারিলাম না। পুরাণো খবরের কাগজখানি হাতে লইয়া পুরাণো খবরের সঙ্গে নূতন কি ঘটিতে পারে, তাহা লইয়া খানিকটা জল্পনা-কল্পনা করিলাম। তারপর দস্তুর মতো হতাশ হইয়া পড়িলাম।

পরদিন সকালে রাস্তায় বাহির হইয়া দেখিলাম, কেবল আমারই নহে—আরো অনেকের উৎসাহে ভাটি পড়িল বুঝি! আমি ঐ নাইন্টি পার্সেণ্টের দলে—যাহাদের স্বদেশ উদ্ধার মুখে মুখেই হইয়া যায়; সকালে চার পয়সার পুরো কাগজ আর বৈকালে এক-পয়সার টেলিগ্রাফ্ পড়িয়াই যাহারা জাতির স্বাধীনতা-সংগ্রামে আপনার কর্ত্তব্য শেষ হইল বলিয়া মনে করে। তাই খবরের কাগজের অভাবে আমার ভিতরকার রাজনীতির বাতিটী নিবু নিবু হইয়া আসিল।

নিবু নিবু হইল; কিন্তু নিবিল না। পরদিন সকালে উঠিয়াই দেখি,

বাতিটী আবার দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কেমন করিয়া, তাহা বুঝাইয়া বলিতেছি—

বাড়ীর ঠিক ওপাশেই কর্পোরেশনের এক তিন পুরুষে কাউন্সিলরের বাড়ী; তদ্বিরের জোরে উহারা একটী গ্যাসপোষ্ট ঠিক গেটের সুমুখেই আমদানী করিয়াছেন। সকালে উঠিয়া দেখি, অবিখ্যাত গ্যাস্ পোষ্টটী হঠাৎ বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে, আর তাহারি চারি পাশ ঘিরিয়া এক পাল ছেলে-বুড়ো ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে। এতগুলো লোককে ঝুকিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া ব্যাপার কি জানিবার আগ্রহ দমন করিতে পারিলাম না। পাড়ার একটী ম্যালেরিয়ার রোগা পিছনে পড়িয়াছিল; প্রশ্ন করিলে সে আমাকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে গ্যাস্-পোষ্টের দিকে দেখাইয়া দিতেছিল। চাহিয়া দেখিলাম, একটুক্‌রা কাগজে কতগুলি হিজিবিজি লেখার উপরে বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—

"স্বাধীন ভারত"

ভীড়ের চাপে পড়িয়া হেডিংটুকু পর্য্যন্ত দেখিয়াই কৌতূহল সম্বরণ করিতে হইল। তারপর ভীড় কমিলে কাছে গিয়া দেখিলাম—হাতে লেখা একখানি প্যাম্প্লেট—উহাতে ইংরাজকে ভারত হইতে সরিয়া যাইবার জন্য দশ দিন সময় দেওয়া হইয়াছে।

আমার রাজনৈতিক চেতনার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—প্যাম্পলেটটী পড়িয়া যে নিতান্ত মন্দ লাগিল, তাহা নহে। বরং গায়ের রক্ত গরম হইয়া উ'ঠিল, দুচারি ছত্র পড়িতেই ধমনী নাচিতে লাগিল—ভারত উদ্ধারের প্রবল বাসনা বুকের মধ্যে তোলপাড় করিয়া ফিরিতে লাগিল।

কেবল ঐ প্যাম্পলেটই নহে, রাস্তার পথে যেখানেই যাই, সেখানেই দেখি দেওয়ালের দু'পাশে ঐ ধরণের ইস্তাহার। কোনখানিতে অকথ্য

ও অশ্রাব্য ভাষায় রাঙামুখ মাত্রের উপরেই গালি গালাজ করা হইতেছে, কোন খানিতে স্বাধীনতা লাভের উপায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছ, কোনখানিতে জম্‌কালো জম্‌কালো গুজব লিখিয়া ভারতের স্বাধীনতা লাভ যে আর বেশী বিলম্ব নাই তাহা বলা হইয়াছে, কোনোখানিতে বলা হইয়াছে যে চীন্ আসামের পথে আর বল্‌শেভিক পেশোয়ারের পথে ভারতে আসিতেছে; আমাদের কেবল চোখ বুজিয়া অপেক্ষা করিলেই হইল।

কেবল ইহাই কি? মুখে মুখে কত গুজব শুনিতে লাগিলাম! কলিকাতার 'ট' সাহেব চট্টগ্রামে গিয়া বিদ্রোহীর পাকা রাইফেলে ঘায়েল হইয়াছেন, অলিপুরের কালা সাহেব পাঠান কয়েদীর হাতে অন্তিম পথ্য করিয়াছেন, রাতদুপুরে সেণ্ট্রাল জেলের ভিতরকার ময়দানে এরোপ্লেন নামাইয়া সেনগুপ্তকে উদ্ধার করিয়া আরাকানের পাহাড়ে লইয়া গিয়াছে —কেবল সিংহাসনে বসাইয়া দিলেই হয়। এমনি কত কি! পাটনায় কোন্ মিউটিনীর কলেরা লাগিল, তাহার ফলে নেপাল-রাজ গুর্খাদের স্বদেশে ফিরিয়া আসিবার জন্য তলব করিলেন—কলিকাতার লাল-পাগ্‌ড়ী রাতারাতি স্বদেশীর ভেল্কীবাজিতে গান্ধী টুপীতে পরিবর্ত্তিত হল—চীন হইতে সৈন্য আমদানীর কোন জাহাজ জাপানী টর্পেডোর আঘাতে চূরমার হইয়া পীত-সাগরের পীত-সলিলে পাতাল-প্রবেশ করিল, তাহারও কত বিচিত্র-কাহিনি না লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হইতে হইতে হঠাৎ আবির্ভাবের সম্ভবনার কথা শুনিয়াছিলাম, শুনিয়া উল্লসিত যে একটু হইয়া উঠিয়াছিলাম না, তাহা নহে—কারণ দেশোদ্ধার রূপ মহৎ কার্য্যটী অপরের উপরে বরাত দিতেই আমরা অভ্যস্ত। এবার এইসব গুজব ঠিক সেই কারণেই মুখরোচক—থুড়ী—শ্রুতি-রোচক হইয়া উঠিল। সে গুজবের বন্যায় কোথায় ভাসিয়া গেল কংগ্রেস-বুলেটীন্, আর কোথায় রহিল সত্যাগ্রহ-সমিতির ক্ষীণ প্রচার-স্রোত! অসত্যকেই যে বরণ

করিয়া লইয়াছে, সত্যকে সে সহ্য করিতে পারিবে কেন? যেখানেই এইসব আজগুবি গুজবের প্রতিবাদ হইতে দেখিয়াছি, সেখানেই গুজবের প্রচারকেরা খেপিয়া উঠিয়াছেন—"আত্মপক্ষং পরিত্যজ্য পরপক্ষেষু যো রতঃ" পাষণ্ডের শাস্তি বিধান করিবার জন্য আস্তিন পর্য্যন্ত গুটাইয়াছেন!

তারপর কলিকাতার কাগজগুলি বন্ধের কথা। হোয়ার ষ্ট্রীটের নতুন সখা advance করিতে গিয়া প্রথম দিন দুই হাজারী ধাক্কায় পড়িলেন, কেহ sympathy দেখাইতে আসিল না—গোলদিঘির গুঁফো বৈষ্ণবীও না, রাণীমুদিনীর গলির বড়বাবু স্বরাট-ছিঃ ও না। পরদিন ধাক্কাটা লাগিল ইহাদের উপর—টাকার জন্য তলব পড়িল গোলদিঘি আর লাল দীঘির কাছে, বাপ্ বাপ্ ডাক ছাড়িয়া ইঁহারা প্রথমে জামার হাতার ভিতরে হাত ঢুকাইয়া পরে সেই নূলো হাত পেটের মধ্যে পর্য্যন্ত ঢুকাইবার উপক্রম করিলেন।

কেবল তাই নয়, এর-ওর ব্যামোতে হাতুড়ে বদ্যি আর বড়কর্ত্তার রাজবদ্যি। এ্যাড্‌ভান্স্ সন্ধ্যা সাতটা হইতে রাত্রি বারোটা অবধি হাঁক-ডাক ছাড়িয়া যে 'sympathy' পায় নাই, ইহারা তিন তুড়িতে তাহাই আদায় করিয়া বসিল—ইচ্ছায় হোক্ অনিচ্ছায় হোক্—সকলকে সে সহানুভূতির বখ্‌রা দিতেই হইল—সহর কাগজ শূন্য হইল। কেরাণী বাগান আর বাগ্‌বাজারের ইচ্ছা না থাকিলেও মুখে লজ্জা দেখাইতে হইল।

তারপর সহরের এই অবস্থা, খবরের এই দুর্ভিক্ষে অথবা মহাপ্লাবন সীমার স্থলে অসীমেয় এই তাণ্ডব!

আকাশ-পাতাল কত কি ভাবিতে ভাবিতে পথ চলিতেছি—গোল-দীঘির গৌরাঙ্গ-সেবকের পাঁচ হাজার টাকা নজ্‌রানা দিয়া সতীত্ব রক্ষা,—

সেই "একাদশীর দিনে আর যা করিস্ করিস্, মুখটা এঁটো করিস্‌নে" ভাব, শ্রীসরস্বতীর দু'হাজারী নজরে স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিচালনার কথা, রাণীমুদিনীর গলির লিবারটি আর পিলেটীর দাশহাজারী সেলামীর আজ্ঞাপ্রাপ্তি—বারীণের বিস্ফারিত লোচনযুগল চরক-গাছে উঠিবার কাহিনী এবং সঙ্গে সঙ্গে পলিটিক্স-বর্জ্জনকে নবযুগের সূচনা বলিয়া সদম্ভে প্রচার, রাণাঘাটের সংবাদপত্র-বর্জ্জনের অপূর্ব্ব ইতিহাস, আর কলিকাতার জার্ণালিষ্ট সম্মিলনে দীঘিরপাড়ের ফোক্‌লা বৈষ্ণবী কর্ত্তৃক বাগ্‌বাজারের মৃণালভূজকে এবং কালশশি হটাৎ আক্রমণ, হঠাৎ কাহার চীৎকারে চমক ভাঙিল, চাহিয়া দেখিলাম খদ্দর-পরা একটী বাঙালী বাবু নগদ পয়সা গণিয়া লইয়া হাতে লেখা খবরের কাগজ নামধারী কতকগুলি চোতা কাগজ ফিরি করিয়া যাইতেছে আর মুখে হাকিতেছে—

"কলিকাতায় যুগান্তর।"

সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি

শ্রীমতী সুধাদেবী

সাহিত্য সত্যের প্রকাশক। সত্যই ধর্ম্ম, অতএব ধর্ম্ম ভিন্ন সাহিত্য হইতে পারে না। বর্ত্তমান সাহিত্যের গতিও প্রকৃতির আলোচনায় ধর্ম্মের স্থান কোথায় তাহা চিন্তাশীলগণের বিচারের বিষয়ীভূত হইয়াছে। অনেকে বলেন বর্ত্তমান সাহিত্য ধর্ম্ম বর্জ্জিত। আমরা একথা স্বীকার করিতে পারি না। এস্থলে আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের কথা বলা হইতেছে না। প্রত্যেক বস্তুরই ধর্ম্ম আছে, সে হিসাবে সাহিত্যেরও ধর্ম্ম আছে। ধর্ম্মের নীতি বিষয়ক ব্যাপ্তি কতদূর ও তাহার ফল কীদৃশ তাহাই আলোচনা করা উচিত।

যাঁহারা সাহিত্যের স্রষ্টা তাঁহাদের বহু অধ্যয়ন, ভূয়োদর্শন ও আনন্দ-দানের সহিত লোক শিক্ষা প্রদানের ইচ্ছা বিশেষ প্রয়োজন। রসই সাহিত্যের প্রাণ, কিন্তু সেই রস পাঠকদের গুরুপাক বা অপাক হইয়া অহিতকারী না হয়, তাহা দেখা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

শিশুরা যেমন প্রথমে তালপাতায় লিখিতে শিখিয়া, ক্রমে কলাপাতায় ও পরে কাগজে লিখে, সেইরূপ তরুণ সাহিত্যিকদেরও প্রথমে কিছুদিন ঘরে লেখা মক্স করিয়া, হাত পাকাইয়া পরে ছাপাইতে দেওয়া উচিত। স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবু বলিতেন যে কোন রচনা লিখিয়া কিছুকাল ফেলিয়া রাখিবে, পরে নিজেই পাঠ করিয়া নিজের লেখার দোষ দেখিতে পাইবে। নিজের টাট্‌কা লেখার দোষ নিজের চোখে পড়ে না, পুরাতন হইলেই দোষ ধরা পড়ে।

এখন প্রত্যেক পল্লীতেই, কেবল পল্লীতে কেন প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই এক একটী কবি বা সাহিত্যিক দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাদের গাত্র হইতে দুগ্ধের গন্ধ যায় নাই, শ্মশ্রু ও গুম্ফ উঠে নাই, তাঁহারাই প্রেমের কবিতা লেখেন বেশী। যাঁহারা তালপাতায় হাত মক্স করিয়া কলাপতায় লিখিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেন নাই, তাহারাই দেখি বড় বড় মাসিক পত্রের উদীয়মান বা উড্ডীয়মান লেখক। প্রত্যেক পল্লীতে পল্লীতে ব্যাঙের ছাতার ন্যায় নূতন নূতন মাসিক পত্র গজাইয়া উঠিতেছে, অবশ্য তাহাদের স্থায়িত্ব বা জীবন ক্ষণস্থায়ী। হয় তো কেহ কেহ বলিবেন ঘরে ঘরে পল্লীতে পল্লীতে সাহিত্যিক বা কবির জন্ম এবং মাসিকপত্রের বাহুল্য দেশের উন্নতির পরিচায়ক। কিন্তু আমাদের মতে কতকগুলি আগাছার বৃদ্ধিতে সাহিত্যের আবর্জ্জনাই বৃদ্ধি পায়।

বাস্তবিক এক সময়ে ফরাসী সাহিত্যে এইরূপ অসংখ্য অকালপক্ক সাহিত্যিকের আবির্ভাব হইয়াছিল। পণ্ডিতগণ প্রথমে জাতীয় জীবন

উষার তরুণ অরুণ আলোক বলিয়া সাদরে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। পরে যখন বুঝিতে পারিলেন, ইহা সাহিত্যের জঞ্জাল, তখন সমালোচনার তীব্র সম্মার্জ্জনীর প্রহারে সৎ সাহিত্যের আসর হইতে ঝাঁটাইয়া দিলেন।

বর্ত্তমানে আমাদের বঙ্গ-সাহিত্যে এইরূপ তীব্র কশাঘাতের ও সম্মার্জ্জনী প্রহারের আবশ্যক হইয়াছে। অনেক সময় মূর্ধন্য লাঠ্যৌষধিরও প্রয়োজন হয়।

অবশ্য একথা বলিতেছি না যে, সমস্তই স্কুল পাঠ্য-পুস্তক বা ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক পুস্তক রচিত হউক। "সদা সত্য কথা বলিবে," "কখন মিথ্যা কথা বলিবে না", গোপাল অতি সুবোধ বালক, মা যাহা দেন, তাহাই খায়"—এ সকল অবশ্য বাস্তব জীবনে সব সময়ে ঘটে না। সংসারে ভাল মন্দ উভয়ই আছে। উপন্যাসে ভাল মন্দ উভয় চরিত্রই ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। অন্ধকার না থাকিলে আলোকের মাধুর্য্য থাকে না। মন্দ চরিত্র না থাকিলে সৎ চরিত্র ফুটিয়া উঠে না। সৎ ও অসৎ উভয় চরিত্রই চিত্রিত করিবে কিন্তু পরিণামে মহৎ চরিত্রের প্রতি যাহাতে পাঠকের শ্রদ্ধা আসে, এরূপ ভাবে আঁকিবে! পাপকে ঘৃণা করিও কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করিবে না। পাপীর মনে অনুতাপ আনিয়া দিবে। মূলতঃ আমাদের কথা এই যে, ভালমন্দ উভয়বিধ চরিত্র যেরূপেই চিত্রিত কর না কেন তাহার স্থায়ী রস হয় যেন ভালর দিকে।

সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতা বলে একটা কথা উঠিয়াছে। বস্তুতন্ত্রতার নামে যে কেবল নগ্নতা ও ছাগতন্ত্রতার প্রচার করিবে, ইহা কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। সমাজের খারাপ জিনিষ দেখাইতে পার কখন? না যখন উহা সংশোধনের চেষ্টা করিবে। কিন্তু তোমরা সমাজের কু-আদর্শ-গুলি চোখের সামনে অতিশয় রঙ্গীন তুলিতে চিত্রিত করিয়া দেখাইতেছ, লোককে অসৎ পথে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে, সৌন্দর্য্যের

আবরণে মন্দের দিকে পাঠককে প্রলুব্ধ করিতে। তোমাদের উদ্দেশ্য তো ভাল নয়,—কাজেই তোমাদের সমর্থন করিতে ইতস্ততঃ করিতে হয়।

বস্তুতন্ত্রতার দোহাই দিয়া তোমরা যত ইচ্ছা নিজের মনের মত মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ কর, যত ইচ্ছা জঘন্য ভাবে চরিত্র চিত্রিত কর কিন্তু লক্ষ্য থাকে যেন দেশকে, জাতিকে, সমাজকে উন্নতির পথে লইয়া যাইব; মহৎ আদর্শের পবিত্র গন্ধে লোকের মনপ্রাণ ভরিয়া দিব।

সৃষ্টির প্রথম হইতেই মানব-মানবীর প্রেম বিদ্যমান আছে। প্রেম অতি পবিত্র বস্তু। এই প্রেমকেই অবলম্বন করিয়াই সেই আদি যুগ হইতে কত না কাব্য, সাহিত্য, গাঁথা রচিত হইয়া বিশ্বের সাহিত্যকে নন্দনকাননে পরিণত করিয়াছে। সেই পবিত্র প্রেমকে অবলম্বন করিয়া তোমরা কাব্য সাহিত্য রচনা কর, সেত ভাল কথা। কিন্তু সেই পবিত্র প্রেমের নামে হে তরুণ! তোমরা কি রচনা করিতেছ, একবার ভাবিয়া দেখ! ইহা কি বস্তুতন্ত্রতার নামে ছাগতন্ত্র নয়!

পবিত্র প্রেমের নামে তোমরা পশুর কাম প্রবৃত্তিকে সাহিত্যে চালাইতেছ। বিমাতা ও পুত্রে, ভাই ও ভগ্নিতে আসঙ্গলিপ্সা তোমাদের লেখাতেই বাহির হইতেছে। জ্যেঠী, খুড়ী, মাসী, পিসি, ভাতৃবধু, বন্ধু পত্নী, সকলের সঙ্গেই Free love দেখাইতেছ। তোমাদের সাহিত্যকে ছাগ-সাহিত্য ছাড়া আর কি বলিব। এ সকল বিলাতী Free love আমাদের দেশে আমদানী করিয়া কি সুফল হইবে মন কর! ছিঃ তোমাদের ঘরে কি মা বোন নাই! তাঁহাদের স্মরণ করিয়াও কি তোমাদের এ সকল লিখিতে লজ্জা হয় না। তোমরাই আবার শিক্ষিত বলিয়া গর্ব্ব কর! ধিক্ তোমাদের শিক্ষাকে! ধিক্ তোমাদের আদর্শকে!

হে তরুণ সাহিত্যিকগণ! তোমরাই আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধর।

তোমরাই জাতির মেরুদণ্ড। তোমরা এখনও সাবধান হও। আদর্শ কখন নীচু করিও না। যতই অসম্ভব হোক্ উচ্চ আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। স্বর্গের আদর্শ মনে থাকিলে, স্বর্গে না যাইতে পার, অন্ততঃ তাহার কাছাকাছিও যাইতে পারিবে। ওঁ শান্তিঃ ওঁ।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কয়েকটী কবিতা।

(জনৈক সবুজ-সাহিত্যিক কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত)

(১) দুটি চুম্বনের ছোয়াছুঁয়ি মাঝে যেন সরমের হাস
দুখানি অলস আঁখি-পাতা মাঝে সুখ-স্বপন আভাস।
(কড়ি ও কোমল)

(২) নারীর প্রাণের প্রেম মধুর কোমল
বিকশিত যৌবনের বসন্ত সমীরে
কুসুমিত হ'য়ে ওই ফুটেছে বাহিরে
সৌরভ সুধায় করে পরাণ পাগল (ঐ গ্রন্থে 'স্তন' কবিতা)

(৩) অধরের কোনে যেন অধরের ভাষা
দোঁহার হৃদয় যেন দোঁহে পান করে।
গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি ভালবাসা
তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধর সঙ্গমে।

* * *

ব্যাকুল বাসনা দুটি চাহে পরস্পরে
দেহের সীমায় আসি দু'জনের দেখা
প্রেম লিখিতেছে গান কোমল আখরে
অধরেতে থরে থরে চুম্বনের লেখা। (কড়ি ও কোমল)

(৪) কাহারে জড়াতে চাহে দুটি বাহুলতা
কাহারে কাঁদিয়া বলে যেও না যেও না।

* * *

লতায়ে থাকুক বুকে চির আলিঙ্গন
ছিড়ো না ছিড়ো না দুটি বাহুর বন্ধন। (কড়ি ও কোমল)

(৫) প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন।
হৃদয়ে আচ্ছন্ন দেহ হৃদয়ের ভরে
মুরছি পড়িতে চায় তব দেহ পরে। (কড়ি ও কোমল)

(৬) ওই তনুখানি তব আমি ভালবাসি
এ প্রাণ তোমার দেহে হয়েছে উদাসী।

* * *

ওই দেহখানি বুকে তুলে নেব বালা
চতুর্দ্দশ বসন্তের একগাছি মালা। (কড়ি ও কোমল)

(৭) কোমল দুখানি বাহু সরমে লতায়ে
বিকশিত স্তন দুটি আগুলিয়া রয়।

* * *

তারি মাঝে আমারে কি রাখিবে যতনে
হৃদয়ের সুমধুর স্বপন শয়নে। (কড়ি ও কোমল)

(৮) উরসে পড়ি যুথির হার বসনে মাথা ঢাকি
বনের পথে নদীর ধারে অন্ধকারে বেড়াবে ধীরে

গন্ধটুকু সন্ধ্যা-বায়ে রেখার মত রাখি।
বাজিবে তার চরণধ্বনি বুকের শিরে শিরে,

কখন্ কাছে না আসিতে সে পরশ যেন লাগিবে এসে
যেমন করে দখিন বায়ু জাগায় ধরণীরে। (মানসী)

(৯) আমি, কুন্তল দিব খুলে।
অঞ্চল মাঝে ঢাকিব তোমায়
নিশীথ নিবিড় চুলে।
দুটি বাহু পাশে বাঁধি নত মুখখানি
বক্ষে লইব তুলে। (মানসী)

(১০) বীণা ফেলে দিয়ে এস মানস-সুন্দরী,
দুটি রিক্তহস্ত শুধু আলিঙ্গনে ভরি'
কণ্ঠে জড়াইয়া দাও * *
চুম্বন মাগিব যবে, ঈষৎ হাসিয়া
বাঁকাওনা গ্রীবাখানি ফিরাও না মুখ—
* * *
রেখো ওষ্ঠাধরপুটে, ভক্ত ভৃঙ্গ তরে
সম্পূর্ণ চুম্বন এক। (সোনারতরী)

(১১) হে বঁধু এ স্বচ্ছ বাস করে মোরে পরিহাস
সতত রাখিতে নারি ধরিয়া।
চাহিয়া আঁখির কোণে তুমি হাস মনে মনে
আমি তাই লাজে যাই মরিয়া। (সোনার তরী)

(১২) ফেল গো বসন ফেল—ঘুচাও অঞ্চল,
পর শুধু সৌন্দর্য্যের নগ্ন আভরণ। (কড়ি ও কোমল)

(১৩) নীলাম্বরে কিবা কাজ তীরে ফেলে এস আজ,
ঢেকে দিব সব লাজ সুনীল জলে। (সোনার তরী)

(১৪) আয় রে ঝঞ্ঝা, পারণ বধুর
আবরণ রাশি, করিয়া দে দূর,
করি লুণ্ঠন অবগুণ্ঠন বসন খোল্। (সোনার তরী)

(১৫) হের আজি নিদ্রিতা মেদিনী
ঘরে ঘরে রুদ্ধ বাতায়ন। আমি একা
আছি জেগে, তুমি একাকিনী দেহ দেখা
এই বিশ্ব সুপ্তি মাঝে * *
বক্ষ হতে লহ টানি
অঞ্চল তোমার, দাও আবরিত করি
শুভ্র ভাল * * একটি চুম্বন
ললাটে রাখিয়া যাও * * আলিঙ্গন-স্মৃতি
অঙ্গে তরঙ্গিয়া দাও * * (চিত্রা)

(১৬) যদি হেথা খুঁজে পাই মাথা রাখিবার ঠাঁই
বেচা কেনা ফেলে যাই এখনি
যেখানে পথের বাঁকে গেলচলি নত-আঁখে
ভরা ঘট লয়ে কাঁখে তরুণী!
এই ঘাটে বাঁধ মোর তরণী। (চিত্রা)

(১৭) কালি, মধু যামিনীতে জ্যোৎস্না নিশীথে
কুঞ্জ কাননে সুখে
ফেনিলোচ্ছল যৌবন সুরা
ধরেছি তোমার মুখে।
তুমি, চেয়ে আঁখি পরে
ধীরে, পাত্র লয়েছ করে
হেসে করিয়াছ পান চুম্বন ভরা
সরস বিম্বাধরে।
* * *

তব অবগুণ্ঠন খানি
আমি খুলে ফেলেছিনু টানি
আমি কেড়ে রেখেছিনু বক্ষে, তোমার
কমল-কোমল পানি।

* * *

আমি শিথিল করিয়া পাশ
খুলে দিয়েছিনু কেশ রাশ,
তব, আনমিত মুখ খানি
সুখে থুয়েছিনু বুকে আনি,
তুমি সকল সোহাগ সয়েছিলে, সখি,
হাসি মুকুলিত মুখে,
কালি মধুযামিনীতে জ্যোৎস্না নিশীথে
নবীন মিলন-সুখে!

হক্ কথা

মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্ত্তিত আইন-অমান্য আন্দোলন যে-ভাবে ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতে এই আন্দোলনই যে ভারতে স্বাধীনতার শেষ আন্দোলন এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। হাজার হাজার বৎসরের অন্ধকার ঘর চকমকির একটী ঘর্ষণে আলোকিত হইয়া ওঠে—আমাদের স্বাধীনতা অন্দোলন সেই ১৮৫৭ সাল হইতে আজ পর্য্যন্ত বহুবার ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া এবারেও যে ব্যর্থ হইবে, এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার আশি জন অনুচর সহ আইন-ভঙ্গে যখন প্রথম যাত্রা

করেন, তখন তিনি আইন-ভঙ্গের সমুদয় দায়িত্ব নিজের মাথায়ই লইয়াছিলেন—দেশময় আইন-ভঙ্গ আন্দোলনের প্রবর্ত্তন কর, এরূপ কথা মুখ ফুটিয়া বলেন নাই। কিন্তু মহাত্মার যাত্রার একমাস শেষ হইতে না হইতে তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সমগ্র দেশ আইন-ভঙ্গের জন্য প্রস্তুত হইল এবং মহাত্মার সঙ্গে একই দিনে সত্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল।

এই যে সংগ্রাম, ইহা পরিচালনের পথ নির্ব্বিঘ্ন ও নিরঙ্কুশ নহে। হাতে-কলমে আইন-ভঙ্গ করিতে গিয়া সকলকেই কারাবরণ করিতে হইবে, এইরূপ ছিল নেতৃবৃন্দের ধারণা। অসহযোগ আন্দোলনের সময় গবর্ণমেণ্ট এইরূপ দেশব্যাপী গ্রেপ্তারী নীতি চালাইয়াছিলেন; ফলে জেলগুলি অল্পকাল মধ্যে "স্বদেশীওয়ালা"তে ভরিয়া উঠিয়াছিল। এবারে গবর্ণমেটের নীতি স্বতন্ত্র। দু'একজন নেতাকে বাদ দিয়া অধিকাংশ বড় বড় নেতাদের গ্রেপ্তার করা হইতেছে বটে; কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকগণকে জেল-গমনের নিশ্চিন্ত বিশ্রাম না দিয়া প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। যাহারা লবণ তৈয়ারী করিতেছে, তাহারা অশেষ লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতন সহিয়া—সর্ব্বাঙ্গ লাঠির আঘাতে জর্জ্জরিত করিয়াই তাহা করিতেছে।

* * * *

কেবল লাঠিরই ভয় নহে, বন্দুকের গুলীতেও মৃত্যু-ঘটিবার আশঙ্কাও আছে। স্বৈরাচার পুলিশের গুলী-বর্ষণের ফলে স্বেচ্ছাসেবকদের প্রাণ-ত্যাগের খবর ও নানা স্থান হইতে আসিতেছে আর নূতন নূতন দেশ-প্রেমিক যুবক তাহাদের স্থানগ্রহণ করিতেছে। যে দিন জাতি প্রাণ দিবার জন্য প্রস্তুত হইবে, সে দিন জাতি স্বাধীন হইবে, আমাদের এ চিরন্তন

ধারণা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে স্বাধীনতা যে নিষ্কটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে, তাহার ভুল নাই।

* * * *

মহাত্মা গান্ধীর ইচ্ছা ও নির্দ্দেশ মতো এই আন্দোলন অহিংস। যে অসহযোগ আন্দোলনের প্লাবনে দেশ জাতি ভাসিয়া গিয়াছিল, তাহা ও ছিল অহিংস। অসহযোগ আন্দোলনের অবসানের পরে জাতির রাজনৈতিক মনোবৃত্তির যে ধারা আমরা অনুভব করিতাম, তাহা পুরাপুরি অহিংস ছিল না। কিন্তু মহাত্মার অপূর্ব্ব ব্যক্তিত্বের ফলে দেশ আবার অহিংস নীতি গ্রহণ করিয়াছে, বর্ব্বতার বিরুদ্ধে ধর্ম্ম-সংগ্রামের শেষ পরীক্ষা হিসাবে। পরীক্ষা হিসাবে গৃহীত হইলেও জাতি যে এই অহিংসা নীতি বিশ্বস্তভাবে পালন করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর, তাহা নির্য্যাতীত দেশ-সেবকগণের অসাধারণ ধৈর্য্যশক্তি হইতেই বুঝা যায়। ভবানীপুর, করাচী প্রভৃতি অঞ্চলে অহিংসা নীতির যে টুকু ব্যতিক্রম, তাহা উৎপীড়ক পুলিশেরই প্ররোচনার ফল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

* * * * *

ব্যতিক্রম চট্টোগ্রামে। আরব্য রজনীর বিস্ময়কর উপকথার মতো চট্টগ্রামে যাহা ঘটীয়া গেল, তাহার মূল উৎস যে শৃঙ্খলাবদ্ধ বিপ্লব প্রচেষ্ঠাতেই একথা অস্বীকার করায় গৌরব নাই। স্বাধীনতার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা যেমন জাতির চিরদিনই ছিল, বিপ্লব-প্রচেষ্টাও তেমনি গবর্ণমেণ্টের দিগন্তপ্রসারী গুপ্তচর-প্রথাকে প্রতারিত করিয়া তলে তলে চলিতেছিল। কিন্তু বাংলার বিপ্লবীরা যে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর চড়াও করিয়া কয়েক ঘণ্টা স্বাধীকারে রাখিয়া অর্থ ও আগ্নেয়স্ত্রাদি লুট করিয়া লইয়া বিপুল বিক্রমে অগ্নিবর্ষণ করিতে করিতে পাহাড়ের অন্তরালে অন্তর্হিত হইতে পারিবে, এরূপ কে ভাবিয়াছিল। বলপ্রযোগের সাহায্যে স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা হইলেও শান্তি প্রতিষ্ঠা হইবে না। কিন্তু যাঁহাদের এইরূপ ধারণা যে বলপ্রয়োগের সাহায্যে স্বাধীনতা অর্জ্জন করা ভারতের পক্ষে সম্ভব, তাঁহারা এই ঘটনায় মত-পরিবর্ত্তনে প্রবুদ্ধ হইতে পারেন!

* * * *

মহাত্মা গান্ধী চট্টগ্রামের ব্যাপার সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন —"আমি আশা করিয়াছিলাম যে বিপ্লবীরা আমাকে অন্ততঃ তিন মাস সময় দিবেন।" ভাবপ্রবণ মহাত্মাজী একথা অবশ্যই অত্যন্ত গভীর দুঃখের সহিত বলিয়াছেন। বিস্ময়ের সহিত অবলোকন করিলেও ভারতব্যাপী অহিংস সংগ্রামের একটী হিংসামূলক আয়োজনে আমরা অস্বস্তি বোধ করিতেছি।

* * * *

আজ চট্টগ্রামে যাহা সংঘটিত হইয়াছে, যদি কাল তাহা বরিশালে, পরশ্ব তমলুকে, তৎপর দিবস বহরমপুরে তৎপর দিবস ঢাকায়, মাদারীপুরে, ময়মনসিংহে, হাওড়ায়, বীরভূমে, সংঘটিত হইবার আশঙ্কা থাকিত, তাহা হইলে অহিংস-অন্দোলন বন্ধ করিবার আবশ্যকতা জন্মিত। কিন্তু দেশের সৌভাগ্যক্রমে চট্টগ্রামে শরতের মেঘ-নির্ম্মল আকাশে হঠাৎ মেঘ-গর্জ্জন, অতএব ইহার জন্য অহিংসা আন্দোলন স্থগিদ্ রাখিবার প্রয়োজন নাই—মহাত্মা গান্ধীর এই উক্তি আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।

* * * *

গবর্ণমেণ্টের নূতন অর্ডিনান্স্ সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করিবার জন্য আর একবার করাল হস্ত প্রসারিত করিয়াছে। উৎপীড়ক শাসক যখন শাসনাধিকার রক্ষায় মরিয়া হইয়া ওঠে, তখন এমনি করিয়াই তাহার জ্ঞানবুদ্ধির বিপর্য্যয় হয়। দিল্লীর জাতীয় সংবাদপত্রগুলির কাছে সিকিউরিটীর টাকা চাহিয়া পাঠানোয় তাহারা কাগজের প্রচার বন্ধ করিয়া

দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। কলিকাতায়ও কতকটা তাহাই হইয়াছে। সংবাদপত্রগুলি উঠিয়া গেলেই এদেশে আমলাতন্ত্রের দৃঢ়তর প্রতিষ্ঠার পথ নিষ্কণ্টক হইয়া উঠিবে—না, উদ্বিগ্ন জনসাধারণ মারাত্মক রকমের গুজব শ্রবণে ক্ষিপ্ত হইয়া দেশে শান্তি-প্রতিষ্ঠার পথ অধিকতর কণ্টকাকীর্ণ করিয়া তুলিবে ?

* * * *

অবশ্য গবর্ণমেণ্ট যদি মনে করেন যে একদল নরনারী শান্তিপ্রিয় জনসাধারণকে নানা উপায়ে উত্তেজিত করিতেছে, বাহিরের উত্তেজনা বন্ধ হইলেই এই আন্দোলন থামিয়া যাইবে—তাহা অত্যান্ত ভ্রমাত্মক ; যদি স্বাধীনতালাভের জন্য কেহ ক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, দেশের জনসাধারণই হইয়াছে ; তাহাদের দুঃখদুর্দ্দশা সম্যক্ দূর না করিলে তাহারা থামিবে না—সরকারী নির্যাতনের ফলে নেতার অভাব ঘটিলে, তাহাদের মধ্য হইতেই নেতার সৃষ্টি হইবে—সংবাদের আদান-প্রদান বন্ধ হইলেও তাহাদের উৎসাহ-উৎস বন্ধ হইবে না, আপন বেগে চলিতে থাকিবেই। বরং সংযমিত করিবার লোকের অভাবে এক-এক কালে তাহাদের ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিবারই সম্ভবনা থাকিবে।

* * * *

কলিকাতার গাড়োয়ান-হাঙ্গামা সম্পর্কে ষড়যন্ত্র ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার প্ররোচনা প্রভৃতি বহুবিধ অভিযোগ কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর শ্রীযুত মদনমোহন বর্ম্মণ্, স্বামী বিশ্বানন্দ, বঙ্কিম মুখার্জ্জী, মিঃ গড্‌বোল ও মিঃ আবদুল মোমিন্ একবৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। ঐ দণ্ডভোগের পরে আরও তিন বৎসর সৎভাবে জীবন-যাপনের জন্য শ্রীযুত বর্ম্মণকে দশ হাজার টাকার এবং অপরাপর আসামীদের প্রত্যেককে দুই হাজার টাকার জামীন দিতে হইবে। জামীন না দিলে

তাঁহাদের আরও তিন বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। এইরূপ কঠোর শাস্তির ব্যবস্থায় আমরা বিস্মিত হই নাই, কারণ গবর্ণমেণ্ট আজকাল এত ক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছেন যে তাঁহাদের কাছে ন্যায়-বিচারের আশা একান্তই সুদূরপরাহত।

* * * *

বিলাতের প্রধান প্রধান সংবাদপত্র এইরূপ লিখিতেছে যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ তঁহোদের জানিতে দেওয়া হয় না ; তাঁহাদের নিকটে প্রেরিত সংবাদের উপরে যে কাট-ছাট হইতেছে, সেকথাও তাহারা গর্ব্ব সহকারে নির্দ্দেশ করিতেছেন। এই সেন্সারের ফলে বিলাতের জনসাধারণ যেরূপ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে, তাহা কখনই উপেক্ষার বিষয় নহে। ভারতের এ্যাংলোইণ্ডিয়ান্ সংবাদপত্রসমূহ তাহাদিগকে এই স্তোক-বাক্যে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছে যে বিলাতের সংবাদপত্রসমূহ নিত্যনূতন জম্‌কাল সংবাদ চায় ; অথচ ভারতে তেমন কিছুই ঘটিতেছেনা বলিয়াই তাহাদের এই মিথ্যা উদ্বেগ ! কিন্তু এ্যাংলোইণ্ডিয়ান্ সংবাদপত্রের এইরূপ মিথ্যা স্তোকবাক্যে ভবী ভুলিবে কি ?

* * * *

আমেরিকা কিন্তু ভারতের জাতীয় আন্দোলন সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ সরবরাহের ব্যবস্থা ইতিমধ্যে করিয়া বসিয়াছে। মহাত্মাজীর সঙ্গে সঙ্গেই এক আমেরিকান্ সংবাদদাতা ঘুরিতেছিলেন এবং খোদ মহাত্মাজীর মুখে শোনা বাছা বাছা সংবাদগুলি স্বদেশে প্রেরণ করিয়াছেন। এই সংবাদগুলি আবার আমেরিকার সংবাদপত্রসমূহে বড় বড় হেডিংএ প্রকাশিত ও প্রচারিত হইতেছে। প্যারীর সংবাদে প্রকাশ যে, ফরাসীরাও এই সকল সংবাদ আগ্রেহের সহিত সংগ্রহ ও প্রচার করিতেছে। ভারতের

এই জাতীয়-সংগ্রামের গুরুত্ব যে সকলেই আজ উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

* * * *

টেরিফ্ বিলের সাহয্যে ব্রিটিশ সূত্রজাত দ্রব্যের শুল্ক কমাইয়া এবং অপরাপর দেশাগত সূতাদ্রব্যে শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া ভারতে জাপানী বস্ত্র ও সূত্রের ব্যবসায় বন্ধ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট যে চাল চালিয়াছিলেন জাপান তাহা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। জাপান-গবর্ণমেণ্ট্ সূত্রদ্রব্যের রপ্তানী শুল্ক অনেক পরিমাণে হ্রাস করিয়া দিয়াছেন; জাপানী জাহাজ-কোম্পানীর জাপানী বস্ত্র ও সূত্রের মাশুল কমাইয়া নামমাত্র করিয়া দিয়াছেন। এতে জাপানী বস্ত্রাদি যাহাতে ভারতে অধিকতর সস্তায় চলিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে। ভারতে ভারতীয় কোম্পানীর প্রস্তুত বস্ত্রাদির প্রচলনই আমাদের একমাত্র কাম্য সন্দেহ নাই; কিন্তু রাজনৈতিক কারণে ব্রিটিশ-জাত বস্ত্র অপেক্ষা জাপ. বস্ত্র আমাদের কাছে অপেক্ষাকৃত কাম্য বস্তু। যখন দেখিবে ভারতে প্রস্তুত বস্ত্র দ্বারা ভারতবাসীর লজ্জা-নিবারণ হয় না, তখন আমরা শরণ লইব—ইংলণ্ডের নহে।

* * * *

মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্য সংগ্রামে যেদিন যাত্রা করেন সেই দিনটী ছিল ত্র্যহস্পর্শ। ষ্টেট্স্ম্যানের পি-এন্-জী এজন্য ঠাট্টা করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, ত্র্যহস্পর্শের যাত্রা সফল হইবে না। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন-অমান্য সমিতি প্রথম যে পাঁচশত টাকা লইয়া লবণ আইন ভঙ্গের অন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন, কেহ কেহ সন্দেহ করেন, দাতার অর্থ অসদুপায়ে অর্জ্জিত। সেই অর্থের সাহায্যে আন্দোলন যদি বন্ধ

না হয় তাহাহইলে ত্র্যহস্পর্শের জন্যই হইবে না। * * ঐ টাকাগুলি দিয়াছিল নেত্রকোনার ...'কান্ত', ইনি পি-এন-জীর বন্ধু বলেই বোধ হয় সত্য কথাটা পি-এন, জীর কলমে বের হয় নাই!

* * * *

সে যাহাই হৌক্—বাংলার যে ত্র্যহস্পর্শ-যোগ ঘটিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংলিশম্যানের বিপিন পাল, ষ্টেট্স্ম্যানের পি-এন্-জী এবং বেঙ্গলীর শর্ম্মা, তিনজনে মিলিয়া এই ত্র্যহস্পর্শ ঘটাইয়াছে। গান্ধী আন্দোলনের রামায়ণের মধ্যে ইহারা যে ভূতের কিচির-মিচির আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে ইহাদের জন্য মধ্যমনারায়ণের ব্যবস্থা আত্যাবশ্যকীয় হইয়া পড়িয়াছে।

সাহিত্য ও অসাহিত্য

একাঙ্ক নাটিকার বাজার আগে শ্রীহীন মন্মথ রায়েরই একচেটিয়া ছিল—কিছুদিন অবধি অচিন্ত্যকুমার হাত বাড়াইয়াছেন। বৈশাখ মাসের ভারতবর্ষে তাঁহার একখানি একাঙ্ক নাটক বাহির হইয়াছে—পূর্ব্বরাগ! রমেশ আর রুনু পরস্পরকে ভালবাসিত; শেষে তাহারা বিচ্ছিন্ন হয় এবং রুনুর ভালবাসা পড়ে গিয়া শীতাংশুবাবু নামক আর এক ভাগ্যবানের উপরে, শীতাংশুবাবুর সঙ্গে রুনুর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। হঠাৎ একদিন রমেশ একটা খালি রিভলবার লইয়া রুনুদের ঘরে প্রবেশ করিয়া রুনুকে ও তাহার মেজকাকাকে ভয় দেখাইয়া রুনুর চিত্তে আবার অনুরাগের সৃষ্টি করিয়া ঝড়ের মতো বাহির হইয়া গেল।—ইহাই অচিন্ত্য

বাবুর মূল গল্প। এই গল্পাংশটুকু নটিকীয় ভাবে ফুটাইয়া তুলিতে লেখক এমন সব কথার অবতারণা করিয়াছেন, যাহা অত্যন্ত অদ্ভুত!

* * * *

লেখাটীর মধ্যে নাটকীয় ভাষা ও নাটকীয় Pose ভরিয়া দিতে লেখকের চেষ্টার অবধি নাই। কিন্তু হাস্তরস আর করুণ রসের সামঞ্জস্য করিতে গিয়া লেখক কোন দিকেই তাল সাম্‌লাইতে পারেন নাই। তা ছাড়া সময় সময় ইংরেজী ইডিয়মের তর্জ্জমা করে লেখা বা ইংরেজী ইতিহাসের 'রেফারেন্স' লেখাটীকে প্রায় অপাঠ্য করে তুলেছে। 'ওরিয়েণ্টাল আভুলগুলি' 'এলিজাবেথান্ যুগের প্রমত্ত প্রেমিকের মত' 'এত বাধ্য মেয়ে ওফিলিয়া' 'পুনরুক্তিটা ভাষাজ্ঞানের পরিচয় নয়' 'ওরিজিন্যালিটী আসে' 'ইকনমি শেখ' 'ওসব বক্তৃতা রাত্রে মশারির নীচে শুন্‌তে হয়' 'নাদির-শা নেপোলিয়ানের মন গলাতে পারে'—এ সব কথার ব্যবহার দেখিয়া ভুলিয়া যাইতে হয় যে, বাংলা লেখা পড়িতেছি।

* * * *

এই নাটিকার কয়েকটা বাছা বাছা অংশ দেখুন—

(১) বিয়ে ত' সবারই হয়—তার জন্যে দু'টী মুড়ি কে refuse করে? আমি ত' আর চুমু খেতে চাইনি।

(২) তোমাকে ভারী সুন্দরী দেখাচ্ছে রুনু, পরস্ত্রী বলে বোধ হয়!

(৩) তুমি চিরকুমারী থাক্‌বে কেন? আমার টাটানগরের কোয়ার্টারে কি তোমার জন্য আরেকখানা খাট পড়্‌তে পারে না?

(৪) ব্লাউজের বোতামগুলি সব খুলে দাও—

(৫) শুন্‌ছি মেয়ে-কলেজে মাষ্টারি কর্‌তে হ'লে বাড়ীতে একটী বোষ্টম দরকার।

* * * *

শ্রীযুত সৌরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'লজ্জাবতীর' সম্ভবতঃ অর্দ্ধেকটা এই বৈশাখ মাসের ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। ছেলের বাপ ও মেয়ের বাপ্ একত্র হইয়া ছেলে-বৌকে পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিতেছেন—ছেলে অতিষ্ঠ হইয়া প্রিয়ার সহিত মিলনের অনেক চেষ্টা করিয়া অবশেষে সংসার-বিরাগী হইয়া দূরদেশে গিয়া একাকী বাস করিতেছে, বৈশাখে প্রকাশিত অংশের চুম্বক। কিন্তু ছেলের ও ছেলের শ্বশুরের একপাল বন্ধু আবিষ্কার করিয়া লেখক এই ক্ষুদ্র গল্পাংশকে রবারের মত টানিয়া একখানি নভেলে পরিণত করিয়াছেন। বন্ধু-মহলের ইয়ার্কীর সবিস্তার বর্ণনা দিয়া ছোট গল্পকে নভেলে রূপান্তরিত করা প্রবীণ্ লেখক সৌরীনবাবুর উপযুক্ত হয় নাই।

ঝুনো কবি শ্রীগিরিজাকুমার বসুর কবি-প্রতিভায় আমাদের একটুও সন্দেহ নাই। ভক্ত যেমন ভগবানের ভাণ্ডার হইতে শক্তি আহরণ করেন, ইনিও তেমনি রবীন্দ্রনাথের বিরাট প্রতিভার কতকাংশ নিজস্ব করিয়াছেন! তাহার প্রমাণ—প্রবাসীতে তাঁহারই শ্রীলেখনীনিঃসৃতঃ বাণী—

"ললাটে আমার মুদ্রিত হের
প্রতিভা-অভিজ্ঞান
নয়নে আমার প্রতিভার ছবি
হৃদয়ে তাহারি ধ্যান।
অন্তর-ভরা প্রতিভার সুর
বাণীতে আমার বাজে,
চমকিত ক্ষিতি, প্রণত আমার
প্রতিভার পায়ে রাজে।"

আহা! দাদার সুরে সুর মিলাইয়া আমাদের প্রতিধ্বনি করিতে ইচ্ছা হইতেছে—

কুন্তল-বিরল মাথায় তোমার
আহা মরি চারু টাক—
নাসিকার নীচে নাহিক গুম্ফ
সুয়েজ্ ক্যানেল্ ফাঁক!
তমাল-তলার ছায়ায় মধুর
কাব্য-কুঞ্জে থাকো
এমন প্রতিভা—আহা মরি মরি!
কোথা খুঁজে পাবে নাকো।

এই বিজ্ঞপ্তির পরেও যদি কেহ ইঁহার প্রতিভায় সন্দেহ করেন, তাহা হইলে তিনি.....

চোরবাগানের রায় বাহাদুর তারকনাথ সাধু সি-আই-ই'র একখানি রঙ্গ কবিতার বই বাহির হইয়াছে—হুদ্দাদার। এই বইখানি পড়িয়া দেখিবার সুকৃতি আমাদের হয় নাই; তবে মাসিকে মাসিকে ইহার সপ্রশংস সমালোচনা এবং বহু ছড়ার কোটেশন পড়িতেছি। আমাদের সুকৃতি না থাকিলেও ইহা যে তাঁহার সুকৃতির পরিচয়, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। যাঁহারা ক্ষীর ভোজন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের লেখনী-মুখে যে ক্ষীর বাহির হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহার আগমন মধুময় হউক!'

লীলাময় রায় রচনায় রচনায় দেশের তরুণ-ঘেঁসা মাসিকগুলি ভরিয়া

দিতেছেন। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণ-কাহিনী আর কথানাট্য—একেবারে 'সম-চতুষ্কোন'! এমন অজস্র লেখা রবীন্দ্রনাথের পরে আর কাহাকেও লিখিতে দেখি নাই। এই লীলাময় রায় বিচিত্রায় তাঁহার সত্যাসত্য উপন্যাসে লিখিয়াছেন যে উজ্জয়িনীর বাপ যোগানন্দ মেয়েকে—সাহস করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা খুকী, একটী সুন্দর ছেলে যদি তোকে এসে বলে, 'তোমাকে আমি বিয়ে কর্‌তে চাই, তা হ'লে...?"

বাপের সাহস বটে! সুন্দর ছেলের লোভ দেখাইবেন, তাও সাহসের দরকার! এ মেয়ে চড়িয়া বেড়ায় কিনা, তাহার হদিস্ কে দিবে? তারপর মেয়ে যখন প্রশ্ন করিয়া বসিল, "বাবা, তুমি কি আমার বিয়ে দিতে চাও?" তখন বাপ্ কৈফিয়ৎ দিলেন—"তুই যেমন আছিস্ তেমনি থাক্‌বি, লাভের মধ্যে একটী সঙ্গী পাবি।" বিয়ের পরেও 'যেমন আছে, তেমন থাকা' এ কোন্ সমাজের? লীলাময় ওদেশের সমাজ সম্বন্ধে প্রাক্‌টিক্যাল ও থিওরেটিক্যাল্ উভয় অভিজ্ঞতাই লাভ করিয়াছেন—এবারে তাহা এদেশে খাটাইয়া দেখিতে চান? * * *

তারপর মেয়ে যেমনি বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইল, তখনি 'তার কৌমার্য্য রহিল না।' বিবাহ বস্তুটা একটুখানি বুঝিবার সঙ্গে সঙ্গেই যদি কৌমার্য্য লোপ পাইল, তবে এতদিন তাহা ছিল কি করিয়া? "সকল মেয়ের মতো তারও পতন ঘটিল"! সকল মেয়েরই যে এই সময়ে পতন ঘটে, লীলাময় এ অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন কোথা হইতে? লীলাময়ের যে কত লীলা, তাহা তিনিই জানেন!

এই মেয়ের যখন বিবাহ হইল, সে-ই একান্ত পতিপরায়ণা সাজিয়া

বসিল। কিন্তু স্বামী তাহাকে গ্রহণ করিল না—দু'জনে 'আপনি' সম্ভাষণ চলিতে লাগিল। স্ত্রীটী বিবাহের পূর্ব্বেই কৌমার্য্য হারাইয়াছে; স্বামীটীও আস্ত জানোয়ার! জানোয়ার বটে—তবু সে মাসিকে মাসিকে ক্লেদ-বর্ষণ করে না।

শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর ছোট গল্প 'মতিলাল'। একটু নমুনা দিতেছি—"পাঠক একবার মনশ্চক্ষু উন্মীলন করুন। কল্পনা নেত্রে দেখুন আজিকার এই প্রাসাদ কণ্টকিত কলকাতা শহরের বুকে বাস্তবিকই শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে!" আবার 'পাঠক দৃষ্টি আর একটু প্রসারিত করুন'। সাবধান দৃষ্টি সংকীর্ণ করিবেন না! তার পর প্রেমাঙ্কুর বাবু বলিতেছেন—"গড়ের মাঠের দিকে কি হাওয়া খেতে যাইবে! ওদিকে মেম-সাহেবদের পেছু-পেছু ঘুরলে অনেক ভাল ভাল Idioms and phrases শিখতে পারা যায়।" যাক্—গড়ের মাঠে বেড়াইলে রথ দেখা ও কলা বেচা দুই-ই হয় দেখিতেছি! তবে অত পেছু-পেছু ঘুরিলে পুলিশে না ধরে! প্রেমাঙ্কুর বাবুর গল্পের অঙ্কুর কিরূপ আরম্ভ হইল দেখুন—'নারকোল গাছগুলোর পেছন থেকে চাঁদ উঁকি দেওয়ার কিছু পরেই সেই খোলা ছাতে এসে দাঁড়াত একখানি চাঁদ মুখ। চাঁদের সাড়া পেলে চাঁদ মুখ আর কিছুতেই ঘরে থাকতে পারত না। সে ছিল তরুণী। উজ্জ্বল গৌর ছিল তার দেহের বর্ণ। কিছুক্ষণ চাঁদের দিকে চেয়ে থেকে সে আকুল ভাবে মাঠের দিকে চাইত"। যাহা হউক আতর্থী মহাশয় তাঁহার গল্পে করুণ রসটী খুব সুন্দর কোরে ফুটিয়ে তুলছেন, অবশ্য যদিও আদর্শটী মোটেই সমর্থন যোগ্য নয়।

সীতা দেবী তাঁহার "মহামায়াকে" পর্য্যন্ত রেঙ্গুনে লইয়া গিয়া ছাড়িলেন। বঙ্গোপসাগরের উত্তাল তরঙ্গময় লবণাক্ত জল পাড়ি দিয়া একেবারে রেঙ্গুন! রেঙ্গুন বোধ হয় বড়ই মিষ্টি জায়গা। না?

প্রবাসীর নাম-মাহাত্ম্যে শ্রীনন্দি শর্ম্মা যে কপি-সভার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সেই সভাটীর অধিবেশন বসে কোথায়! ঘোষ লেনে যে দুইটী গজ ও কচ্ছপ একই গালির এপিঠ-ওপিঠ বাস করে, তাহাদের কাহারও সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই তো? শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ মৈত্র মহাশয় কি বলেন।

এক হেঁদেলকুৎকুতে মাসিকের পাতায় পাতায় কস্‌রৎ দেখাইয়া ফেরে। শনিবারের চিঠিতে আর আনন্দবাজারে তাহার কস্‌রৎ বেশী দেখা যায়; ভোটরঙ্গের আস্তানায়ও এক-একবার উঁকি মারে। কতকগুলি থার্ডক্লাশের গল্প লইয়া একখানা বই ছাপাইয়া কাগজে কাগজে গ্রাটিস্ বিজ্ঞাপন ছাপাইয়াও নাকি সে খদ্দের ভিড়াইতে পারে নাই। তিমির্ যাহার ভিতরে বাহিরে দিবাকরের ছদ্মবেশ ধরিলেই কি সে জ্যোতিষ্মান্ হইবে? এই হেঁদেলকুৎকুতের কোষ্ঠি পত্র আমরা পরে দিব।

বৈশাখের প্রবাসীতে প্রকাশিত শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের "বন্দী" গল্পটী আমাদের ভালো লাগিয়াছে। এরূপ সুন্দর ছোট গল্প যেন আমরা প্রবাসীর পাতায় অনেক দিন পড়ি নাই।

'পথের পাঁচালী'র বিভূতি বন্দোপাধ্যায়ের 'অপরাজিত' প্রবাসীর বুক চড়িয়া বেড়াইতেছে। অপু বড় হইয়াছে, একটী তেরো বৎসর বয়সী কিশোরীও যোগাড় করিয়া ফেলিয়াছে। মেয়েটীর মা আসিয়া তাহাকে অপূর্ব্ব সহিত ইণ্ট্রোডিউস্ করিয়া দিয়া গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের উপরে আদেশজারী করিলেন—'তোর নির্ম্মল-দাকে রোজ কাছে বসিয়া খাওয়াইতে হইবে'। মেয়ের বাজার এত ও সস্তা। 'নির্ম্মলার মাকে মা বলিয়া ডাকিতে তাহার খুবই ইচ্ছা হইতেছিল; কিন্তু লজ্জায় পারিয়া উঠিল না। শাশুড়ীকে মা বলিয়া ডাকিতেও বোধ করি কেহ কেহ এমনি লজ্জা বোধ করে। নির্ম্মলার আবার পদ্য মেলাবার সখ।' নায়িকার সব গুণই আছে বটে; বন্ধুর পথে চলিবার সময় গরুর গাড়ী চলে ঘানোর ঘানোর!

দ্বীপময় ভারতে গিয়া ভাষা-তত্ত্ববিদ শ্রীযুক্ত সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিদ্বীপের মেয়েদের দেহতত্ত্ব চর্চ্চাও কম করেন নাই। প্রবন্ধের আদিতে মধ্যে ও অন্তে কেবল স্ত্রীলোকের রূপের বর্ণণা। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বলিদ্বীপের মেয়েদের সৌন্দর্য্যের স্তব গাহিয়াছেন.....

এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ স্যর প্রমদাচরণ বন্দোপাধ্যায়ের পরলোক গমনে যে একজন কৃতী প্রবাসী বাঙালীর অভাব হইল, তাহা আমরা অস্বীকার করিতে চাহি না। কিন্তু যে প্রবাসী রসরাজ অমৃতলালের পরলোকগমনে চারিটী লাইনের বেশী লিখিতে পারেন নাই, সেই প্রবাসী সার প্রমদাচরণের মৃত্যুতে পাঁচটী কলম লিখিতে পাড়িয়াছেন। ইহাই নাকি এদেশের জর্ণালিজমের আদর্শ! রামানন্দ

বাবু অভিজাত্য ভালবাসেন; তাই হাইকোর্টের জজ্ তাঁহার শ্রদ্ধার অর্ঘ্য যতটা পাইয়াছেন, বাংলার রসরাজ—বাংলার শ্রেষ্ঠ নট ও নাট্যকার—এই এই বাংলাদেশে যাঁহার সম্মান ও আদর রামানন্দবাবুর মতো আভিজাত্য-গর্ব্বী সম্পাদকের নাই —তাহা পান নাই।

প্রবাসীর এক জায়গায় সম্পাদক মহাশয় লিখিতেছেন—"ভূত পিশাচদের সম্বন্ধে একটা ধারণা আছে যে, তাহারা কোন জায়গা হইতে তাড়িত হইলে একটা গাছের ডাল বা ঘরের মট্‌কা ভাঙিয়া দিয়া চিহ্ন রাখিয়া যায়।" রামানন্দবাবু এ ভৌতিক গবেষণা আরম্ভ করিলেন কবে হইতে? এমন জোরজবরদস্ত রাম নামেও যদি স্কন্ধ হইতে ভূত নামিয়া না থাকে, তবে ছাড়াইবার অন্য রকম উপায়ের কথা বলিয়া দিতে হইবে নাকি?

বাংলা মাসিকের পৃষ্ঠা খুলিলেই আমরা দেখিতে পাই কয়েকটী গৎ-বাঁধা কথা—'স্বাধীনতার মন্ত্র, 'মানবতার আদর্শ' 'বিদ্রোহের নির্ঘোষ'! তিনে এক চার হইল, আর একটী কথা বাড়িল—'মনুষ্যত্বের মাতৃশালা'! এবারেই চরম, না ইহার পরেও আবার 'বিশ্বমানবত্বের পিতৃশালা' 'মহামানবত্বের পিতামহশালা' ও 'যুগবৈশিষ্ট্যের' শালার শালা চলিবে বুঝা যাইতেছে না। তারুণ্যের ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া গতি হইয়াছে 'প্রগতি'—চেষ্টা সাজিয়া বসিয়াছে 'প্রচেষ্টা' দান সাজিয়াছে 'অবদান'—জড়ত্ব হইয়ছে 'জড়িমা'—অসংখ্য!

একখানি নূতন মাসিক হাতের কাছে পাইয়াছি—স্বস্তিক। স্বস্তিক, আজিকার পাঠক হতাশ হইবেন, সস্ত্রীক নয়—যদিও তার মুখপাতে

নন্দলাল বসুর রেখা চিত্রে সস্ত্রীকই দেখা যাইতেছে আর আধুনিক যুগের নব-প্রগতি অনুসারে স্ত্রীটীই আগে আগে স্বামীকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছে! কিন্তু তা নয়, আসলে কাগজখানি আধুনিকতর প্রধান রুচি ছ্যাব্‌লামো-বর্জ্জিত। শ্রীযুত কালিদাস রায়ের 'প্রাচ্য-সমাজ ও প্রতীচ্য সমাজ' সম্পাদক শ্রীযুত শৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক এম্-এ'র 'যুযুৎসু' প্রভৃতি কয়েকটী পড়্‌বার মতো প্রবন্ধই ইহাতে দেখিতে পাইলাম।

আরো দুইখানি নূতন মাসিক এ বৈশাখে দেখা দিয়াছে—'তরুণ আলো' আর 'অভিযান'। 'অভিযান যে ভাবে জন্মিয়াই নারী-দেহের সর্ব্বাঙ্গের সুরু জয়গান করিয়াছে তাহাতে তাহার সম্বন্ধে বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করাই ভালো। তরুণ আলো, যে আলো বিচ্ছুরণ করিতেছে, তাহা জাতির স্বাধীনতা-আন্দোলনের দিকে সত্যসত্যই সুলক্ষণ! মলাটের ছবিটাও বেশ নয়নাভিরাম একটী ভাবের অভিব্যক্তি দেখিতেছি! তবে এদের রংমহল, ছায়ালোক আর বেতার আলোচনার ঘটাটা একটু বেশী মনে হইতেছে, এগুলি সপ্তাহিকে মানায় ভালো, মাসিকে নয়।

ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'শান্তি'র মহিলা সংখ্যায় শ্রীযুত শান্তিসুধা ঘোষের ক্ষুদ্র একটী প্রবন্ধের মারফতে "সাহিত্য-সাধনা ও তাহার চরম স্বার্থকতা" সম্বন্ধে কয়েকটী ভালো ভালো কথা বলিয়াছেন। আধুনিক বিকৃত রুচির তথাকথিত সাহিত্যিকগণের অবগতির জন্য আমরা উহার কয়েকটী কথা উদ্ধৃত করিলাম—

"শিল্পীর, কবির, দেশভক্তের, ভাবুকের সৌন্দর্য্য-বোধ, রসজ্ঞান, ভক্তি, করুণা বাৎসল্য প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি স্বার্থক হয় 'সত্য শিব সুন্দরের' ধ্যানে

ও যোগে। মানবের ব্যক্তিগত জীবনে যাহা কাম্য, সমষ্টিগত জীবনেও তাহারই প্রয়োজনের সর্ব্বপ্রথম পূরিপূরক সাহিত্য। সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে সমষ্টির কল্যাণ বিতরণ।"

পড়িবার মত আরও কয়েটী প্রবন্ধ আছে।

শান্তির সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র দাস মহাশয় বিশেষ ধনী ব্যক্তি। অথচ তাঁহারই সম্পাদিত শান্তি ক্ষীণধারায় প্রবাহিত। যোগেশবাবুর যদি সাহিত্যের বাতিক একেবারেই না থাকিত, আমাদের বলিবার কিছু ছিল না। কিন্তু যখন একখানা বাংলা মাসিকের সম্পাদন ও পরিচালনা করিবার মতো সখ, অর্থ ও অবসর তাঁহার আছে, তখন কাগজ-খানিকে ভাল করিয়া তুলিবার চেষ্টা তিনি করেন না কেন? কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা হইতে একখানি স্বল্পায়ু মাসিক বাহির হইয়াছিল—প্রাচী'। কাগজখানি আমাদের এত ভালো লাগিয়াছিল যে উহাকে আমরা একখানি প্রথম শ্রেণীর মাসিক বলিয়া অসংশয়ে মানিয়া লইতে পারিয়াছিলাম। শান্তিকে কি যোগেশবাবু তেমন করিয়া তুলিতে পারেন না?

শ্রীযুত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'শান্তি' লইয়া আলোচনা অনেক জায়গায়ই হয়; কিন্তু শান্তির আসল রহস্য অনেকেই জানেন না। এ সম্বন্ধে আমাদের একজন বিশিষ্ট বন্ধু বলিতে ছিলেন যে—এক মিত্রবংশীয় পলিটিক্যাল উপ-নেতা, ব্রাহ্মণের তরুণী ভার্য্যাকে দেশসেবায় দীক্ষিত করিতে গিয়া আত্মসেবায় দীক্ষিত করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং তদবধি উভয়ে একসঙ্গেই রহিয়াছেন—এই সত্য-ঘটনাটী অবলম্বন করিয়া নরেশবাবু উপন্যাস খানি লিখিয়াছিলেন—দেশবাসীকে সমজাইয়া দিতে।

বৈশাখের "প্রবাসী" অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে........কাগজে "ভারতীয় চিত্র কলার (কদলী ?) বঙ্গীয় পন্থা" শীর্ষক এক সচিত্র প্রবন্ধ প্রকটিত হইয়াছে। ইহা প্রবন্ধকারে বিজ্ঞাপন বলিলে ও চলে! প্রবন্ধ লেখক অনেক বড় বড় কথার অবতারণা করিয়া ঐ ছবিগুলিকে অনন্য সাধারণ চিত্র বিদ্যার নিদর্শন বলে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা কয়িয়াছেন। "মুরারে-স্তৃতীয় পন্থা"ই জানিতাম, ইহাদের ছবি আঁকিবার পন্থা আবার চতুর্থ গতানুগতিক পন্থা পরিত্যাগ করিয়া নূতন কিছু করিবাব চেষ্টা করিয়াছেন! শ্রীযুক্ত গগণেন্দ্র নাথ ঠাকুরের "মৃত্যু" ও "কহ মৃত্যু কাণে কাণে কথা" নামক ছবি (?) দুইটী যদি আর্ট পেপারে ছাপা না হইত এবং ইহার পরি-চয়ে, ই যে ছবি তাহা যদি না লেখা থাকিত তবে আমরা মনে করিতাম যে কাগজে প্রেসের কালী ধ্যাবড়াইয়া গিয়াছে। কাগজে কতকগুলি কালি ঢালিয়া দিয়া মধ্যে মধ্যে মুছিয়া দিয়া আলো ও ছায়ার অস্পষ্ট প্রয়োগ দেখানকে অনেকেই ছবি আখ্যা দিতে পারে না। অলঙ্কার শাস্ত্রে অস্পষ্টতা যেমন দোষ চিত্রে ও অস্পষ্টতা একটী প্রধান দোষ। কিন্তু "দোষ হইয়া গুণ হইল বিদ্যার বিদ্যায়"। বর্ত্তমানে রচনায় ও চিত্রে অস্পষ্টতা যেন একটা মহাগুণের মধ্যে গণ্য হইয়াছে! যে জিনিষ যত না বোঝা যাইবে তাহা ততই গভীর ভাবদ্যোতক! 'কহ মৃত্যু কাণে কাণে কথা'— আহা কি মধুর ভাব ও কবিত্ব! "বীর হনুমান" চিত্র, চিত্রকরের আদর্শের অনুরূপই বটে।

শ্রীরেণু রায়, শ্রীযামিনী রায়, শ্রীসুধাংশু রায়, শ্রীইন্দু রক্ষিত পুরুষ না স্ত্রীলোক নাম দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই। শ্রীসুনয়নী দেবীর অঙ্কিত চিত্রগুলি তাঁহার ন্যায়ই সুনয়না ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শ্রীযুক্ত অজিত কুমার হালদারের অভিনন্দন লিপি বিভিন্ন পদ্ধতির অসামঞ্জস্য পূর্ণ মিশ্রনের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্তর্ষ। "ফেরি-

ওয়ালা যাত্রী" চিত্র সম্ভবতঃ চিত্রকর মানুষ ব্যতীত অপর কিছুর আদর্শ লইয়া আঁকিয়াছেন। ইহা তাঁহার উদ্ভট পরিকল্পনা। "হর পার্ব্বতী" চিত্রটা বোধ হয় দুর্ভিক্ষ পীড়িত ও ম্যালেরিয়া গ্রস্ত কঙ্কাল সার ব্যক্তিদের ফটোগ্রাফ দেখিয়া অঙ্কিত। "বুদ্ধ পূজা" ছবিটী রবীন্দ্র নাথের 'স্তন' নামক কবিতাটী স্মরণ করাইয়া দেয়। "চৈতন্যের টোলে"র ছাত্রদের চেহারা উৎকল ও দ্রাবিড় দেশীয়দের মত কেন? 'চিত্রকরেয় দৃঢ় রেখা-পাতটী' কিরূপ তাহা বুঝিতে পারিলাম না। চিত্র প্রদর্শনী দুইটীর কথা আর নাই বলিলাম। নিজেদের দলের লোকের ছবিগুলি ভাল ভাল জাগায় সাজাইয়া রাখা হয়। আর বিচারের কথা থাক্। সে কথার আর প্রয়োজন নাই। মনের দুঃখে অনেক ভাল চিত্রকরই তাঁহাদের ছবি প্রদর্শনীতে পাঠান না।

কবি চঞ্চু শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার বৈশাখ মাসে দোল পূর্ণিমা আরম্ভ করিয়াছেন; এবং রাত্রে ঘুম না হওয়ায় 'প্রেম ও জীবন' নামক কবিতা লিখিয়া পাঠকদের জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি কিছু দিনের জন্য লেখনী চালনা সম্বরণ করিলে ভাল হয়।

বৈশাখ মাসের প্রবাসীর সীতা দেবীর ভাই ফোঁটা গল্পটী অতি সুন্দর ও মনোরম হইয়াছে। নারীকে স্বাবলম্বন শিক্ষা দেওয়ার এইরূপ প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। ইহা বাস্তবিকই বর্ত্তমান কালের উপযোগী ও শিক্ষাপ্রদ গল্প। আমরা লেখিকাকে শ্রদ্ধার সহিত অভিবাদন করিতেছি।

সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ দাশ গুপ্তের কন্যা মৈত্রেয়ী দেবীর 'সুন্দরের স্থান কোথায়' প্রবন্ধটি অতি উপাদেয় হইয়াছে। তিনি অনুভূতি দিয়া সুন্দরকে বুঝিয়াছেন এবং আত্মোপলব্ধ জ্ঞান দ্বারা

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও সাহিত্যর সৌন্দর্য্যের পরস্পর বিরোধী ভাবের দার্শনিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সৌন্দর্য্যের উপভোগে যে আনন্দ, তাহা বাহ্য জগৎ ও অন্তর্জগৎ এর পৃথক রসোপলব্ধির সত্ত্বা স্বীকৃত হইলেও উহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, কেন না (সাংখ্যমত) মন ও ইন্দ্রিয় মধ্যে গণ্য। অতীন্দ্রিয় বস্তু সাপেক্ষ যে সৌন্দর্য্য বোধ তাহা বাস্তব জগতের পরিপূর্ণ আনন্দের কারণ হইতে পারে না। যাহা হউক আমরা বহু কাল এরূপ সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করি নাই। "সুন্দরের স্থান কোথায়?" ইহার উত্তরে বলা যায় যে তাঁহার প্রবন্ধের প্রত্যেক লাইনে লাইনে ভাষার ও ভাবের সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে ;

মহাবীর-দলের যে বীর-বৈষ্ণবের ধৃষ্ট বজ্রমুষ্টি একদা স্বর্গগত দেশবন্ধুর ললাট লক্ষ করিয়া সদম্ভে উত্থিত হইয়াছিল, তাহাই শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর কাছে সেদিন বসুমতী-সম্পাদকের উপরে গিয়া পড়িয়াছে। ক্ষীর-সর-মাখনের মতো নবনীত দেহ বাঙালীকে কচ্চিত রুদ্রমূর্ত্তি ধরিতে দেখিলে আমরা আশান্বিত হইয়া উঠি বটে, কিন্তু তা বলিয়া স্থানে অস্থানে রুদ্ররূপে এরূপ উৎকট প্রকাশও বাঞ্ছনীয় মনে করিতে পারি না। বসুমতী-প্রকাশের জন্য দায়ী যে নিরীহ নিরপরাধ শশীবাবু নহেন—বসুমতী-সত্ত্বাধিকারী সতীশবাবু স্বয়ং, একথা মাখনবাবুর চেয়ে ভালো হয়তো অনেকেই জানেন না। কিন্তু সেখানে ঢু মারিতে গেলে টেকো মাথার ঘোর বিপদ, তাই কি তিনি দেবতার বদলে বাহনটীর সহিত লাগিয়াছেন? আর-এক কথা, মহাত্মা গান্ধীর "ইয়ং ইণ্ডিয়া" এখনো আত্মপ্রকাশ করিতেছে; কিন্তু মাখম বাবুর মতো গান্ধী-ভক্তেরা দেখিতেছি হিন্দুশাস্ত্রোক্ত "ভগবানের চেয়ে ভক্ত বড়" এই নীতিটীকে স্বর্থক করিয়া তুলিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন।

Printed and Published by Keshob Sen at the Vidyodoy Press.
16-1-A, Beadon Street, Calcutta.

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলাগণ সকলেই

ফ্রিনিক্স—সেলাইয়ের কল ব্যবহার করেন। ইহার গুণে, সকলেই ইহার প্রশংসা করেন। মূল্য গুণের তুলনায় পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত কলের চেয়ে সুলভ। আপনি কল কিনিবার পূর্ব্বে একবার আমাদের সচিত্র ক্যাটালগ দেখিবেন। পত্র লিখিলেই ক্যাটালগ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

দত্ত চৌধুরী এণ্ড কোং ।

১৭২নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। (Phone 3859 Cal)

Regd. No. C. 1884.

১০৲ টাকায়

মেন সেট্ রেডিও

ও

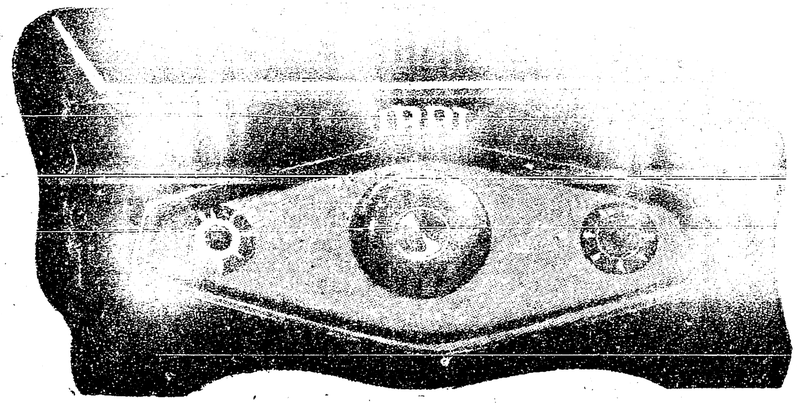

লাউড স্পিকার

৩ ভাল্ভ্

ডি, সি,

মেন্ সেট্

১০৲ মাসিক কিস্তিতে আমরা আপনার বাড়িতে ৩ ভাল্ভ ডি, সি, মেন সেট, লাউড স্পিকার ও সমস্ত সরঞ্জাম সহ রেডিও সেট বসাইয়া দিয়া আসিব।

মূল্য ১১৬৷৷০ টাকা। অর্ডার দেওয়ার সময় ৩৬৷৷০ টাকা অগ্রিম দেয়—বক্রী টাকা শোধ না হওয়া পর্য্যন্ত মাসিক ১০৲ টাকা কিস্তিতে দেয়। নগদ মূল্য—শতকরা ১০৲ টাকা কম।

ডে রেডিও কোং

৫।১ নং সেন্ট্রাল এভিনিউ, কেণ্ডারিন লেন।

ফোন—৩৭২৬ বড়বাজার, কলিকাতা।